বাংলা ভাষায় প্রকাশিত একটি প্রথমসারির যুক্তিবাদী ম্যাগাজিন

চেতনার অন্বেষণে

চতুর্থ বর্ষ, ২৯তম সংখ্যা



যুক্তিবাদীরা গ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

ম্যাগাজিন তৈরির মতো নির্মল আনন্দের বিষয় খুব কমই পেয়েছি, তবুও নানা কারণে নিয়মিত সংখ্যাগুলি প্রকাশ করে উঠতে অসমর্থ হচ্ছি, এতদিনে পাঠকও নিশ্চয় কিছুটা মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন।

ম্যাগাজিনের একটা পোক্ত ফানেলিং সিস্টেম গড়তে চাইছি, ফানেলিং সিস্টেম বলতে একটি নীলনকশা প্রস্তুত করা যাতে দ্রুত পরের সংখ্যাগুলি প্রকাশ করা যায়। লেখকের থেকে লেখা আসবে, সেটিকে প্রুফে পাঠিয়ে, প্রুফ এলে সফটওয়্যারে অবশিষ্ট কাজগুলি দ্রুত সেরে ফেলা যাবে। জীবন-জীবিকার ফাঁকে ম্যাগাজিন গুছিয়ে উঠতে বেশকিছু প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সেখানে অনুপম মিত্র, সাগ্নিক, উপেন প্রমুখদের কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হলাম। কি-বোর্ডে বাংলা লেখার লে-আউট বদল করতে হয়েছে, ফলে নতুনে সড়গড় হতেও কিছুটা বিলম্ব হলো। ম্যাগাজিনের একটি নির্দিষ্ট পেজ-সেটাপ পূর্বের অনেকগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সংখ্যার পর গড়ে তুলেছি। যাতে পাঠক পড়তে গিয়ে কোনোপ্রকার অসুবিধায় না পড়েন। পূর্ব-অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এবার স্ক্র্যাচ থেকে তা পুনরায় গড়ে তোলা হয়েছে। আশাকরি এই দীর্ঘবিরতির সময়টুকুকে পাঠক ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

অডিওবুক কয়েকটা আমরা করেছি, ইউটিউব ও স্পটিফাইতে সেগুলি উপলব্ধ। তারজন্য উক্ত সাইটগুলিতে চেতনার অন্বেষণে লিখে সার্চ করতে হয়। এবং হোয়াটসঅ্যাপেই পাঠকের কাছে পৌঁছানোর জন্য ডেটাবেস তৈরি করা হয়েছে।

আশার কথা *চেতনার অন্বেষণে*-র পাশে পেয়েছি

অনেক গুণী ব্যক্তিত্বদের, তাঁদের সাহচর্য পেতে ওয়েবমিনার করার পরিকল্পনা রয়েছে। কোন বিষয়ে ওয়েবমিনার হলে ভালো হয় সেটিও যেমন জানাবেন, ম্যাগাজিন নিয়ে ভালো-মন্দ দুই-ই মতামত দেবেন। যা বুঝতে সুবিধা করবে কীভাবে আরও যত্নশীল হয়ে ম্যাগাজিনটি প্রকাশ করা যায়।

এই সংখ্যাটিতে মহান বিজ্ঞানী ও পথপ্রদর্শক আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু-কে স্মরণ করেছি, বিজ্ঞানীর কিছু দুর্লভ ছবি কোলাজ হয়েছে, সেগুলি অবশ্যই দেখবেন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন লেখা প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষভাবে কবিতা অংশটি পাঠকের মনোগ্রাহী হবে। পত্রিকার পাশে থেকে যাঁরা সাহস জুগিয়েছেন তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

বাংলায় যুক্তিবাদ নিয়ে চর্চা বিগত কয়েকবছরে যেমন বেড়েছে, অবৈজ্ঞানিক মননের ফ্লাডগেটও খুলে গেছে। তাতে সরাসরি সরকারের মদত অত্যন্ত উদ্বেগের। এদিকে মিডিয়া একটি অমেরুদন্ডী বিষয়ে পর্যবসিত। আজ সায়েন্স-টেম্পারমেন্ট হুমকির মুখে। সমাজের এই নিদারুণ দাবদাহে যুক্তিবাদী বন্ধুদের নিকট আবেদন কলম ধরুন। *চেতনার অন্বেষণে*-র বরাবরের লক্ষ্যই হলো যুক্তিবাদীদের লেখায় উৎসাহিত করা, তাই আরও লেখালেখিতে সম্পৃক্ত হতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হোন।

কিছু লেখা প্রকাশ করতে পারিনি এই সংখ্যায়, অনধিক স্থূলতা থেকে বাঁচতে সংখ্যাটিকে তিনশো পাতায় সমাপ্ত করতে হয়েছে। আগামী সংখ্যায় সেগুলি নিশ্চয় পাঠকের হাতে তুলে দেবো।

বাংলা নববর্ষের আগাম শুভেচ্ছা জানাই।

প্রসেনজিৎ কোনার

২০ চৈত্র, ১৪৩০, কলকাতা - ৫৬

চেতনার অন্বেষণে

● ৫ এপ্রিল, ২০২৪ ● বর্ষ ৪ ● ২৯ তম সংখ্যা ●

সম্পাদক
প্রসেনজিৎ

সহ সম্পাদক
সৌভিক, সজল ও সৌমেন

সম্পাদনা সহযোগী
অভিষেক, অনুপম মিত্র, উপেন
সায়ন, শুভ্র, রাজু, সাগ্নিক ও রাজর্ষী

Website

Whatsapp
+91-9433 794 113

Telegram
@Yktibadira

মতামত জানান

প্রাপ্তিস্থান ও পরিবেশক
টেলিগ্রাম চ্যানেল ‘চেতনার অন্বেষণে’
যুক্তিবাদীরা গ্রুপ ও ওয়েবসাইট

অলংকরণ ও পৃষ্ঠা বিন্যাস
প্রসেনজিৎ

এই পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা, বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনো দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়।

পত্রিকা সংক্রান্ত যোগাযোগ
ইমেইল: yuktibadira@gmail.com
হোয়াটস্অ্যাপ: +91 9433-794-113

বিনিময় মূল্য নাই

কলকাতা - ৫৬ থেকে যুক্তিবাদীরা গ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত।

মুক্তচিন্তক সম্মাননা

এই পর্বে মুক্তচিন্তক সংবর্ধনা জ্ঞাপন করছি
সজল কান্তি টিকাদার, প্রিন্সি বেরা
তাপস কুমার সরকার মহাশয়কে। আপনাদের হার্দিক শুভেচ্ছা জানাই। পাঁচটি বা তার বেশি লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর এই সম্মাননা পত্রটি প্রদান করা হয়।



যে অ্যাপ দিয়ে পিডিএফ-টি পড়বেন

অ্যাডোবি রিডার (Adobe Reader) অ্যাপে পত্রিকাটি পড়ুন কারণ পিডিএফ-টি ইন্টারেক্টিভ করা আছে। পাঠের সুবিধার জন্য বাটনগুলো ক্লিক করে দ্রুত কাঙ্ক্ষিত পাতায় যাওয়া যায় ও সূচিপত্রে ফিরে আসা যায়।

যুক্তিবাদীদের বই ভান্ডার

টেলিগ্রামে যুক্তিবাদীদের প্রয়োজনীয় বইপত্র *চেতনার অন্বেষণে* চ্যানেলে রয়েছে, বইগুলি পেতে টেলিগ্রামে এসে সার্চ করবেন @Yktibadira ওখানে ২২০০টির অধিক বই সাজানো রয়েছে।

লেখা পাঠাবেন যেভাবে

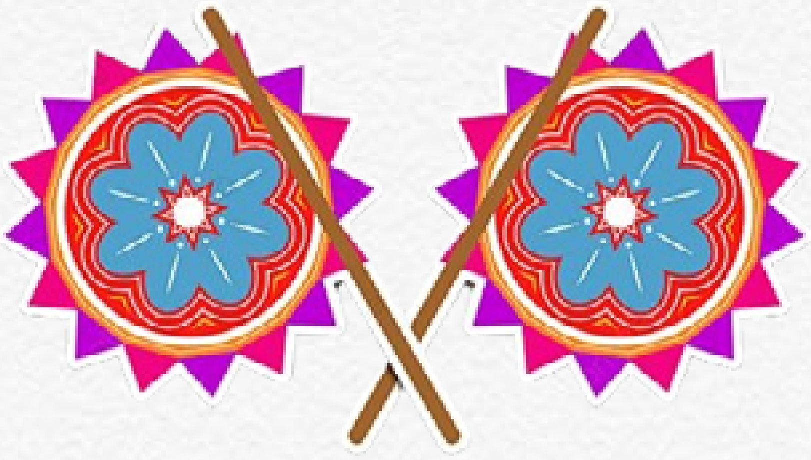
ম্যাগাজিনের একেবারে শেষপাতায় বিস্তারিত দেওয়া রয়েছে। এছাড়াও হোয়াট্সঅ্যাপে বা ইমেইল দিয়ে যোগাযোগ করতে পারেন।

সূচিপত্র

শিরোনামে টাচ করুন

ছোটোগল্প - অনুগল্প-জীবনকথা

কবিতা





বিজ্ঞান-অধিবিদ্যার দ্বন্দ্ব ও রাষ্ট্র শক্তি

হিন্দুত্ববাদীরা বলা ভালো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ আর.এস.এস স্বদেশী বিজ্ঞান আন্দোলন চালাতে লাগলেন। ফলে বিকল্প বিজ্ঞানের সঙ্গে স্বদেশী বিজ্ঞানের মধ্যে যে ভেদরেখা ছিল সেটা ধুয়ে মুছে গেল।...**গোপাল সিংহ (গবেষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)**

দীর্ঘস্থায়ী এবং সময়দ্বারা পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উপেক্ষা করে সাম্প্রদায়িকতা, মিথ্যা সর্বস্ব মিথ, অন্ধবিশ্বাস, ধর্মীয় বিশ্বাস ও বৈদিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রচাররত

ক্ষমতাসীন অস্পষ্টতাবাদী ও কুসংস্কারবাদীরা যে নীলনকশা তৈরি করেছে, তার মুখোশ খুলতে পারে প্রকৃত বিজ্ঞানমনস্কতা ও চেতনা সম্পন্ন বৈজ্ঞানিক লড়াই। আর.এস.এস এর মদতপুষ্ট বিজেপি এবং দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি নির্বিচারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপায়ে পৌরাণিক ঘটনাগুলিকে উল্লেখ করছে যা কখনোই কোনো যাচাই বা সমালোচনার ধার মানে না। আমাদের দেশের এই ক্ষমতাসীন বাহিনী তাদের প্রশাসনিক অবস্থানগুলি বিভিন্ন অন্ধকারাচ্ছন্ন ও পিছিয়ে পড়া ধারণা প্রচার এরজন্য ব্যবহার করছে। এমনকি তারা ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস প্ল্যাটফর্মটিকেও তাদের প্রচার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছে। বিজ্ঞানসম্মত মানুষের মধ্যদিয়েও সুপরিকল্পিত ও নিরবচ্ছিন্নভাবে তা ছড়িয়ে দিচ্ছে। এ বিষয়ে কথা বলা, প্রশ্ন করা, বিতর্ক করা, মতবিরোধ ইত্যাদি অধিকারকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। যে বহুত্ববাদী বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি আমাদের দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য, তাকে রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যবহার করে নির্মমভাবে ধ্বংস করছে। একই সময়ে এই বিজ্ঞানবিরোধী শাসক শক্তি বিজ্ঞান গবেষণার জন্য তহবিল, ফেলোশিপ কমিয়ে দিচ্ছে, যাতে স্কুল-কলেজ ও সব জায়গাতে বৈজ্ঞানিক আগ্রহ এবং সমস্ত রকম মৌলিক গবেষণা পরিষদ বন্ধ করে দেওয়া হয়। একইসঙ্গে তারা নির্লজ্জভাবে অর্থ ব্যয় করছে এমন ধরনের গবেষণার ক্ষেত্রে যা কেবল তাদেরই সাম্প্রদায়িক এবং রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করবে।

একুশ শতকে আমরা দেখছি যে চারিদিকে কুসংস্কার, অপ-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ। অপরদিকে কুসংস্কার, অপসংস্কৃতি ও অপবিজ্ঞান বিরোধী আন্দোলন আমাদের ভারতে বহুদিন ধরে চলছে। কিন্তু আমরা যে রকম সাফল্য আশা করেছিলাম তা পাইনি। কেননা এদেশের রাষ্ট্রশক্তি মুক্ত ও যুক্তিবাদী মনের মানুষের কণ্ঠকে রোধ

করে চলছে। রেনেসাঁ যুগ থেকে ভারতে রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্তদের পথ ধরে পুরোনো বস্তাপচা চিন্তাকে দূর করে আধুনিকতার ছোঁয়া এদেশের মানুষের মনে এনে ছিলেন কিন্তু তাঁর সাফল্য আমরা যেরকম আশা করছি তা পাইনি। কেন না ভারতের জনগণের পরিপূরক বিজ্ঞান আন্দোলন নানা তাত্ত্বিক সমস্যাতে জর্জরিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ছোঁয়া পায়নি সাধারণ মানুষ। ভারতের মানুষের মধ্যে কুসংস্কার, কিংবা অ-বিজ্ঞানধর্মী মানসিকতা থেকে গিয়েছে। আমরা জানি এর কারণ সমাজের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক সংস্কারের রেশ এখনও পর্যন্ত রয়েছে। বস্তুতাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এখনও তাদের কাছে পৌঁছাতে পারেনি। জনসমাজে বিজ্ঞানের দর্শন ও বিজ্ঞানের মনন, চিন্তাকে ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব থাকে রাষ্ট্রের উপর কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যখন আমরা দেখি সেই রাষ্ট্র সে কাজটা না করে মূলত কুসংস্কার ও অপবিজ্ঞানের প্রসারে সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে। তখন কিন্তু আমাদের থমকে দাঁড়াতে হয়, এবং নতুন করে ভাবতে হয়। একটি রাষ্ট্রের প্রধান যখন প্রকাশ্য সমাবেশে দাঁড়িয়ে এমন কিছু কথা বলেন—গনেশ-এর মাথা প্লাস্টিক সার্জারি, বৈদিক বিমান...ইত্যাদি যা একেবারে অবৈজ্ঞানিক, সমাজের কাছে সমূহ বিপদ। তখন আমাদের দেশে কীভাবে বিজ্ঞানের মানসিকতা গড়ে উঠবে? বৈজ্ঞানিক মেজাজ (Scientific Temper) গড়ে উঠবে সেই বিষয়ে কিন্তু একটা সংশয় থেকে যায়। তাঁরা সর্বত্র এই মৌলবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রবেশ ঘটানোর চেষ্টা করছে। এর বিরুদ্ধে যদি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের বৃহত্তর শক্তিশালী বিজ্ঞান আন্দোলন সংগঠিত হতো, তাহলে হয়ত এটা এতটা জনপ্রিয়তা পেত না। আসলে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক অ্যাকাডেমিক একটা অংশের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব তারা তাদের তত্ত্বগত কথা দিয়ে, কোথাও বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কিন্তু নানারকমভাবে বিজ্ঞান

বিরোধিতার কথা বলে, এরই সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে। কিন্তু আমরা তো জানি যে আমাদের মতো একটা দেশে আমরা যখন বড়ো হই, কতগুলো কুসংস্কারাচ্ছন্নতা, কত মিথ্যে ধর্মীয় পিছুটান থেকে যায়। ঈশ্বর, প্রকৃতি, নারী, ধর্ম-বর্ণ-জাতি, অধিকার, শুচিতা, অশুচিতা সামাজিক সম্পর্কের অবস্থান ইত্যাদি নিয়ে এই কল্পিত ধারণা সেটাকেই আমরা কাটাতে পারি না। একমাত্র বিজ্ঞানই পারে সেটা কাটাতে এবং তাকে রোধ করতে।

এই যে বিজ্ঞান বিরোধী আন্দোলন, বিজ্ঞানের সঙ্গে অধিবিদ্যার যে সংঘাত সেটা শুধুমাত্র কোনো ধর্মীয় তাত্ত্বিকদের বা ধর্মীয় মৌলবাদীদের সঙ্গে সংঘাত নয়, তা কিন্তু একইসঙ্গে এক শ্রেণির প্রতিষ্ঠানিক অ্যাকাডেমিক তাত্ত্বিকদের সঙ্গে সংঘাত। হঠাৎ কেন এ বিষয়ে আমরা কথা বলছি আমাদের কাছে প্রশ্ন হয়ে উঠতে পারে সে নিয়ে কিছু কথা বলা প্রয়োজন।

আমাদের দেশের কেন্দ্র সরকারের অর্থানুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৮০ সালে একটি সেমিনার হয়, যে সেমিনার দিল্লির নেহেরু সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। চারদিন ধরে সেই সেমিনারে প্রথিতযশা প্রায় ত্রিশজন বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানী ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠিত চিন্তাবিদরা উপস্থিত ছিলেন। সেই সেমিনারে জহরলাল নেহেরুর কর্তৃক Scientific Temper নিয়ে প্রবল তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়। উপস্থিত গুণী ব্যক্তিরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। এই দুটি দলের পরস্পরবিরোধী চিন্তার অস্তিত্ব আজও আমরা লক্ষ্য করি।

আমরা জানি যে, জহরলাল নেহেরু তার ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া (Discovery of India) গ্রন্থে এবং বিভিন্ন বক্তৃতায় Scientific Temper নিয়ে আলোচনা করেছেন। 'Scientific Temper is a temper of a free Man', কিন্তু সেই চিন্তার মধ্যে অনেক ত্রুটি থাকলেও

মানুষকে কিছুটা অর্থে বিজ্ঞানমনস্কতার দুয়ারে এনে ছিল। ১৯৮০ সালের এই সেমিনারে কিছু বিজ্ঞানী, সমাজকর্মী, রাজনৈতিক কর্মী, চিন্তাবিদদের করা একটি খসড়া প্রস্তাব যা Plampet হিসেবে রাখা হয়। যার শিরোনাম ছিল 'A Statement of Scientific Temper'। বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী, তাত্ত্বিক আশীষ নন্দী সেই প্রচারপত্রের তীব্র বিরোধিতা করেন এবং তাকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসেন আরও বিখ্যাত ব্যক্তি। তাদের মধ্যে বন্দনা শ্রীভা, প্লট আলভারেজ, পি. বিশ্বনাথন, জিয়াউদ্দিন সর্দার, রজনী কোঠারীর মত বিজ্ঞ-তাত্ত্বিক ব্যক্তি, চিন্তাবিদেরা। এঁদের নাম সবাই জানি, এঁদের বইপত্র শুধু ভারত নয়, সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পড়ানো হয়। এই সেমিনারের কিছু মাস পরে পাঁচপাতার একটি বক্তব্য, A Statement of Scientific Temper pamphlet-টি 'Mainstream' মেইনস্টিম নামক পত্রিকায় (এটি যুক্তিবাদী, মুক্তমনা পত্রিকা) প্রকাশিত হয়।

এর পরবর্তীতে আশিস নন্দী একটি পাল্টা প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আরও একটি প্রবন্ধ লেখেন, সেই প্রবন্ধটির নাম 'Counter Statement of Humanistic Temper', তাহলে কী দাঁড়াল তিনি Scientific Temper বিপরীতে লিখলেন Humanistic Temper। ফলে লড়াই শুরু বৈজ্ঞানিক মেজাজ বনাম মানবিক মেজাজের মধ্যে। পরবর্তীকালে এই দুটি বক্তব্য নিয়ে 'Mainstream' পত্রিকায় ১৯৮১ জুলাই মাস থেকে দীর্ঘ সময় ধরে তর্ক-বিতর্ক চলে। অনেকেই পুরো ঘটনাটিকে ভারত বর্ষের প্রথম বৈজ্ঞানিক ঠান্ডা যুদ্ধ 'Scientific Cold War' বলেছেন।

কেন বর্তমানে ১৯৮০ সালের ঘটা বিতর্ককে নিয়ে আলোচনা করছি? কী এমন ঘটে চলেছিল সেই সেমিনারে আমরা আলোচনা করতে চাইছি এবং কী তার প্রাসঙ্গিকতা এর কারণগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা

করলে বুঝতে পারি।

আমরা জানি যে সতেরো শতকের পরবর্তী আধুনিক বিজ্ঞানকে বারেবারে বিজ্ঞান বহির্ভূত মতাদর্শের সঙ্গে অনেক লড়াই করতে হয়েছে। ঔপনিবেশিক ভারতে, মধ্যপ্রাচ্যে, উনিশ শতকের ইউরোপে, আজকের আমেরিকায়, ইসলামিক রাষ্ট্রগুলিতে সর্বত্রই নানাধরনের মতাদর্শের সঙ্গে সংঘাতের মধ্যদিয়ে বিজ্ঞানকে এগোতে হয়েছে। কখনও ক্রিয়েশনিজম, কখনও হিন্দুত্ববাদ, কখনও ইসলামিক মৌলবাদ, কখনও-কখনও আধ্যাত্মিক ও বস্তুবাদ মিশ্রিত দর্শনের সঙ্গে। বিজ্ঞানকে তাঁরা পথভ্রষ্ট করতে চেয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রধানেরাও ধর্মীয় মৌলবাদীদের মতো ধর্মশাস্ত্রের কিছু দিককে বিজ্ঞান বলে অপপ্রচার করার কারণটি আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু বিভিন্নক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক প্রধানেরা ধর্মীয় মৌলবাদীদের মতো বিজ্ঞান ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেন। তখন আমাদেরকে থমকে যেতে হয় এবং দাঁড়িয়ে ভাবতে হয় এরা কাদের হাত শক্ত করছে।

সমসাময়িক ভারতে বর্তমানে যেভাবে আমরা অপ-বিজ্ঞানের চর্চা দেখতে পাচ্ছি এবং অধিবিদ্যার চর্চাকে প্রাসঙ্গিক হিসেবে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করছে। তাঁর সূচনা বহুদিন ধরে হলেও বর্তমানে একটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠন এবং তাদের মদত পুষ্ট রাষ্ট্রযন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধানরা জাতীয় বিজ্ঞান সম্মেলনে দাঁড়িয়ে বলছেন—গনেশের মাথা একটি প্লাস্টিক সার্জারির উদাহরণ, গান্ধারীর শতপুত্র একটি কর্নিক সিস্টেম, গোরুর দুধের মধ্যে সোনা। এমনকি গোমাতাকে তারা বিজ্ঞানের কাজে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। করোণা মহামারীর সময় যেভাবে তারা আয়ুর্বেদ চর্চার নামে অবৈজ্ঞানিক চিন্তাকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে তা উদ্বেগের। এছাড়া বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থায় জাতীয় শিক্ষানীতিতে সেখানে চৌষট্টি কলার

নাম করে বিজ্ঞানের মধ্যে পুরোনো বস্তাপচা চিন্তাকে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। সব থেকে ভয়ঙ্কর ডারউইনের বিবর্তনবাদের বিরোধিতা করছে।

আশিস নন্দী যাঁদের দার্শনিক তত্ত্বটি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁদের গবেষণা এত উচ্চমার্গের যেগুলো খুবই প্রশংসনীয়, সেগুলো নিয়ে তর্ক-বিতর্কও হয়। কিন্তু তিনি কী জানেন না আমাদের মত বহুত্ববাদী সংস্কৃতির দেশে বিজ্ঞান ও ধর্মনিরপেক্ষতার বিরোধিতা করা মানে মৌলবাদীদের ও উগ্র-জাতীয়তাবাদীদের এবং অ-বিজ্ঞানকারীদের হাতকেই শক্ত করছে। যারা রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা করছে তাদের ক্ষমতাকে শক্ত করা হয়। কেননা মৌলবাদীরা ওঁত পেতে বসে থাকেন এইসবের জন্যই। আমাদের চারপাশে যা নিয়মিত দেখতে পাচ্ছি। তারা আজকে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করছে অধিবিদ্যার নাম করে।

দিল্লির সেই সেমিনারে একদিকে সায়েন্টিফিক টেম্পার অন্যদিকে হিউম্যানিস্ট টেম্পারের মুখোমুখি বিতর্কে সেদিন বিজ্ঞানবিরোধী, যুক্তিবাদবিরোধী, এনলাইটমেন্ট বিরোধীরা উত্তর-আধুনিক মতাদর্শ করায়ত্ত করে নেয় এবং পায়ের তলার জমি শক্ত করে নেয়। তাদের মতে আঠারো শতকের যে ফরাসি বিপ্লব ও এনলাইটমেন্ট সেটি নাকি ঔপনিবেশবাদের একটা বাহন মাত্র। অথচ আমরা জানি এর পূর্বে বিজ্ঞানের বিরোধিতা করা হয়নি তা কিন্তু নয়। গোটা উনিশ শতক জুড়ে বিজ্ঞান নির্ভর চিন্তাভাবনার সঙ্গে অধিবিদ্যা সংঘাত বহুদিনের ইতিহাসের ধারাতেই অনেক লড়াই করে এগোতে হয়েছে। ভারতে আমরা দেখেছি চার্বাক দর্শনের সাথে হিন্দুধর্ম বা মনুর চিন্তা ধারার সঙ্গে সংঘাত। বিশ শতকের আশির দশকে যখন বলা হলো বিজ্ঞান এমন কিছু বিরাট ব্যাপার নয়, ধর্ম-কর্ম, জ্যোতিষশাস্ত্রের মতো এটা একটা চর্চার ক্ষেত্র মাত্র। বিজ্ঞানকে অতিরিক্ত তুল্য মূল্য দেওয়ার কোনো প্রয়োজন

নেই। বিজ্ঞান হল ওই প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দেশের শাসক শ্রেণিরাই আধিপত্য বজায় রাখবার কারসাজি মাত্র। তখন আমাদের অবাক হয়ে ভাবতে হয়, বুঝতে হয়, এই বিরোধীরা তাত্ত্বিক মতাদর্শ প্রবল বলেই এর আশঙ্কা প্রবল এবং শঙ্কাজনক।

'Scientific Temper' প্রস্তাবে বলা হল, 'স্বাধীনতার প্রায় 30 বছর পেরিয়ে গেল' More than 30 years after Independence if noted India had made Significant strides in devolapment Institutions for scientific Education and Research already in the 1980 India boosted of the World 3rd largest Scientificaly trend Works force' অর্থাৎ স্বাধীনতার 30 বছর পরেও বিজ্ঞানের অগ্রগতি হয়েছে বিজ্ঞান চর্চাকারী প্রতিষ্ঠান আমরা খুলতে পেরেছি, কিন্তু এই উন্নতি সাধন সত্ত্বেও আমরা পাশাপাশি দুই ভারতকে দেখি। কেমন সেই ভারত। তারা আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে একদিকে রয়েছে Sophisticated high technology অপর দিকে Coexisted with greeding property। একদিকে World renowned Institution for higher education অপরদিকে huge pockets of illiteracy। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিছু বিজ্ঞান-প্রযুক্তি চর্চা কেন্দ্র অপরদিকে রয়েছে ব্যাপক পরিমাণে অশিক্ষা, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, এবং গরীব মানুষের সংখ্যা।

তারা আরও বললেন —'আমাদের প্রতিষ্ঠানে যেভাবে বিজ্ঞান শেখানো হয়, সেখানে শুধু ভালো ক্যারিয়ার তৈরি করা হয়, শুধু তাই নয় তার একমাত্র লক্ষ্য, খোলা মনে জগৎ জীবনকে প্রশ্ন করতে সেই বিজ্ঞান শেখায় না সেখানে মানবিকতার সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনো সংযোগ নেই। বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি যেন দ্বিখন্ডিত, বিজ্ঞানমনস্কতার সংস্কৃতিমনস্কতার কোনো যোগসূত্র নেই। ভারতের সংস্কৃতির এই সংকট থেকে বের করে নিয়ে আসার

জন্য তাঁরা জহরলাল নেহেরু সায়েন্টিফিক টেম্পার আহ্বান করলেন। তাঁরা নেহেরুর লেখা থেকে উদ্ধৃতি করে যে দাবি করলেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হল, কোনোকিছুকে বিনা প্রশ্নে যাচাই না করে মেনে নেওয়া ঠিক নয়। সেটা যদি পূর্বনির্ধারিত সত্য বলে মেনে নেওয়া। তখনও সত্য বলে মেনে নেবে না। তার কথায় যতক্ষণ না যুক্তি, পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও বিচার না করা হয় অর্থাৎ যা আছে তাকে মেনে নেব না নতুনভাবে আবার যাচাই করব এই বিষয়কে বলা হয় সায়েন্টিফিক টেম্পার। ‘Any thing without testing and trial the capacity to change previous conclusions in the face of new evidence the reliance observations fact and not Preconstrac theory’ অর্থাৎ যা কিছু আছে তাকে মেনে নেবো না নতুন কিছু দিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দিয়ে যাচাই করবো।

আশিস নন্দী তার ‘Counter Statement of Humanistic Temper’ এ বললেন যারা এই সায়েন্টিফিক টেম্পারের কথা বলেন, তারা হলেন উগ্র প্রত্যক্ষবাদী কয়েকজন লোক। এদের প্রচার পুস্তিকাটি খুবই নিম্নমানের, ‘Fourth rate plampeters for Modern Science and Ultapositivitist’ আশিস নন্দী ও তার সহযোগীদের বক্তব্য ছিল, পশ্চিমী দেশের দার্শনিক আর সমাজ সমালোচকেরা নিজেরাই যেখানে জ্ঞানতাত্ত্বিক বিচারে আধুনিক বিজ্ঞানকে কোনো বিশেষ মর্যাদা দিতে অস্বীকার করে সেখানে বৈজ্ঞানিক মেজাজ গড়ে তোলার জন্য স্বাক্ষর সংগ্রহ করে জনসাধারণকে সচেতন করছে এরথেকে বোঝা যায় যে, ভারতীয়রা প্রমাণ করেছে তারা কতখানি নির্বোধ ও তারা কতখানি বোকা। আশিস নন্দী বললেন, বিজ্ঞান কখনোই নাকি অন্ধমতের বিরোধিতা করতে পারে না। কেননা বিজ্ঞান

নিজেই অন্ধ মত নিয়ে চলে। টমাস কুন যেটাকে প্যারাডাইম বলেছেন সেটাই হল বিজ্ঞানের অন্ধমত বা ডগমা। আমরা জানি যে কার্ল কপার বিজ্ঞানের যে মতাদর্শ সেই নিয়ে কিছু প্রশ্ন তুলেছিলেন। পরবর্তীতে জে.ডি.বার্নাল কার্ল কপারের ভুলটি কোথায় তা প্রমাণ করেছিলেন। আশিস নন্দীর বক্তব্যকে কেন্দ্র করে আধুনিক ভারতে একটি সামাজিক বিপ্লব দেখা দেয়। একটা আন্দোলন দেখা দেয়। এবং আধুনিক বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে বিকল্প বিজ্ঞানের জন্ম হয়। যেটাকে আমরা অল্টারনেটিভ সাইন্স (Alternative Science) বলতে পারি। এই বিকল্প বিজ্ঞান কী বলছে? বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সূত্রের সঙ্গে মেলে না বলে জ্যোতিষশাস্ত্র কে কী ভুল বলা যাবে? একেবারে ভুল বলা যাবে না। কারণ জ্যোতিষ হল স্থানীয় মানুষের জ্ঞান। যার দ্বারা নিপীড়িত, দুর্বল, দুঃস্থ আধুনিকতার হাতে যারা লাঞ্ছিত (Victims of Modernity) তাদের আশ্রয় দেয় জ্যোতিষ শাস্ত্র। ফলে পশ্চিমী বিজ্ঞান যদি কিছু ভুল করে, তাহলে পশ্চিমী দুনিয়ার শেখা উচিত আমাদের দেশের জ্যোতিষ বিজ্ঞান এর কাছে।

এর পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক পেল্লাই বিবৃতি। পাশাপাশি হিন্দুত্ববাদীরা বলা ভালো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ আর.এস.এস স্বদেশী বিজ্ঞান আন্দোলন চালাতে লাগলেন। ফলে বিকল্প বিজ্ঞানের সঙ্গে স্বদেশী বিজ্ঞানের মধ্যে যে ভেদরেখা ছিল সেটা ধুয়ে মুছে গেল। বিকল্প বিজ্ঞান আর স্বদেশী বিজ্ঞান আন্দোলনের হরিহর আত্মা মিলনের ফল বর্তমানে আমরা সুকৌশলভাবে দেখতে পাচ্ছি এবং হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। এটা শুধু ভারতের প্রেক্ষাপট নয়। সমগ্র বিশ্বকে এই প্রেক্ষাপটেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। যেখানে ধর্মকে বিজ্ঞানের আলোকে প্রস্ফুটিত করার

চেষ্টা চলছে। উদাহরণ দেখলে, আমাদের পাশের দেশ সেখানে পরমাণু বিজ্ঞানী আব্দুস সালাম-এর সুযোগ্য ছাত্র পারভেজ হুদভয় পাকিস্তানে ঠিক একই কাণ্ড ঘটিয়ে বলেছেন তার বিখ্যাত পুস্তক 'ইসলাম কোরআন'-এ। সেখানে ইসলামের গুণগান করা হয়, এবং সেখানে কোরআনের আয়াত ধরে ধরে প্রমাণ করা হয় যে, কোরআনে যা রয়েছে বিজ্ঞানেও তাই রয়েছে।রোজা, ওজু-নামাজ এগুলো সায়েন্টিফিক পদ্ধতি। এগুলো মৌলবাদীদের বৈজ্ঞানিক চিন্তার ফসল!

ভারতের মত এই বহুত্ববাদী ধর্মনিরপেক্ষ দেশে আধুনিক বিজ্ঞান, জাতি-রাষ্ট্র ইত্যাদি শেখানো ও আলোচনা হয় সেখান থেকে যে ভাষ্য উঠে আসছে সন্দেহ নেই তা উপনিবেশবাদের সমালোচনার একটি অংশ। বিশেষ করে উত্তর-উপনিবেশবাদের যে তত্ত্ব বা ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক বিজ্ঞান, জাতি-রাষ্ট্র ইত্যাদি আলোচনার নিশানায় রয়েছে সন্দেহ নেই। বিশেষ করে উত্তর-উপনিবেশবাদের তত্ত্ব উপনিবেশবাদকে দেখে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার একটি প্রণালী হিসেবে। সন্দেহ নেই বিশ্বাস এর মধ্যে কিছু যুক্তি রয়েছে।

আমরা যদি উপনিবেশবাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করি সেখানে তাঁর আধিপত্যের মুখ সেটা স্পষ্ট। সেটা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু একটা দিক আমরা ভুলে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের মনে রাখতে হবে উপনিবেশবাদের দ্বারা সমাজ সংস্কারের একটা প্রক্রিয়া ছিল। তা কিছুক্ষেত্রে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে থাকলেও। তাঁর মূল্য কম ছিল না ভারতের প্রেক্ষাপটে। আমাদের উনিশ শতকের জাগরণের ভৌগলিক পরিধি কতটা ছিল তা নিয়ে হাজার প্রশ্ন করলেও উনিশ শতকে রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্ত যুক্তিবাদ নিয়ে

এসেছিলেন, যেভাবে ভারতের অতীতকে বর্তমানকে ব্যাখ্যা করছেন, সেই ব্যাখ্যার কিন্তু গুরুত্ব রয়েছে। এই ব্যাখ্যা উপনিবেশবাদের হাত দিয়ে এলেও এটাকে শুধুমাত্র হেজিমনি বা আধিপত্য বলে উড়িয়ে দিলে যুক্তিবাদকে অস্বীকার করা হয়। আমরা জানি যে উপনিবেশবাদের একমাত্রিক চরিত্র নেই। ভারতীয় উপনিবেশবাদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য নিয়ে একাধিক মত আছে। আমরা বলতে পারি না তার রূপ-বিভিন্নতা স্বরূপ উপনিবেশবাদের আধিপত্যকামী স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উত্তর-আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নের মধ্যে ফেলে দেওয়া মানে আমাদের দেশকে অনেক পিছিয়ে দেওয়া।

আমাদের দেশের ইতিহাস চর্চা আশির দশকে বদল হয়ে যায়, ইতিহাসের ওপর চলে যায় মার্ক্সীয় দর্শন এবং সাব-অলটার্ন বা নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার মধ্যে একটা বিশেষ দিক দেখতে পাই। তথাকথিত আধুনিকতার সাথে এর মিলন উচ্চবর্গের মধ্য দিয়ে এসেছে উচ্চভূমিকে কেন্দ্র করে। সেখান থেকে দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যায়। কেননা বিজ্ঞান চর্চা ছিল উচ্চ বর্গীয়দের জন্য।

বিজ্ঞান চর্চার যেহেতু উচ্চবর্গের মধ্যে চর্চিত হয়েছে। সেখানে কী নিম্নবর্গ বঞ্চিত হবে? জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্ভবের পেছনে উচ্চ এবং নিম্ন শ্রেণির ভূমিকা থাকে এবং সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান সবার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে।

এই আমাদের মতো দেশে যেখানে এখনও দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অন্ধকারাচ্ছন্ন বিষয়গুলোতে আটকে সেখানে বিজ্ঞানের ব্যাপকভাবে প্রচার করা প্রয়োজন। বিজ্ঞান রাষ্ট্রশাসনের বিরুদ্ধে সরব হয়ে নয়া বিজ্ঞানের পদ্ধতিতন্ত্রের এমন কতগুলো বৈজ্ঞানিক উত্তর খোঁজার এখনও চেষ্টা করছে, একটা পদ্ধতি

মেনে নতুন দিশা দেখানোর পথে এগিয়ে চলেছে। এবং আলোর দিশা দেখানোর চেষ্টা করছে। যার সুফল আমাদের আরও আলোকিত করছে যাকে না মেনে নিলে মৌলবাদীদের শক্ত করবে বহুত্ববাদী সংস্কৃতি, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং আমরা বেঁচে থাকতে পারি। আশিস নন্দী যখন ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাদ দিয়ে বিরোধী ইস্তেহার লিখলেন রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে তখন ধর্মনিরপেক্ষতা বিরোধী শক্তিরা আরও শক্তিশালী হয়ে গেল। এবং আমাদের দেশের উগ্র-জাতীয়তাবাদী হিন্দুত্ববাদ সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতাকে তারা মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র করল বিজ্ঞানের দর্শনের যুক্তি সংস্কৃতি খুঁজতে গিয়ে কিছু ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি, প্রাতিষ্ঠানিক বিরোধিতা করতে গিয়ে তারা বিজ্ঞানকেই আজকে ছোটো করছে।

কার্ল মার্ক্স মধ্য উনিশ শতকে বলেছিলেন, যে আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে শোষণ ও শাসন থেকে মুক্তি দিতে পারে। সেই বিজ্ঞানকে এই পুঁজিবাদী বুর্জোয়া সমাজ থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে তাকে শ্রমিক শ্রেণির কল্যাণে নিয়োজিত করতে হবে, আমরা কিন্তু বিজ্ঞানকে সমাজের ও সর্বজনীন কাজে ব্যবহার করতে শিখিনি, কারণ বিজ্ঞানকে এই পুঁজিবাদী বুর্জোয়া সমাজ দখল করে রেখেছে।

ভারতের প্রেক্ষাপটে দাড়িয়ে সারা পৃথিবীর রাজনৈতিক অভিমুখের কথা মাথায় রেখে কিন্তু বুঝতে হবে যে বিজ্ঞানের দর্শন, বিজ্ঞানের যুক্তি, বিজ্ঞানের পদ্ধতি আমাদের অজানা প্রশ্নকে খুঁজতে সাহায্য করবে। ফলে যা জানা হয়নি সেটা সম্পর্কে একটা Abstract ধারণা করে নেওয়া এবং তার সাহায্যে বিজ্ঞানের বিরোধিতা করে পথে নামি তাহলে

কিন্তু আমরা আবার পিছনে ফিরে যাব। তাই এই লড়াই শুধুমাত্র পদ্ধতিতন্ত্রের ত্রুটিকে সামনে রেখে বিজ্ঞানের বিরোধিতা করছে সেই তাত্ত্বিকদের বিরুদ্ধে লড়াই ও চিন্তার চালিকাশক্তি পুঁজিবাদের সাথেও লড়াই। আজকের শিক্ষা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করতে শেখায় না, বিজ্ঞান যে একটা চিন্তাপদ্ধতি সেই চিন্তা সমাজের তৃণমূলস্তরে পৌঁছাতে হবে। এবং সমাজের সকল সমস্যার উৎস কী এবং সমাধানের জন্য এই বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতির দ্বারা নিরুপণ করতে হবে ও সেই চিন্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

তথ্যসূত্র:
1. দীপেশ চক্রবর্তী, *প্রভিন্সিয়ালাইজিং ইউরোপ*
2. পারভেজ হুদভয়, *ইসলাম ও কোরান*
3. আশীষ নন্দী, পুস্তক সমূহ
4. জে. ডি. বার্নাল, *বিজ্ঞানের ইতিহাস*
5. সমরেন্দ্রনাথ সেন, *ইতিহাসে বিজ্ঞান*
6. অ্যান্তোনীয় গ্রামসী, *পিজিন নোটবুক*
7. এডওয়ার্ড সাইদ, *পোস্ট ঔপনিবেশিক তত্ত্ব*
8. মানিক মুখার্জি, *পোস্ট- মর্ডানিজম*
9. শিবদাস ঘোষ, *মার্ক্সবাদ ও মানব সমাজ বিকাশ প্রসঙ্গে*
10. জহরলাল নেহেরু, *ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া*
11. আজিজুল ইসলাম, ওয়েবিনার গোপাল সিংহ, গবেষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

"আমরা এই বিরোধপূর্ণ সত্যের মুখোমুখি হয়েছি যে শিক্ষা বুদ্ধিমত্তা এবং চিন্তার স্বাধীনতার অন্যতম প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।"
— বার্ট্রান্ড রাসেল



৮০০ বছরেও কেন মুসলিমরা বিজ্ঞানবিমুখ?

মুসলিমরা একবারও প্রার্থনা করে বলে না যে, ‘হে আল্লাহ, আমাদের তুমি ইহুদি-নাসারাদের মত জ্ঞানী বানিয়ে দাও। তারা অন্তত বলতে পারে, হে আল্লাহ আমাদের জ্ঞান দাও যাতে আমরা উন্নতি করতে পারি। তারা কেবল, ইহুদি নাসারাদের পতন চায়।...**মুজিব রহমান**

আব্বাসীয় সাম্রাজ্যে ভাঙন, মঙ্গোল আক্রমণ, স্পেনসহ বিভিন্ন স্থান থেকে মুসলিমদের পিছু হটা কিংবা মুসলিমদের মধ্যে দর্শন-বিজ্ঞান বিরোধী মনোভাব তৈরি হওয়া ইত্যাদি যে কারণেই হোক ইসলামি স্বর্ণযুগের বিলুপ্তি হয়েছে কমবেশি আটশো বছর। এরপরে মুসলিমরা বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্য ইত্যাদি কোন জ্ঞানেই আর এগিয়ে যেতে পারেনি। এরমধ্যে আসা সালাফি মতাদর্শ তাদের আরও পিছিয়ে দেয়। একটা কট্টরপন্থার চেয়ে তারা ঢুকে পরে আরেকটি কট্টর পন্থার দিকে। তারা ধর্মশিক্ষায় আচ্ছন্ন থেকেছে। তারা আল

আজহার, আলীগড় কিংবা দেওবন্দ মাদ্রাসা নিয়ে যতই গর্ববোধ করুক কিন্তু ওখানে যে শিক্ষা দেয়া হয় তা তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথ আরও রুদ্ধই করে দেয়। তারা জ্ঞানের অন্বেষণের চেয়ে ঐশি শক্তির কাছে প্রার্থনা করাকেই সমস্যা সমাধানের পথ হিসেবে দেখতে চায়। কিন্তু কোন ঐশি শক্তিই মুসলিমদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসেনি।

সবাই জানতো যে, হামাসের আক্রমণে শেষ পর্যন্ত মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়বে গাজার সাধারণ মানুষ। ইতোমধ্যে মৃতের সংখ্যা চারহাজার অতিক্রম করেছে। আমার এলাকাতেও দেখলাম প্রতিবাদ সমাবেশ ও রাস্তায় দোয়ার আয়োজন। অনেকেই ইসরাইলি ও ইহুদিদের পণ্য বয়কটের ডাক দিচ্ছেন। এই বর্জনের সীমা এতোটাই প্রকট হবে যে, তা কারও পক্ষেই আর বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। যারা ডাক দিচ্ছেন দেখা যাবে যে, তারাই নিমজ্জিত রয়েছেন, ইহুদিদের আবিষ্কার করা পণ্যে। ফেসবুকেই বেশি সরব হচ্ছেন অনেকে কিন্তু যে ফেসবুকে বয়কটের ডাক দিচ্ছেন তাও একজন ইহুদির করা। চিকিৎসা বিজ্ঞান, ইলেক্ট্রনিক্স ও ইলেকট্রিক আবিষ্কার, ইন্টারনেট টেকনোলজি, পদার্থ, রসায়ন ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রেই তাদের আবিষ্কারকে মেনে নিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আবাবিল পাখির মিথ ইসরায়েলকে ধ্বংস করতে পারবে না। বাস্তবিক ইসরায়েলকে ধ্বংস করারও দরকার নেই। যদি জ্ঞান বিজ্ঞানে মুসলিমরাও এগিয়ে যেতে পারে তবে মুসলিমদের কোন সমস্যাই থাকবে না। আজ মুসলিমদের প্রধান সমস্যাই অশিক্ষা ও কুশিক্ষা। এই অশিক্ষা ও কুশিক্ষাই মুসলিমদের আটকে রেখেছে আটশো বছর আগের অবস্থানে।

মুসলিম স্বর্ণযুগের জ্ঞানীরা নির্ভর করেছিল গ্রীক বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের উপর। তারা ফার্সি/আরবিতে অনুবাদ করে নিয়েছিল গ্রীক জ্ঞান। আর

তার উপর ভর করেই এগিয়েছিল বাগদাদের দার্শনিক-বিজ্ঞানী-সাহিত্যিকরা। আজ বলা হয়, বাগদাদের সেই জ্ঞানই ইউরোপে এনে দিয়েছিল রেনেসাঁ। ইউরোপ মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড করেছিল। তারা পারস্যের জ্ঞানকে অস্বীকার করেনি। যত্ন করে সাথে করে নিয়ে অনুবাদ করেছে। সেই জ্ঞানকেই ভিত্তি করে এগিয়েছে। আর মুসলিমরা হায় হায় করেছে। এই হায় হায় করাটা আমরা ভারতেও দেখেছি। যখন ইংরেজরা আসলো তখন ইংরেজদের জ্ঞান হিন্দুরা গ্রহণ করলেও মুসলিমরা করেনি। তারা শুরুতে ইংরেজদের তাড়াতে সচেষ্ট থেকেছে। পরবর্তীতে আমরা দেখি ভারত থেকে ইংরেজ তাড়াতে তারা অনিহাই দেখিয়েছে। বলা হয় ইংরেজরা আরব/তুরস্ককে হাত করেই ভারতের মুসলিমদের নিকট ইংরেজদের পক্ষে থাকার বার্তা এনেছে। ইংরেজদের পক্ষে শেষ দিকে থাকলেও তাদের জ্ঞান গ্রহণে অনিহাই প্রদর্শন করেছে।

আমি একটি মাদ্রাসা কিছুদিন শিক্ষকতা করেছি। সেখানে লেখাপড়া বলে কিছু ছিল না। হুজুর শিক্ষকরা ব্যস্ত থাকতে ওয়াজের জন্য গলায় সান দিতে। আমাকে নিতে হতো একসাথে তিন-চারটি ক্লাস। সেভেনে পড়া দিয়ে ছুটতাম একাদশে, সেখানে পড়া দিয়ে চতুর্থ শ্রেণিতে। গণিত খাতা দেখার দায়িত্ব পড়ল। ক্লাস সেভেনে সবাই ফেল করেছে। খাতা দেয়ার আগে এক ছাত্র দাঁড়িয়ে বলল, স্যার গতবার হুজুরে ৯৯ দিয়েছে এবার কিন্তু ১০০ দিতে হবে! ওরা কেন অংকে ভুল করে তা আগে বুঝিয়ে বললাম। এরপর খাতা দিলে ওরা মেনে নিল এবং জানাল কেউ তাদের এমনভাবে বলেনি। অন্যদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, কেন এভাবে নাম্বার দেয়া হয়। তারা বলেছিলেন, ‘দিয়া থন, পোলাপান খুশি থাকবো’। এভাবে খুশি থাকা

পোলাপানেরতো জ্ঞানের বিকাশই হয় না। ফলে তারা লুতুকওমে ব্যস্ত থাকে সময় কাটাতেও। এভাবে জ্ঞানবিমুখ থাকলে আরও আটশো বছরেও মুসলিমদের কোন উন্নতি হবে না।

হিন্দু, ইহুদি, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ- কারও সাথেই বৈরিতা করার যুগ এটা নয়। এখন যারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে এগিয়ে যাবে কদর হবে তাদেরই। উনবিংশ শতক পর্যন্ত ইহুদিরা ইউরোপে এবং বিশ্বজুড়েই নিপীড়িত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও বিপুল সংখ্যক ইহুদিকে হত্যা করা হয়। তারা এখন সংখ্যায় কমবেশি মাত্র দেড় কোটি। অনেকেই হাহাকার করে কেন পাশ্চাত্য গুটি কয়েক ইহুদিকে সমর্থন দিচ্ছে সবসময়? কেন ইসরায়েলের আগ্রাসনকে মেনে নেয়? পাশ্চাত্য জানে গুটি কয়েক ইহুদি শিক্ষা ও বিজ্ঞানে কী দারুণ ভূমিকা রেখে চলছে। তাদের জ্ঞানের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে পাশ্চাত্যকেই। আর মুসলিমদের জ্ঞান হল ঐশি শক্তির উপর নির্ভরশীরতা। অন্যদের ফাঁসাতে তারা অনবরত দোয়া-দরুদ পড়তে থাকে। শেষে তা কোন কাজে না আসলে নামে প্রতারণায়। আমরা বাংলাদেশে দেখি একজন মুসলিম মৌলবাদীই কোরআনে পায়খানা করে হিন্দুদের ফাঁসাতে চায়, মন্দিরে প্রতিমার হাতে কোরআন রেখে ঝামেলা করতে চায়। ফলে তাদের কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। যখনই শুনেছি হনুমানের হাতে কোরআন তখনই সন্দেহ করেছি কোন মুসলিম মৌলবাদী ধর্মান্ধ উন্মাদের কাজ এটা। অনেকেই এমন আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। বাস্তবে হয়েছেও তাই।

ইহুদি-নাসারাদের ধ্বংস চেয়ে কী পৃথিবীর কোন লাভ আছে। ক্ষতি রয়েছে মারাত্মক। মুসলিমরা একবারও প্রার্থনা করে বলে না যে, ‘হে আল্লাহ, আমাদের তুমি ইহুদি-নাসারাদের মত জ্ঞানী বানিয়ে

দাও। তারা অন্তত বলতে পারে, হে আল্লাহ আমাদের জ্ঞান দাও যাতে আমরা উন্নতি করতে পারি। তারা কেবল, ইহুদি নাসারাদের পতন চায়। গতকালও দেখলাম সেই বার্তাই। গত আটশো বছরে আল্লাহ একবারও মুসলিমদের আহবানে সাড়া দেননি। এভাবে চললে আগামী ৮ লক্ষ বছরেও আল্লাহ সাড়া দিবেন না। এখন মুসলিমদের এগিয়ে যেতে হলে, ইহুদি-নাসারাদের জ্ঞানকেই ভিত্তি ধরে এগিয়ে যেতে হবে। গ্রহণ করতে হবে, তাদের গণতন্ত্র ও মানবতাবোধ। এরপর তাদের জ্ঞান গ্রহণ করতে হবে। এখন পৃথিবীতে এমন একটি মুসলিম প্রধান দেশও নেই যেখানে গণতন্ত্র আছে। মুসলিমরা গণতন্ত্র বুঝে না তারা বুঝে পীর বা স্বৈরশাসকের পেছনে দৌড়াতে হবে। তারা বুঝে নিজেদের ব্যর্থতার দায় চাপিয়ে দিতে হবে অন্যদের উপর। প্রথমে চাপায় পাশ্চাত্যের ষড়যন্ত্রের উপর, তারপর বিরোধী মতের উপর, এরপর প্রতিবেশি গোষ্ঠীর উপর, এরপর ভাইয়ের উপর এবং শেষ নিজের স্ত্রী-শাশুড়ির উপর। এ ধারায় অভিশাপও চলতে থাকে। এটাই আমাদের শিক্ষা।

ধর্মভিত্তিক শিক্ষা, দলকানা শিক্ষা, বিজ্ঞানবিরোধী শিক্ষা মুসলিমদের এগিয়ে দেয়নি। কোনদিন দিবেও না। ওয়াজে দাবী করা হয়, যদি মুসলিমরা সবাই সহিভাবে ধর্মে আচ্ছন্ন থাকে তবেও তারা এগিয়ে যাবে। ফলে ধর্মশিক্ষা বাম্পার হচ্ছে এবং যথারীতি এমন শিক্ষায় মুসলিমরা তলিয়ে যাচ্ছে। কেবল ধর্মীয় অন্ধত্বের কারণেই মুসলিমরা আটশো বছর ধরে বিজ্ঞানবিমুখ রয়েছে। প্রতিকারও তাদের হাতে। তারা তা গ্রহণ করবে কিনা তাদেরই ভেবে দেখতে হবে।



ঈশ্বর : এজেন্ট ও মার্কেটিং

যে মহাপুরুষের 'প্রোডাক্ট মার্কেটিং'-এ ভূমিকা যত বড়ো, তিনি তত বড়ো মহাপুরুষ... **সুদীপ্ত বিশ্বাস**

যে কোনও প্রোডাক্ট মার্কেটে বিক্রির জন্য ভালো মার্কেটিং এর জুড়ি নেই। মার্কেটিং ঠিকঠাক করতে পারলে অনেক সাধারণ প্রোডাক্ট বাজার কাঁপিয়ে দিতে পারে। মার্কেটিংয়ের এই গুরুত্বের জন্যই মার্কেটারদের এত মোটা মাইনে দিয়ে কোম্পানিতে পোষা হয়। কারণ এরাই কোম্পানির প্রধান মেরুদণ্ড। মার্কেটিং খুব ভালো হলে প্রোডাক্ট যতই নিম্নমানের হোক না কেন, তা বাজারে চলতে থাকে। মার্কেটিংয়ের এমনই গুণ যে প্রোডাক্ট হিসেবে খুব কিছু উচ্চদরের না হলেও সেটা বাজারে প্রোডাক্ট হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া সম্ভব। শুনতে অবাক লাগলেও বাস্তব সত্য এটাই। মিথ্যে লোভ দেখিয়ে মানুষকে বোকা বানিয়ে মানুষের সর্বস্ব নিয়ে নেওয়া সম্ভব ভালো মার্কেটিং করতে পারলে। বিভিন্ন চিটফান্ড কোম্পানিগুলো এভাবেই টাকা তোলে জনগণের থেকে। শুধুমাত্র মার্কেটিংয়ের গুণেই প্রোডাক্ট বিক্রি করে ফেলা সম্ভব। জনগণের মনে প্রোডাক্ট সম্পর্কে অন্ধ আস্থা তৈরি করা সম্ভব।

খুব গরমে আমাদের যখন তেষ্টা পায় তখন আমরা ঠাণ্ডা কোন পানীয় খুঁজি। কিন্তু আমাদের তেষ্টা পেলেই আমরা যদি কোকাকোলা খেতে চাই তাহলে বুঝতে হবে এটা কোকাকোলা কোম্পানির মার্কেটিং এর জন্যই সম্ভব হয়েছে। যদি আমরা পেপসি, স্প্রাইট বা অন্য ব্র্যান্ড ছেড়ে শুধুমাত্র কোকাকোলা ব্র্যান্ডের দিকেই আকৃষ্ট হই তাহলে তা কোকাকোলা ব্রান্ডের মার্কেটিং এর সার্থকতা। একইভাবে জুতো কিনতে আমরা যদি শুধু উডল্যান্ড এর জুতো প্রেফার করি তাহলে সেটা উডল্যান্ড কোম্পানির মার্কেটিং এর গুণ। এজন্যে মার্কেটাররা আমাদের চিন্তাভাবনাকে নির্দিষ্ট দিকে চালিত করে। আমাদের চিন্তাভাবনাকে তারা কিছুটা আচ্ছন্ন করে দেয়। আমাদেরকে তাদের মত করে ভাবতে শেখায়।

আজ অবধি পৃথিবীতে যে বস্তুটির সবচেয়ে বেশি মার্কেটিং করা হয়েছে তার নাম হল ঈশ্বর। প্রোডাক্ট না বলে এটাকে কনসেপ্টও বলা যেতে পারে। কেউ এটাকে ট্যানজেবল প্রোডাক্ট আবার কেউ এটাকে ইনট্যাঞ্জেবল প্রোডাক্ট বা কনসেপ্ট হিসাবে মার্কেটিং করেছেন। এখানে বাস্তবে কোনও প্রোডাক্টই নেই। প্রোডাক্ট না থাকলেও মার্কেটিং এত জোরালো হয়েছে যে জনগণের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস তৈরি হয়ে গেছে প্রোডাক্টের বিষয়ে। বড়ো বড় মার্কেট গুরুরা তাদের বিদ্যাবুদ্ধি এখানে লাগিয়েছেন। দারুণ মার্কেটিং এর জন্য এই প্রোডাক্ট কেউ কখনো চোখে না দেখলেও সকলেই বিশ্বাস করে প্রোডাক্টটি আছে। অথচ প্রোডাক্টের কোনও অস্তিত্বই নেই। এটাই মার্কেটারদের সার্থকতা। প্রোডাক্ট ছাড়াও মার্কেটিং সম্ভব। এজন্য দরকার খুব স্ট্রং নেটওয়ার্কের।

ইন্সেন্টিভ? হ্যাঁ প্রচুর ইনসেন্টিভ পেয়েছেন এই প্রোডাক্টের মার্কেটারেরা। তারা নিজেদেরকে সমাজের উঁচু স্তরে উন্নীত করেছেন, তারাই বিভিন্ন আইন কানুন তৈরি করেছেন, তারাই কাজ করেছেন ঈশ্বরের এজেন্ট

হিসাবে। তারা নিজেদেরকে মহাপুরুষ হিসাবে তকমা লাগিয়ে দিয়েছেন। মানুষকে তারা অন্ধকারে রেখে দিয়েছেন, মানুষের চিন্তাধারাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন। সাধারণ মানুষকেও এজেন্ট হিসাবে বা প্রচারক হিসেবে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছেন। মানুষের মধ্যেই প্রোডাক্ট সম্পর্কে একটা অন্ধবিশ্বাস ধরিয়ে দিতে পেরেছেন। মানুষ কেউ কখনো এ প্রোডাক্ট দেখেনি তবু মানুষ এই প্রোডাক্ট সম্পর্কে পুরোপুরি বিশ্বাস করে। কেউ যদি বলে প্রোডাক্টটির কোনো অস্তিত্বই নেই তবে হাঁ হাঁ করে অন্যেরা তেড়ে আসে তার দিকে। এসবই হল স্ট্রং মার্কেটিং এর ফল।

প্রোডাক্টটি আবার কয়েকটি ব্র্যান্ড নেমে বিক্রি হয়। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ইত্যাদি বিভিন্ন ব্র্যান্ডনেমে এই প্রোডাক্ট পাওয়া যায়। যারা যে ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট একবার নিয়েছে তারা সাধারণত সেই ব্র্যান্ডের প্রোডাক্টই পছন্দ করে। জন্মের খুব শুরু থেকে মৃত্যু অবধি এই প্রোডাক্টের বাইরে তারা যেতে পারে না। গোটা সমাজ এই মার্কেটিং ‘এ কাজ করে। প্রতিটি ব্র্যান্ড অন্য ব্র্যান্ডের রাইভ্যাল। এক ব্র্যান্ডের খদ্দের অন্য ব্র্যান্ডের খদ্দেরদের দু’ চোখে দেখতে পারে না। সম্ভব হলে পরস্পরের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি পর্যন্ত শুরু করে দেয়। প্রত্যেকেই মনে করে তাদের ব্যবহৃত ব্র্যান্ডটিই সেরা। অন্য ব্র্যান্ডের খদ্দেরকে নিজের ব্র্যান্ডের খদ্দেরে কনভার্ট করতে প্রত্যেকেই চেষ্টা করে। এজন্য প্রচুর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ অবধি হয়েছে। ঘরছাড়া, দেশছাড়া হয়েছেন প্রচুর মানুষ।

অনেক লোকজন এই প্রোডাক্টের মার্কেটিং এর সঙ্গে যুক্ত। গোটা পৃথিবীটাই মার্কেট। মার্কেট সেগমেন্ট হিসেবে পৃথিবীকে ভাগ করা হয়েছে বিভিন্ন সেগমেন্টে। কোনো কোনো দেশ কোনো কোনো বিশেষ ব্র্যান্ডের প্রোডাক্টকে বেশি পছন্দ করে। প্রোডাক্ট এর ক্ষেত্রে

ব্যক্তিগত প্রেফারেন্সকে খুব একটা মূল্য দেওয়া হয়না। ব্যক্তির জন্ম থেকেই কোন্ ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট তাকে নিতে হবে সেটা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। তার অপছন্দ হলেও সেই ব্র্যান্ডের প্রোডাক্টটিই তাকে নিতে হবে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। এর বাইরে কী যাওয়া সম্ভব নয়? সম্ভব, কিন্তু তা খুব জটিল এবং কষ্টকর। আফিমের নেশার মত এই প্রোডাক্টের নেশা মানুষের রক্তে-মজ্জায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এরপর প্রত্যেকটি মানুষ এমন ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে যায় যে তার সমস্ত বিদ্যা-বুদ্ধি, চিন্তা-চেতনা লোপ পায়। আস্তে আস্তে মানুষ নিজেও এই প্রোডাক্টের মার্কেটিং এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় নিজের অজান্তেই। প্রোডাক্ট সেলের জন্য বিভিন্ন জায়গায় ছোটো ছোটো আউটলেট খুলে দেওয়া হয়। এগুলোর নাম হল মন্দির-মসজিদ-গির্জা। এই আউটলেট খোলার জন্য সাধারণ মানুষেরা নিজেরাই তাদের গাঁটের কড়ি খরচ করে! সাধারণ মানুষের চিন্তা-ভাবনা-চেতনাকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে দেওয়া হয় যে সাধারণ মানুষ এর বাইরে কিছু ভাবতেই পারেনা। যারা প্রোডাক্ট মার্কেটিং' এ বড়ো বড় এজেন্ট হিসেবে কাজ করে তারা দাবি করে, তারা প্রোডাক্টটি দেখেছে। তারা উচ্চমানের অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মানুষ তাই তারা এই অলীক প্রোডাক্ট দেখতে পেয়েছে! সাধারণ মানুষ প্রোডাক্টটি দেখতে পায় না। যারা প্রোডাক্টটি দেখতে পায়না বা দেখেনি তাদেরকে নিম্ন শ্রেণির মানুষ বলে ধরা হয়। নিম্ন শ্রেণির মানুষেরা যারা প্রোডাক্টটি দেখেছে তাদেরকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখে। ওই ধরনের বুজরুক মিথ্যাবাদী মানুষকে প্রোডাক্টের ডাইরেক্ট এজেন্ট বলে ধরে নেওয়া হয় এবং তাদেরকেই মহাপুরুষ বলা হয়। 'প্রোডাক্ট মার্কেটিং'-এ এরা খুব বড়ো ভূমিকা রাখেন। যে মহাপুরুষের 'প্রোডাক্ট মার্কেটিং' এ ভূমিকা যত বড়ো, তিনি তত বড়ো

মহাপুরুষ। কেউ কেউ আবার যুক্ত হয়ে যায় প্রোডাক্টের গুণাবলী সম্পর্কিত পুস্তক রচনা করার কাজে। এই পুস্তকগুলিকে ধর্মগ্রন্থ বলা হয়। সাধারণ মানুষ এই পুস্তকগুলোকে অত্যন্ত সমীহ করে চলে। এইসব পুস্তকে যত আজগুবি জিনিসই লেখা থাকুক না কেন, সকলেই তা বিশ্বাস করে। এইসব পুস্তক যত পুরোনো হয় তার অভ্রান্ততা ততই বেড়ে যায়। এসব পুস্তক সম্পর্কে ভালো মন্দ কোনো ধরনের কোনও প্রশ্ন করা যায় না। পুস্তকে যাই লেখা থাকুক না কেন তা মেনে চলতে হবে। কেউ মানতে না চাইলে তাকে শায়েস্তা করতে রে রে করে ছুটে আসে সেই প্রোডাক্টের অন্যান্য খদ্দেররা। এভাবে ব্র্যান্ড লয়াল কাস্টমারেরাও মার্কেটিং এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সারা পৃথিবীতে এই অস্তিত্বহীন অলীক প্রোডাক্টকে প্রোমোট করে চলছে। রমরমিয়ে চলছে মার্কেটিং, সমৃদ্ধ হচ্ছে ব্যবসা।

Sudipta Biswas, (WBCS Exe.)
Ranaghat, Nadia

ধর্মেই রয়েছে সমস্ত অকাজ-কুকাজ করেও পার পাওয়ার ঢালাও ব্যবস্থা। মক্কা, জেরুজালেম, পুরী, বারাণসী কি তিরুপতি, এ'সব পবিত্র স্থানে দর্শনে রয়েছে জীবনের সব পাপ ধুয়ে গিয়ে পুণ্য সঞ্চয়ের নিশ্চিন্ত গ্যারান্টি। সত্যিই ভাবুন তো, ভোগবাদী, প্রতারক, হত্যাকারী থেকে ধর্ষক প্রত্যেকের জন্যই পরম করুনাময় সব ধর্মের ঈশ্বরের কি অপার করুণা! পাপীদের উদ্দেশে ভগবান হেঁকে বলছেন– "লুটে পুটে খেতে ভয় কি রে পাগল, আমি তো আছি"।

—প্রবীর ঘোষ



‘লিঙ্গভেদ-এর দন্দ্ব’

প্রকৃতিতে যেহেতু জীবের প্রকৃত রূপ ‘স্ত্রী’ রূপে। তাই ‘পুরুষ’ রূপটি মাতৃজঠরে ভ্রূণের পরিস্ফুরনের একটি ধাপে বিশেষ কোনও কোনও পরিবর্তনের মাধ্যমেই আসে। অর্থাৎ, ‘পুরুষ’ হল ‘পরিবর্তিত’ একটি ‘স্ত্রীরূপ’... **ড. সুদীপা বসু**

‘লিঙ্গ’ বা ‘সেক্স’ সম্পর্কে জীববিজ্ঞানীদের একটা মোহ সবসময়ই লক্ষ্য করা যায়। শুধু বিজ্ঞানীরাই নন, সাধারণ মানুষ বা কিশোর-কিশোরী—এদের ‘সেক্স’ সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন করা হলে, লজ্জিত হতে দেখা যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই ধরনের বহিঃপ্রকাশের কারণ—‘অজ্ঞতা’।

‘লিঙ্গ’ বা ‘সেক্স’ কী? কেনই বা তা প্রকৃতিতে এল? কিভাবে কাজ করে এই ‘লিঙ্গভেদ’? জীববিজ্ঞানে এটাই এখন সর্ববৃহৎ সমস্যা, যার সমাধানের পথ এখনও বিজ্ঞানীরা খুঁজে চলেছেন। সুতরাং, ‘লিঙ্গ’ বা ‘লিঙ্গভেদ’ নিশ্চয়ই একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

বর্তমানের মত পুরাকালেও যে ‘স্ত্রী লিঙ্গ’ নিয়েই মাতামাতি খুব বেশি ছিল, তার নিদর্শন আছে বেশ কিছু ভাস্কর্যে। পুরনো সমস্ত শিল্পকলাই ‘লিঙ্গ’—সম্পর্কিত। প্রায় তিরিশ হাজার বছরের পুরনো গ্যালগেনবার্গের নৃত্যরতা ভেনাসের মূর্তি—যা এক অভূতপূর্ব নিদর্শন, তাকেও স্ত্রীদেহের উপমা দেওয়া হয়েছে, যদিও সে মূর্তিতে স্তন বা নিতম্ব অনুপস্থিত। আবার ইজরায়েলে খননকার্যে তোলা হয়েছিল প্রায় আট লক্ষ বছরের পুরনো এক নুড়ি। তাকেও স্ত্রী দেহের আকৃতি দেওয়া হয়। এর কারণ হয়তো প্রতিটি সৃষ্টির প্রকাশকেই বিশেষ কোনও একটি লিঙ্গের মাধ্যমে না ঘটালে স্রষ্টার কাছে তা সম্পূর্ণতা পায় না। অর্থাৎ, ‘লিঙ্গ’ সর্বত্র উপস্থিত।

‘লিঙ্গে’র সংজ্ঞা সম্পর্কে কৌতূহলও নতুন কিছু নয়। প্রখ্যাত দার্শনিক প্লেটো তাঁর ‘Symposium’-এ বলেছিলেন যে একসময় তিনটি লিঙ্গ ছিল—’পুরুষ’, ‘স্ত্রী’ ও ‘উভয়লিঙ্গ’। এই তৃতীয় লিঙ্গটিকে ক্রোধী গ্রিকদেবতা জিউস দুভাগে ভাগ করে দেন একারণেই যাতে আদি অনন্তকাল ধরে ওই দ্বিধাবিভক্ত লিঙ্গ তাদের বিপরীত লিঙ্গকে খুঁজে ফেরে। প্লেটোর মতে, লিঙ্গ সম্পর্কিত গোপন ইচ্ছাগুলিকে জিউস উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। যার ফলে, পুরুষ যখন স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়, তখন বংশ রক্ষা হয়, প্রজাতির অস্তিত্ব বজায় থাকে। আর পুরুষ যখন অপর এক পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন তার শক্তি বৃদ্ধি হয়। যদিও প্লেটোর এই ব্যাখ্যায় লিঙ্গের উৎপত্তির কোনও সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু লিঙ্গ-ঘটিত আকর্ষণের ধরনগুলির একটা ধারণা পাওয়া যায়।

প্রকৃতপক্ষে, বিজ্ঞানের সাহায্যে এই ‘লিঙ্গে’র সংজ্ঞা দেওয়া কোনও কঠিন কাজ নয়। জীববিজ্ঞানীদের মতে, ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্গ হল ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন ‘জিনে’র এক সম্মিলিত কর্মক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য যুক্ত ‘সৃষ্টি’ যার ফলে ভিন্ন ভিন্ন পূর্বপুরুষ থেকে আসা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বংশগতির ধারা একটি বংশে এসে একটি ‘সৃষ্টি’র মধ্যে মিলিত হয়। অযৌন জননের ক্ষেত্রে (যেখানে সন্তান উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হয় না দুটি ভিন্ন লিঙ্গের, কেবলমাত্র স্ত্রীই সক্ষম সন্তান জন্মদানে, অবশ্যই সমস্ত সন্তানই কন্যা সন্তান) প্রতিটি সৃষ্টির ক্ষেত্রেই থাকে একটি ‘মা (বাবা নেই) এবং একটি দিদিমা (মায়ের মা, কারণ মায়ের কোনও বাবা নেই, যেহেতু প্রয়োজন নেই)। এইভাবে পূর্বপুরুষদের মধ্যে যতই ওপরদিকে যাওয়া যাক না কেন, সকলেরই সৃষ্টি ওই কেবলমাত্র একটি ‘মা’ বা ‘স্ত্রী’ থেকেই এবং সকলেই একই বংশের। কিন্তু যৌন জননকারী জীবদের ক্ষেত্রে দেখা যায় এর ব্যতিক্রম—প্রতিটি সৃষ্টির ক্ষেত্রেই বংশধারার যত ওপরে যাওয়া যায়’ ততই প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্বপুরুষের সংখ্যা দ্বিগুণ হতে থাকে। কেননা, প্রতিটি জীবের ক্ষেত্রেই থাকে তার একটি ‘মা’ এবং একটি ‘বাবা’, অর্থাৎ, দুজন পূর্বপুরুষ। এদের আগের বংশে থাকে চারজন পূর্বপুরুষ—’মা’-এর ‘মা’ ও ‘বাবা’ এবং ‘বাবা’-র ‘মা’ ও ‘বাবা’। অর্থাৎ, পূর্বপুরুষদের সংখ্যা ক্রমশ দ্বিগুণ হতে থাকে। যখন পিতার ‘শুক্রাণু’ বা ‘স্পার্ম’ এবং মাতার ‘ডিম্বাণু’ বা ‘ওভাম’ মিলিত হয়, প্রতি ক্ষেত্রেই ‘জিনে’র সংখ্যা হয় দেহকোষে উপস্থিত জিন সংখ্যার ‘অর্ধেক’। আর বংশ পরম্পরায় নতুন নতুন কম্বিনেশনে তৈরি হয় নতুন বংশধর। তাই ‘লিঙ্গভেদ’ই দায়ী জিনগুলিকে অদল-বদল করে নতুনভাবে সাজিয়ে কোনও এক বংশের বংশধর সৃষ্টির জন্য।

এই হল ‘লিঙ্গভেদ’। কেন তা প্রকৃতিতে বিরাজমান

তার ব্যাখ্যা দেওয়া একটু কঠিন যদিও। তবে একটা মতবাদ প্রচলিত আছে যে, জীবের অস্তিত্ব কেবলমাত্র 'স্ত্রী' রূপে হতে পারেনি জীবনের মূল চাবি-কাঠি 'ডি এন এ'র মধ্যে অনবরত চলতে থাকা পরিবর্তনের জন্য, যাকে বলা হয় 'মিউটেশন'। কেননা যেসব প্রজাতির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র 'স্ত্রী' রূপেই তাদের অস্তিত্ব, তাদের 'ডি এন এ'তে (বা কোনও জিনে) ক্ষতিকারণ কোনও পরিবর্তন এলে, তার হাত থেকে তাদের রেহাই পাওয়া দুষ্কর-তাদের বংশ পরম্পরায় বহন করে যেতে হবে ওই অযাচিত পরিবর্তনটিকে এবং এমন সব পরিবর্তনকে বহন করতে হবে যা তাদের প্রকৃতিতে টিকিয়ে রাখার পরিপন্থীই হবে, যদি না অপর কোনও একটি 'পরিবর্তন' এতে দেখা দেয়, যা তাকে বাঁচিয়ে দিতে পারে এর ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে। তবে এ ধরনের অপর একটি পরিবর্তন কোনও প্রজাতিতে আসা খুব সহজ নয়। বরং, অপর কোনও একটি 'জিনে' পরিবর্তন এসে গেলে, তা অপর কোনও একটি বৈশিষ্ট্য' এনে দেবে বৈশিষ্ট্যতে, এবং যা ক্রমশ ধ্বংসের দিকেই নিয়ে যাবে। ঠিক যেমন আমাদের দেহকোষগুলিতে ঘটে।

আমাদের দেহকোষগুলি কাজ করতে করতে এক সময় কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। 'জরা' বা 'বার্ধক্য' এসে পড়ে। এবং এই পরিবর্তনে 'পুরুষ' বা 'স্ত্রী' লিঙ্গের দেহকোষে খুব একটা বেশি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। এই কারণেই, অযৌন জননকারী জীবের ক্ষেত্রে পরিবর্তনগুলি পরবর্তী প্রজন্মে যেতে যেতে একসময় তা বিলুপ্তির কারণ ঘটায়। তবে যৌন জননকারী প্রজাতির ক্ষেত্রে তা বাড়তি সুবিধা এনে দেয়। প্রকৃতির সঙ্গে ক্রমাগত অভিযোজিত হতে হতে ডি এন এ বা জিনের নতুন পরিবর্তনগুলি নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীবের উৎপত্তি ঘটায় এবং যার ফলে পুরনো বৈশিষ্ট্য নিয়ে থাকা প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষাতেও কোনও সমস্যা সৃষ্টি করে না। একারণেই দেখা গেছে, যে

সব প্রজাতি কোনও ভাবে একাধিক ‘লিঙ্গ’ লাভ করেছে, তারা কেউই আর তা বর্জন করেনি। কেননা কেবলমাত্র একটি ‘লিঙ্গ’ নিয়ে প্রকৃতিতে টিকে থাকা সহজ কাজ নয়।

অবশ্য বেশ কিছু প্রজাতি আজও টিকে আছে কেবলমাত্র একটি ‘লিঙ্গ’ ভরসা করেই। যেমন: জলজ প্রাণী ‘রটিফার’, চাবুকের মত লেজওয়ালা গিরগিটি, ‘হুইপ টেল লিজার্ড’, বেশ কিছু প্রজাতির মাছ, যেমন ‘স্টার্জান’ প্রভৃতি। তবে এরা সকলেই ‘বিরল’ প্রজাতি এবং ক্রমশ বিলুপ্তির পথে। বিজ্ঞানীদের মতে, এদের বিলুপ্তি রোধ করা কঠিন, কেননা বিবর্তনে একলিঙ্গ বিশিষ্ট প্রজাতি ‘অসহায়’, কুমারীত্বের কোনও মূল্য নেই। তাই বিজ্ঞানীদের মতে, ‘chastity is an evolutionary dead end’ যদিও সংযম, মিতাচার প্রভৃতি বিবর্তনের পক্ষে প্রতিকূল এমনটা ঠিক নয়। যেহেতু এ ধরনের কোনও ব্যাখ্যা এখনও দেওয়া যায়নি। তবে ‘স্ত্রী’ লিঙ্গের অস্তিত্ব প্রাণের সৃষ্টির সময় থেকেই খুব স্পষ্ট। কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে নয়। আর আজ তো এটি প্রমাণিত সত্য যে বিবর্তনে স্ত্রী জাতির উদ্ভবই আগে ঘটেছে, পুরুষ এসেছে পরে। এটি বৈজ্ঞানিকভাবেই প্রমাণিত। অর্থাৎ, বাইবেলের সেই পুরনো ধারণা, যাতে বলা হয়েছিল, প্রকৃতি সৃষ্টির তৃতীয় দিনে সৃষ্টি হয় ‘আদম’ আর পঞ্চম দিনে আদমের বক্ষপিঞ্জর থেকে ‘পঞ্জরাস্থি’ বা ‘রিব’ কেটে নিয়ে বিধাতাপুরুষ সৃষ্টি করেন তার সঙ্গী,

‘ইভ’কে, ‘আদম’-এর একাকীত্ব ঘোচাতে। এটি আজ সর্বৈব অসত্য বলে প্রমাণিত। বাস্তবে, ‘ইভ’ সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ, স্ত্রী জাতির উদ্ভব ঘটে প্রথম এবং বিবর্তনের প্রয়োজনে অন্যান্য প্রজাতির মতই মানব-প্রজাতিতেও ‘ইভে’র প্রয়োজন হয় ‘পুরুষ’ সঙ্গীর, যার সঙ্গে ‘ভাল জিন’ বিনিময় করে সে জন্ম দেবে ‘উত্তম’ প্রজাতির ‘মানব’।

অন্য প্রজাতির ক্ষেত্রে, স্ত্রীলিঙ্গের আবির্ভাবের কত

পরে পুরুষলিঙ্গ এসেছিল তার সঠিক বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন করা হয়নি, তবে মানব প্রজাতির ক্ষেত্রে, স্ত্রীলিঙ্গের বা ‘ইভ’-এর প্রায় আঠারো হাজার বছর পরে এসেছিল পুরুষলিঙ্গ বা ‘আদম’। এই তথ্য প্রমাণিত হয়েছে পুরুষের ‘Y’ ক্রোমোজোমের ডি এন এ এবং দেহকোষের ‘মাইটোকনড্রিয়াস্থিত ডি এন এ’র তুলনামূলক বিচারে।

পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়ের ক্ষেত্রেই তাদের দেহকোষের নিউক্লিয়াসের বাইরের সাইটোপ্লাজমস্থিত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি কোষীয় অঙ্গাণু এই ‘মাইটোকনড্রিয়া’ (যার কাজ হল আমাদের শ্বসন প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় উৎসেচক বা এনজাইমগুলিকে তৈরি করা) তারা লাভ করে তাদের মায়েদের কাছ থেকে। কারণ, মাতৃগর্ভে সন্তান সৃষ্টির প্রথম কোষ ‘জাইগোট’ তৈরি হয় পুরুষদেহের ‘শুক্রাণু’ ও স্ত্রীদেহের ‘ডিম্বাণু’র মিলনে। এই জাইগোট তার কোষীয় অঙ্গাণুগুলি পায় ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজম (উপ্লাজম) থেকে, যেহেতু শুক্রাণু বহন করে আনে কেবলমাত্র তার নিউক্লিয়াসটি, নিউক্লিয়াসের বাইরের সাইটোপ্লাজমের কিছুই নয়।

সুতরাং, এই মাইটোকনড্রিয়া মায়ের কাছ থেকেই সন্তানে আসে—’পুত্র’ হোক, বা ‘কন্যা’। আর যেহেতু এই মাইটোকনড্রিয়ার মধ্যে আছে প্রায় অপরিবর্তনশীল, প্রায় অবিবর্তনীয় এক ‘ডি এন এ’, ফলে বিবর্তনের ইতিহাস উদ্ধার করার জন্য ‘আদর্শ’ হল এই ‘মাইটোকনড্রিয়াস্থিত ডি এন এ’। তাই কোনও একটা প্রজাতি কত বংশ ধরে প্রকৃতিতে বিরাজমান বা কত বছরের পুরনো (অর্থাৎ কত বছর ধরে টিকে আছে), তা অনুমান করা যায় এই মাইটোকনড্রিয়ার ডি এন এ বিশ্লেষণ করে। যেহেতু, এটি মা থেকে কন্যা-সন্তানে সঞ্চারিত হয়ে আসছে সরাসরি, নিউক্লিয়াসের ডি এন এ’র মত পুরুষের শুক্রাণুর ডি এন এ’র সঙ্গে উপাদানের আদান-প্রদান বা বিনিময় ঘটেনি। এই সত্যকে ভিত্তি

করেই বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে মানব-প্রজাতির ক্ষেত্রে মাইটোকনড্রিয়ার ডি এন এ অনেক বেশি পুরনো। আর ‘Y’ ক্রোমোজোমের ডি এন এ’র তুলনায় প্রায় আঠারো হাজার বছরের পুরনো। অর্থাৎ, ‘Y’ ক্রোমোজোম এসেছে প্রায় আঠারো হাজার বছর পর। অর্থাৎ, ‘পুরুষজাতি’ বা ‘পুরুষ লিঙ্গ’ এসেছে ‘স্ত্রী জাতি’ বা ‘স্ত্রীলিঙ্গ’ আবির্ভাবের প্রায় আঠারো হাজার বছর পরে। এর ব্যাখ্যা দুটি হতে পারে-এক, প্রকৃতিতে মানব-প্রজাতির আবির্ভাবের পর আঠারো হাজার বছর ধরে কেবলমাত্র স্ত্রীজাতিটিই ছিল, যারা ক্রমাগত কন্যা সন্তান উৎপাদন করে গেছে বংশ পরম্পরায় ধরে এবং পরে বিবর্তনের পথ ধরে স্ত্রী জাতির প্রয়োজনে এসেছে ‘পুরুষ’। দুই, যৌন জননক্ষম (অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মিলনে যেখানে সন্তান-উৎপাদন হয়) এই মানব-প্রজাতিতে, আবির্ভাবের প্রথমক্ষণ থেকেই ‘স্ত্রী’ ও ‘পুরুষ’—দুটি লিঙ্গই পাশাপাশি ছিল। তবে অবশ্যই পুরুষ লিঙ্গটিতে আজকের ‘পুরুষ’-এর মত ‘Y’ ক্রোমোজোমের উপস্থিতি ছিল না। অর্থাৎ, পুরুষ ছিল এই ‘Y’ ক্রোমোজোম বিহীন। সোজাকথায় ‘পৌরুষবিহীন’।

প্রকৃতপক্ষে, পুরুষ লিঙ্গের আগমনের কারণ হল, প্রতিকূল এবং ক্রমশ পরিবর্তনশীল প্রকৃতিতে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার চেষ্টায় জিনগত কাঠামোতে পরিবর্তন আনতে আনতে এবং তা পরবর্তী প্রজন্মে (কেবলমাত্র কন্যাসন্তানে সঞ্চারিত করার জন্য) সঞ্চারিত করতে করতে। একসময় স্ত্রী লিঙ্গের প্রজাতির ক্ষেত্রে ‘জেনেটিক লোড’ বা ‘বহু জিনের ভার’ বহন করে প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে, যার ফলে তার প্রয়োজন হয় অতিরিক্ত ‘জিনের বোঝা’ থেকে অব্যহতি পাবার এবং তা সম্ভব একমাত্র অপর কারও সঙ্গে বিনিময়ের ফলেই। ঠিক এ কারণেই প্রকৃতিতে এসেছে পুরুষ। এবং অবশ্যই স্ত্রীর প্রয়োজন মেটাতে, দায়িত্ব বহন করতে।

কী ধরনের দায়িত্ব? না, বিবর্তনে প্রজাতিকে টিকিয়ে

রাখার দায়িত্ব। এই সত্য প্রমাণিত হয় পুরুষের ‘Y’ ক্রোমোজোমের উদ্ভবে। কেননা, এই ‘Y’ ক্রোমোজোম কোনও স্ত্রীর ক্ষেত্রে থাকে না, পুরুষের ক্ষেত্রেই কেবল থাকে। অথচ, স্ত্রীলিঙ্গ প্রকাশের জন্য দায়ী ‘লিঙ্গ-নির্ধারক’ ক্রোমোজোম ‘X’ কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রেও থাকে। এর প্রমাণ আমরা দেখতে পাই বেশ কিছু জেনোটিক রোগ বা জিনগত অস্বাভাবিকতার ক্রোমোজোমঘটিত ক্ষেত্রে এবং গোলযোগের ক্ষেত্রে। ‘স্বাভাবিক’ ক্ষেত্রে, দুটি ‘X’ ক্রোমোজোম নিয়ে হয় ‘স্ত্রীলিঙ্গ’ এবং একটি ‘X’ ও একটি ‘Y’ নিয়ে হয় ‘পুরুষলিঙ্গ। কোনও বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে, অর্থাৎ অস্বাভাবিক অবস্থাতেও ‘Y’ ক্রোমোজোমের ‘উপস্থিতি’ চিহ্নিত করে ‘পুরুষ’ লিঙ্গকে আর ‘অনুপস্থিতি’ চিহ্নিত করে স্ত্রীলিঙ্গকে। সেকারণে, ‘XO’ অর্থাৎ, কেবলমাত্র একটি ‘X’ ক্রোমোজোম নিয়েও সেই মানব পায় ‘স্ত্রীলিঙ্গ’, যেহেতু ‘Y’ ক্রোমোজোম অনুপস্থিত। এদের বলা হয় ‘টার্নার সিনড্রোম’। আবার, ‘XXY’, অর্থাৎ, দুটি ‘X’ ক্রোমোজোমের সঙ্গে একটি ‘Y’ ক্রোমোজোমের উপস্থিতি ‘পুরুষ লিঙ্গের প্রকাশ ঘটায়। দুটি ‘X’ ক্রোমোজোম থাকা সত্ত্বেও সে ‘স্ত্রী’ হতে পারে না ‘Y’ ক্রোমোজোমের উপস্থিতির কারণে। এদের বলা হয় ‘ক্লাইনফেল্টার সিনড্রোম’। সুতরাং, ‘Y’ ক্রোমোজোমই একমাত্র ক্রোমোজোম যে কেবলমাত্র পুরুষলিঙ্গে বিরাজমান। যখন ‘শুক্রাণু’ ও ‘ডিম্বাণু’ তৈরি হয়, তখন সমস্ত ক্রোমোজোমই তাদের সঙ্গী অপর ক্রোমোজোমটিকে খুঁজে নিয়ে তার সঙ্গে জোড়া বাঁধে, ব্যতিক্রম ঘটে শুধু ‘Y’ ক্রোমোজোমের ক্ষেত্রে। শুক্রাণু সৃষ্টির দ্বিতীয় ধাপে, কোষের হ্রাসবিভাজন (মিয়োসিস) কালে, পুরুষের শুক্রাশয়ের দেহগাত্রের কোষ ‘স্পার্মাটোগোনিয়ামে’ স্থিত লিঙ্গ-নির্ধারক ‘X’ এবং ‘Y’ ক্রোমোজোম দুটি জোড়া বাঁধতে বাধ্য হয়, যেহেতু দ্বিতীয় কেউ নেই। এই অবস্থায় ‘Y’ ক্রোমোজোমের কেবলমাত্র

'অগ্রভাগ', 'X' ক্রোমোজোমের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয় এবং তাদের মধ্যে জেনেটিক উপাদানে আদান-প্রদান ঘটে। 'Y' ক্রোমোজোমের বাকি অংশ এমনভাবে পর্দাবৃত হয়ে থাকে যে তার পক্ষে জেনেটিক উপাদানে কোনও পরিবর্তন আনা বা পরিবর্ধন ঘটানো অসম্ভব। অবশ্য এ ধরনের অদ্ভুত ব্যবস্থায় 'Y' ক্রোমোজোমের পক্ষে তার 'পুরুষালি বৈশিষ্ট্য' বা 'পৌরুষ ক্ষমতা' ধরে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জিনগুলি ছাড়া আর কিছুই প্রায়। কার্যক্ষম নয়। এই 'Y' ক্রোমোজোমের বেশিরভাগ অংশেই রয়েছে অর্থহীন কিছু ডি এন এ'র অংশ, যাদের আবার বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে ওই ক্রোমোজোমের অংশে। এ ধরনের অংশগুলিকে বলা হয় 'রিপিটেটিভ সিকোয়েন্স'। সম্ভবত এ ধরনের ডি এন এ অংশের উপস্থিতি প্রমাণ দেয় যে বহু যুগ ধরে অযৌন জননের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে আসা প্রজাতি তার অতিরিক্ত 'অযাচিত' পরিবর্তনের 'জিন-ভার' (জেনেটিক লোড) বহন করতে করতে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং তার থেকে অব্যাহতি পেতে তা অপর কোনও সঙ্গীকে প্রদান করে এবং তার ফলেই বিবর্তনে আবির্ভাব ঘটে এই 'Y' ক্রোমোজোমের। এবং অবশ্যই 'পুরুষ' লিঙ্গের। প্রকৃতপক্ষে, এই 'অযাচিত' ডি এন এ বা 'জাঙ্ক ডি এন এ' তৈরি হয়েছে পরিবর্তনশীল প্রকৃতিতে, ক্রমাগত অভিযোজিত হতে হতে এবং ওই অংশকে অপর কারও সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার মত কোনও সঙ্গী না পেয়ে। সুতরাং, এ থেকে একটি ধারণা সুস্পষ্ট যে ওই 'জাঙ্ক ডি এন এ'র অংশগুলি, যা বর্তমানে 'Y' ক্রোমোজোম বহন করে চলেছে, তা এক কথায় বীভৎস ও ভয়ংকর।

সুতরাং 'Y' ক্রোমোজোমে খুব অল্প সংখ্যক ভাল, উপকারী ও প্রয়োজনীয় 'জিন' আছে, যা সে প্রয়োজনে 'X' ক্রোমোজোমকে দিতে পারে। সেই কারণেই 'Y'-এর খুব সামান্য অংশের সঙ্গে জোড়া বাঁধতে পারে 'X'

ক্রোমোজোম। ‘Y’ ক্রোমোজোম তাই এক সংযমীর ভূমিকা পালন করে চলেছে মানব-প্রজাতিকে বিবর্তনে ভাল জায়গা করে দিতে। কারণ, লিঙ্গের আবির্ভাব একবার যখন এই মানব-জাতিতে ঘটেছে, সুতরাং তা বাহিত হতেই থাকবে বংশ পরম্পরায় ধরে। কারণ, আমরা জানি যে, লিঙ্গের উপস্থিতির কারণই হল পিতা-মাতা উভয়ের ভাল, উপকারী ও প্রয়োজনীয় জিনগুলি একত্রিত হয়ে তৈরি হবে তাদের সন্তান। আর এ ধরনের ঘটনার পাশাপাশি কিন্তু পিতা-মাতা উভয়ের ক্ষতিকারক, অপ্রয়োজনীয় জিনগুলির সংযোগেও তৈরি হবে সন্তান। অবশ্য প্রকৃতি তাকে বাতিল করে দেবে নিজ নিয়মে।

বস্তুত ‘লিঙ্গ’ হল খুব সহজ উপায়ে কোনও প্রজাতির, বিবর্তনের ফলে অর্জিত, ভাল জিনগুলির একত্রিত হওয়া ও পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হওয়া। ‘লিঙ্গ’ হল এক ধরনের ‘পূর্নসংগঠন’, যা প্রতি প্রজন্মের সৃষ্টির সময়ই ঘটে চলেছে এবং ওই প্রজাতিটি রক্ষা পেয়ে চলেছে ধ্বংসের হাত থেকে। ফলে, আর এক অর্থে, ‘লিঙ্গ’ হল ‘অমরত্বের চাবি’— ‘চিরযৌবনের অনবরত চলতে থাকা এক ধারা’। এই ধারা প্রজাতির জীবগুলিকে ‘চিরযৌবন’ লাভ করাবার জন্য নিয়মবন্ধ নয়, জিনগুলিকে ‘চিরযৌবন’ লাভ করাবার পদ্ধতি। ফলে তা বিবর্তনকে এগিয়ে নিয়ে যায় ভালর দিকে। কারণ, এই পদ্ধতি (অর্থাৎ, দুটি ভিন্ন লিঙ্গের সম্মিলিত কার্যের ফলে তৈরি হওয়া বংশধর) হাজার হাজার ‘হুবহু’ একই ‘কপি’ তৈরি করে না। বরং হাজার হাজার ‘কম্বিনেশনে’র জীব তৈরি করে যারা কিন্তু একই পিতামাতার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেকেই প্রত্যেকের থেকে আলাদা। কারণ, প্রতিটি ‘নিষিক্ত’ ডিম্বাণু এক একটি নতুন ‘চ্যালেঞ্জ’-যে তৈরি হয় পরিবর্তনশীল প্রকৃতিকে জয় করতে।

অন্য এক অর্থে ‘লিঙ্গ’ হল জটিল, কিন্তু আকর্ষণীয় এবং অবশ্যই সর্বজনীন। ‘X’ এবং ‘Y’ উভয় ক্রোমোজোমের

‘জেনেটিক ম্যাপ’ বা ‘জিনগত মানচিত্র’ তৈরির ফলে দেখা যাচ্ছে যে এদের কিছু অংশ হল ‘হট স্পট’, যে অংশে এদের উভয়ের বিনিময় বা আদান-প্রদান বেশি হয়। যদি এটিই হয় আদর্শ ব্যবস্থা, তবে কেন ‘লিঙ্গ’-কেবলমাত্র ‘পুরুষ’ ও ‘স্ত্রী’-এই দুটি রূপেই সীমাবদ্ধ? কেন আরও কোনও রূপ নেই? এছাড়াও আর একটি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে—কেনই বা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে বিনিময় করে নেয় না প্রয়োজনীয় ভাল ‘জিন’গুলিকে, যা — বিবর্তনের জন্য উপকারী। প্রকৃতিতে সমস্ত প্রজাতিই কেনই বা কেবলমাত্র ‘স্ত্রী’ ও ‘পুরুষ’ রূপে বিরাজমান (যদিও অবশ্য কয়েকটি এককোষী প্রাণীতে প্রায় ছয়টি পর্যন্ত ভিন্ন রূপের লিঙ্গের উপস্থিতি এখনও ‘আছে)। এই প্রশ্ন ওঠার কারণ—কেবলমাত্র দুটি রূপের লিঙ্গের উপস্থিতির ফলে, কোনও প্রজাতির ক্ষেত্রে, তার অর্ধেক সংখ্যক জীবের ওপর তাদের সঙ্গী নির্বাচনের জন্য (যেহেতু অনুমান করা হয় প্রকৃতিতে স্ত্রী-পুরুষ সমান সংখ্যায় বিরাজমান)। কিন্তু যদি লিঙ্গের রূপ দুটি না হয়ে হত তিনটি, তাহলে কিন্তু প্রতি লিঙ্গের জীব অপর কোনও একটি লিঙ্গের সঙ্গে মিলিত হতে পারত দুই-তৃতীয়াংশ ক্ষেত্রেই। অর্থাৎ এইভাবে লিঙ্গের রূপের সংখ্যা যত বেশি হবে, প্রতিটি লিঙ্গের ক্ষেত্রেই ‘ভাল’ জিন বিনিময় করার জন্য সঙ্গী খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে অনেক অনেক বেশি। এইভাবে বলা যায়, যদি একশো ধরনের লিঙ্গ হত, তবে শতকরা নিরানব্বই ভাগ ক্ষেত্রেই প্রতিটি জীব অন্য প্রতিটি জীবের সঙ্গে মিলিত হতে পারত। কিন্তু প্রকৃতি এ ব্যবস্থাকে আমল দেয়নি সম্ভবত দ্বন্দ্ব, সংঘাত-এসব এড়াতে। কারণ, এর সত্যতা যে আছে তার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই খুব বেশি স্পষ্ট করে ‘পুরুষ’ লিঙ্গে।

‘পুরুষ’—বিবর্তনের অগ্রগতিতে যে কোনও প্রজাতির ক্ষেত্রেই, প্রতিটি বংশ তৈরিতে, এই লিঙ্গের অবদান খুবই

সামান্য। ‘শুক্রাণু’র মধ্যেকার অত্যন্ত ক্ষুদ্র গোলাকার একটি অংশ— ‘নিউক্লিয়াস’। কোষের অন্যান্য কাজ চালাবার প্রয়োজনীয় বাকি সব অংশই বাতিল হয়ে যায় যখন শুক্রাণুটি ডিম্বাণুগাত্রকে ভেদ করে ঢোকে। অথচ এই লিঙ্গটিই সংঘাত সৃষ্টি করে সঙ্গী নির্বাচনের পদ্ধতিতে। তাই জীববিজ্ঞানীদের মতে—অত্যন্ত সহজ, সরল, সাধারণ এক পদ্ধতিতে পুরুষের ‘শুক্রাণু’ ও ‘স্ত্রী’র ‘ডিম্বাণু’ মিলিত হয়ে উদ্ভব ঘটায় একটি জীবের। কিন্তু এই পদ্ধতিটিই ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে ‘লিঙ্গের’ রূপ প্রকাশে।

কারণ, প্রকৃতিতে যেহেতু জীবের প্রকৃত রূপ ‘স্ত্রী’ রূপে। তাই ‘পুরুষ’ রূপটি মাতৃজঠরে ভ্রূণের পরিস্ফুরনের একটি ধাপে বিশেষ কোনও কোনও পরিবর্তনের মাধ্যমেই আসে। অর্থাৎ, ‘পুরুষ’ হল ‘পরিবর্তিত’ একটি ‘স্ত্রীরূপ’। বিবর্তন বিজ্ঞানীদের ভাষায়—‘masculinity just a modification of the feminine experience’, কারণ, ‘পুরুষ লিঙ্গ’ সৃষ্টির জন্য কোনও জীবে ‘পুরুষ’ বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী’ জিনগুলি খুব ছোট এক টুকরো ডি এন এ’র মধ্যে আছে—যাকে বলা হয় ‘স্বার্থপর ডি এন এ’, যার মধ্যে আছে ‘SRY’ জিন। সুতরাং, পুরুষ হল স্ত্রীর ওপর নির্ভরশীল এক অবস্থা, অনেকটা প্যারাসাইটের মত। পরজীবীর মত—যে কেবলমাত্র তার ওই ‘পুরুষ’ লিঙ্গটিকে প্রকৃতিতে টিকিয়ে রাখার জন্য তার ‘পুরুষালি’ বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী জিনগুলিকে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত করার সুখটুকু উপভোগ করা ছাড়া আর কিছুই পারে না। যদিও সাধারণ মানুষের কাছে এটি বোধগম্য নাও হতে পারে। তারা হয়তো ভাবতে পারেন ‘পুরুষালি বৈশিষ্ট্য’ তো কেবলমাত্র ‘পুত্রসন্তান’ তৈরি হলে তাতেই যাবে, ‘কন্যা সন্তান’ তৈরিতে তো পুরুষের কোনও লাভই নেই। বাস্তবিক পক্ষে তা নয়। পুত্র বা কন্যা—যে সন্তানই তৈরি

হোক, পুরুষ তার প্রয়োজনীয় অংশ প্রদান করতে পারে। কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে তার (পিতার) ‘X’ ক্রোমোজোমের সেই অংশ যেটি ‘Y’ -এর সঙ্গে জোড়া বাঁধতে পারে। তবে অবশ্যই ‘পুত্রসন্তান’ তৈরিতেই তার আনন্দ বেশি—কেননা বিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে, প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য স্ত্রীর সঙ্গী সে উপহার দিতে পারছে। অবশ্য অন্য আর এক পক্ষের বিবর্তন বিজ্ঞানীদের মতে, এটি সম্পূর্ণই অসত্য। কেননা মাংশাসী স্তন্যপায়ীদের মধ্যে প্রায় সব ক'টি প্রজাতিতেই ‘Cannibalism’ বা ‘স্বগোত্রভোজী’ পুরুষ দেখা যায়, যারা নিজেদের পুত্র সন্তানকে জন্মের পরই খেয়ে ফেলে। যেমন, বাঘ, সিংহ, বিড়াল, কুকুর প্রভৃতিই তার উদাহরণ।

সুতরাং ‘লিঙ্গ’ নিয়ে যুদ্ধ বা সংঘর্ষ ‘স্ত্রী’তে নয়, ‘পুরুষে’ই প্রকট। প্রতিযোগিতার লড়াই এদের মধ্যেই দেখা যায়। আর এই প্রতিযোগিতা যেমন লক্ষ্য করা যায় ‘ডিম্বাণু’কে নিষিক্ত করার জন্য লক্ষ লক্ষ শুক্রাণুর মধ্যে, তেমনিই আবার একটি স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে। আর স্ত্রীর কাছে উপযোগী হবার জন্য অন্য পুরুষের তুলনায় নিজেকে উন্নত করার চেষ্টায় বিবর্তনের ধাপে পুরুষ লিঙ্গটি ক্রমশ ক্রমশ অনেক দিক দিয়েই স্ত্রীলিঙ্গের তুলনায় ‘উত্তম’ হয়েছে। যেমন, উচ্চতায় শতকরা আট শতাংশ বেশি, বুদ্ধিমত্তায় শতকরা প্রায় দশ ভাগ বেশি। এসব সত্ত্বেও স্ত্রীলিঙ্গের প্রতি ভরসা তাদের নেই, যে কারণে দেখা যায় স্ত্রীর সঙ্গে মিলনের পরও অর্থাৎ, সঙ্গম সম্পূর্ণ হবার পরও বেশ কিছু প্রজাতিতে (যেমন কুকুর) পুরুষ ও স্ত্রী একসঙ্গে জোড়বদ্ধ হয়েই থাকে এবং স্ত্রীকে পুরুষ পাহারা দেয়, যাতে অপর কোনও পুরুষের সঙ্গে সে মিলিত হতে না পারে। যে কারণে পুরুষের ‘শিশ্ন’ বা ‘পুরুষাঙ্গ’ বা ‘পেনিস’ হয় লম্বা। এবং স্ত্রীদেহের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। অবশ্য এক্ষেত্রে পুরুষের এ ধরনের সাবধানতা অর্থহীন বা অযৌক্তিক নয়। কেননা

স্ত্রী অনবরত চেষ্টা চালায় তার সন্তানকে বিবর্তনে টিকে থাকার জন্য ‘সর্বোত্তম’ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করতে। আর এজন্য সে খোঁজে অনেক অনেক বেশি ‘ভাল’ পুরুষ (অবশ্যই ‘ভাল’ জিনের অধিকারী) আর এই কাজটি করার জন্য স্ত্রীজাতিতে দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—এক, সে নিজেদের চেহারার চেয়ে ভিন্নতর কোনও চেহারার পুরুষকে নির্বাচিত করে না সাধারণত সঙ্গী হিসাবে, অর্থাৎ ত্বকের রং, উচ্চতা, আচার-ব্যবহার স্বভাবে মিলই খোঁজে (যদিও পুরুষের ক্ষেত্রে এটি দেখা যায় না।) স্ত্রীর এ ধরনের নির্বাচনের কারণ বিবর্তনে যে চেহারা নিশ্চিতভাবে বিরাজ করছে তারই এক রূপ তৈরি করা। আর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, তার জননের উপযুক্ত সময়টিকে গোপন করা। যেজন্য আমরা দেখি অন্যান্য প্রজাতিতে স্ত্রীদের ঋতুচক্র বছরের কোনও বিশেষ একটা সময়ে নির্দিষ্ট এবং ওই বিশেষ একটি সময়ে ওই বিশেষ প্রজাতিটির প্রতিটি স্ত্রীই একসঙ্গে ‘ঋতুমতী’ হয়। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এটি একেক স্ত্রীর ক্ষেত্রে একেক সময় এবং অবশ্যই সারা বছর ধরে চলে—মাসে একবার করে। এ কারণে পুরুষকে কিছুটা ধন্ধে পড়তে হয়—কারণ সে জানে না বিশেষ কোনও স্ত্রীর ক্ষেত্রে, তার সন্তান—ধারণের উপযুক্ত সময় কোনটি। আর একারণেই অন্যান্য প্রজাতির চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা এক সঙ্গী নির্বাচন পদ্ধতি মানবজাতিতে উপস্থিত। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে একবার সঙ্গম সম্পূর্ণ হয়ে সন্তানের জন্ম হয়ে গেলেই সেই স্ত্রীর সঙ্গ পুরুষ ছেড়ে দেয়। কিন্তু মানব প্রজাতির পুরুষ, প্রায়শ ক্ষেত্রেই, সারা জীবনের সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে থাকে, স্ত্রীকে পাহারা দেবার জন্য। অবশ্য হয়তো এটি সঠিক নাও হতে পারে। কারণ, এটি সম্পূর্ণ ‘behavioural’ অর্থাৎ, ‘স্বভাবগত’ একটি ব্যাপার, যার উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও নেই।

সুতরাং, ‘লিঙ্গ’ নিয়ে বিবর্তনের অগ্রগতিতে দ্বন্দ্ব

সবসময়েই থাকবে—কারণ যেহেতু স্ত্রীলিঙ্গের প্রয়োজনে আবির্ভাব এই 'পুরুষ' লিঙ্গটির। তাই 'Y' ক্রোমোজোম জানে না, তাকে আর কতটা 'পরিবর্তিত' হতে হবে। সে কিছুটা যেন স্ত্রীর, প্রয়োজনে আর কিছুটা যেন বিবর্তনের ধারা বজায় রাখতে মানব প্রজাতির প্রয়োজনে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। তাই সে জানে না কতটা পথ যেতে হবে। তাই, প্রকৃতিতে নতুন 'তৃতীয়' কোনও লিঙ্গ আসবে কিনা তা বিবর্তন ঠিক করবে। যদি ক্রমাগত পরিবর্তনে 'পুরুষ' লিঙ্গটির তুলনায় 'উত্তম' কোনও লিঙ্গের আবির্ভাব ঘটে যায়, তাহলেও আশ্চর্য হওয়ার কোনও কারণ নেই। তাই 'পুরুষ' লিঙ্গের অবস্থা কবিগুরুর কথায়—'মোরে আর কতদূর নিয়ে যাবে হে সুন্দরী'। যতদিন বিবর্তনের প্রয়োজনে সে 'স্ত্রী'র কাজে লাগবে, ততদিন 'স্ত্রী' এই 'পুরুষ' লিঙ্গটিকে 'ক্ষান্তি' দেবে না। তাই যতই দ্বন্দ্ব-বিবাদে মত্ত থাকুক না কেন, 'স্ত্রী'র কাছে সে নির্ভরশীল একান্তভাবে, অজান্তে—

'অজানা খনির নতুন মণির গেঁথেছি হার, ক্লান্তিবিহীনা নবীনা বীণায় বেঁধেছি তার।।'

প্রথম প্রকাশ: শারদীয় সংবাদ প্রতিদিন, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ।

বিজ্ঞান কোনও দেশের গণ্ডি জানে না, কারণ জ্ঞান সমগ্র মানবজাতির। এবং এটি এমন একটি মশাল যা সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করে। একটি জাতির সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তিকরণ হল বিজ্ঞান, কারণ সেই জাতিই এগিয়ে থাকবে যারা চিন্তা ও বুদ্ধিমত্তায় সবচেয়ে উন্নত।

— লুই পাস্তুর



পুরুষতন্ত্র—দোষ কী শুধু পুরুষের?

ক-জন নারী আছেন, যারা তার থেকে অল্প বেতনের, অল্প বয়সের, অল্প উচ্চতার, অল্প সামাজিক প্রতিষ্ঠিত ছেলেকে বিয়ে করতে রাজী? শতকরা ১% ও নয়। কেন নয়?...**চিত্রদীপ সোম**

পুরুষতন্ত্র—একটি বহু ব্যবহারে জীর্ণ শব্দ। এই সমাজ পুরুষতান্ত্রিক, একদম ঠিক। আজও এদেশে কন্যাভ্রূণ হত্যা হয়। আজও গৃহনির্যাতন চলে ঘরে ঘরে, আজও পণপ্রথার অভিশাপ থেকে মুক্ত নয় দেশ। আজও বিয়ের সময় মেয়ের গায়ের রঙ, চুলের দৈর্ঘ্য ইত্যাদি বিবেচ্য হয়ে ওঠে পাত্রপক্ষের কাছে। আজও চাকুরিরত স্বামী-স্ত্রী বাড়ি ফেরার পর স্বামীটি বসে যান টিভিতে খবর দেখতে বা ফেসবুকে দেশোদ্ধার করতে আর আর স্ত্রীকে ক্লান্ত বিধ্বস্ত শরীর নিয়ে ঢুকতে হয় রান্নাঘরে। এগুলো নিয়ে

আগেও লিখেছি অনেক। ভবিষ্যতেও লিখব হয়ত। যে কোনো বিবেচক মানুষের মত আমিও চাই নারীর উপর যুগ যুগ ধরে চলা এইসব অন্যায়ের অবসান হোক।

কিন্তু মুদ্রার অপর পিঠটিও কী সমান সত্যি নয়?

একটা ঘটনা দিয়ে শুরু করি। সমাজের উঁচু তলার মানুষরা যেমন নীচু তলার মানুষদের শোষণ করে তেমনি নীচু তলার মানুষরাও কিভাবে তাদের 'নীচুত্ব'.কে নানা ভাবে তাদের ভুলভাল কাজকে 'জাস্টিফাই' করার জন্য ব্যবহার করে এ থেকে হয়ত বোঝা যাবে।

আমার মা রাজ্য স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। মায়ের অভিজ্ঞতার কথা বলি। মা তখন বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পোস্টেড। প্রায় নিত্যদিনকার ঘটনা ছিল এটি। সকাল বেলায় ফিনাইল দিয়ে মেঝে ঝকঝকে করে মোছা হলো। আর তারপরেই কেউ থুতু বা পানের রস ফেলল মেঝের উপর। ধরা পড়লেই হাত জোড় করে বলতো 'গরিব মানুষ দিদিমণি, ছেড়ে দ্যান' / 'কী করবো দিদিমণি, গ্রামের মানুষ।'

অর্থাৎ গরিবিটা বা গ্রামের মানুষ হওয়াটা মেঝেতে থুতু ফেলার বা পানের রস ফেলার লাইসেন্স! গরিব হলে বা গ্রামের মানুষ হলে তার সরকারি সম্পত্তিকে নষ্ট করার 'অধিকার' জন্মে যায়!

এই যে নিজেকে গরিব, অর্থাৎ করুণার পাত্র বলে উপস্থিত করে আইনের হাত থেকে ছাড় পাবার প্রচেষ্টা, নিজের অর্থহীনতাকে সুকৌশলে লোকের করুণা সৃষ্টির মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে চাওয়া, নিজের ভুলভালকে কাজকে জাষ্টিফাই করার হাতিয়ার হিসাবে উপস্থাপিত করার প্রচেষ্টা, এটাও কিন্তু মুদ্রার অন্য পিঠ। এইরকমই অসংখ্য উদাহরণ ছড়িয়ে আছে চারপাশে। চোখ মেলে দেখলেই ধরা পড়বে।

যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, পুরুষতন্ত্রের কথায় আসি। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষ শোষক, নারী

শোষিত এই চিত্রটা একদম ঠিক। কিন্তু উলটো পিঠটাও আজ একটু দেখা যাক।

খুব তুচ্ছ দু-একটা ঘটনা দিয়ে শুরু করি। সেই কলেজ লাইফ থেকে নারী পুরুষ সবার সাথে ফ্রি ভাবে মিশেছি। এখনও মিশি। একটা অদ্ভুত ব্যাপার খেয়াল করেছি, অধিকাংশ মেয়েরই রেস্তোরাঁ বা ক্যাফের বিল দিতে চরম অনীহা। যেখানে দুটি ছেলেমেয়ে প্রেম করে বা 'স্রেফ বন্ধু' এবং উভয়ই বেকার, সেখানেও অলিখিত নিয়ম ছেলেটাই প্রতিবার বিল মেটাবে, আর মেয়েটা কেবল নির্দ্বিধায়, নিঃসংকোচে ছেলেটির অর্থ ধ্বংস করে খেয়ে যাবে। অধিকাংশ মেয়েই মুখ ফুটে বলে না 'যা বিল হবে তা দুজনে ৫০-৫০ করে মেটাব।' ব্যাপারটা এতটাই প্রচলিত যে অধিকাংশ ছেলেমেয়ে এটাকেই 'স্বাভাবিক' হিসাবেই দেখে। আমি বারাসাতের যে অঞ্চলে থাকি সেখানে রাস্তার তিন হাত পরপর একটা করে ক্যাফে। আমি আর মহুয়া (জীবন সঙ্গী) সপ্তাহে অন্তত দু-তিন দিন বিকালের দিকে চা স্ন্যাকস খেতে বসি কোথাও না কোথাও, আর প্রায় প্রতিদিনই এই দৃশ্য দেখি। ব্যতিক্রমী ছেলেমেয়ে যে নেই তা নয়, তবে সেটা ব্যতিক্রমই। বেকার ছেলেমেয়েদের কথা নাহয় বাদই দিন। আমি ফেসবুক থেকে পরিচয় হয়ে অনেক বন্ধুবান্ধবীর সাথেই দেখা করেছি। কোনো ক্যাফে বা রেস্তোরাঁয় বসে টুকটাক কিছু খেতে খেতে গল্প হয়েছে। প্রতিবারই দেখেছি পার্টনারটি পুরুষ হলে সর্বদাই বিল পে করার কথা বলে। কিন্তু যে কজন মহিলার সাথে আলাপ হয়েছে তারা প্রায় কেউই এখনও একবারের জন্যেও বলেননি বিল ৫০-৫০ করে পে করার কথা। এমনকি রীতিমত ভালো বেতনের সরকারি চাকরি করেন এমন মহিলার ক্ষেত্রেও দেখেছি একই ব্যাপার। খাওয়া দাওয়ার পর অম্লান বদনে চুপচাপ বসে রইলেন। মুখ ফুটে একবারের জন্যেও বললেন না বিল ভাগ করার কথা। অথচ আমি তাকে

কোনো ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করিনি যে তিনি এসে আমার পয়সায় নিজের পেট ভরিয়ে যাবেন। ‘নারী পুরুষের সমান অধিকার’ কোথায় এখানে? একজন চাকরি করা নারীও কেন সুযোগ পেয়েও সমতার নূন্যতম উদাহরণ রাখতে পারেননি?

আসলে বহু যুগ ধরে পুরুষতন্ত্রের অধীনে থাকার ফলে শুধু পুরুষরা নয়, নারীদের মাথার মধ্যেও গেঁথে গেছে কিছু স্টিরিওটাইপ ধারণা। পুরুষতন্ত্রের পিছনে শুধু পুরুষরা একা দায়ী নয়, দায়ী নারীরাও। পুরুষরা বিয়ের সময় নারীর গায়ের রং, সৌন্দর্য দেখে বিচার করলে সেটা ‘দোষ’, কিন্তু নারীরাও কী একজন পুরুষকে জীবনসঙ্গী করা যাবে কিনা সেটা বিচার করার ক্ষেত্রে ছেলেটির বেতন, সামাজিক অবস্থান, ইত্যাদি বিচার করেন না? ক-জন নারী আছেন, যারা তার থেকে অল্প বেতনের, অল্প বয়সের, অল্প উচ্চতার, অল্প সামাজিক প্রতিষ্ঠিত ছেলেকে বিয়ে করতে রাজী? শতকরা ১% ও নয়। কেন নয়? কেন স্বামীকে সর্বদা নিজের চেয়ে উচ্চ অবস্থানেই দেখতে চান এদেশের মেয়েরা? এমনকি তথাকথিত শিক্ষিতা মেয়েরাও? স্বামীর অধীনে সাবমিসিভভাবে থাকতে সুবিধা হবে বলে? স্ত্রীর যোগ্যতা স্বামীর চেয়ে বেশি হলে স্বামীরা যেমন হীনমন্যতায় ভোগেন, ইগো সমস্যায় ভোগেন সত্যি, তেমনি এদেশের মেয়েরাও কী আদৌ ব্যাপারটিকে ‘স্বাভাবিক’ বলে মেনে নিতে পারেন? কেন পারেন না? কেন এদেশে চাকরিরতা মেয়েরা বেকার ছেলেকে বিয়ে করতে রাজী না হলেও ঘরে ঘরে বেকার মেয়েরা আশা করেন চাকরি করা সোনার টুকরো ছেলেরা তাদের বিয়ে করবেন?

আসলে এদেশে বিয়ে বা প্রেম যাই বলুন না, সবই একটা চুক্তিপত্র মাত্র। আমি তোমাকে সামাজিক নিরাপত্তা দেব, আর্থিক নিরাপত্তা দেব, তোমার খাওয়া পরা, শাড়ি গয়নার দায়িত্ব নেব, বিনিময়ে তুমি আমাকে বিছানায়

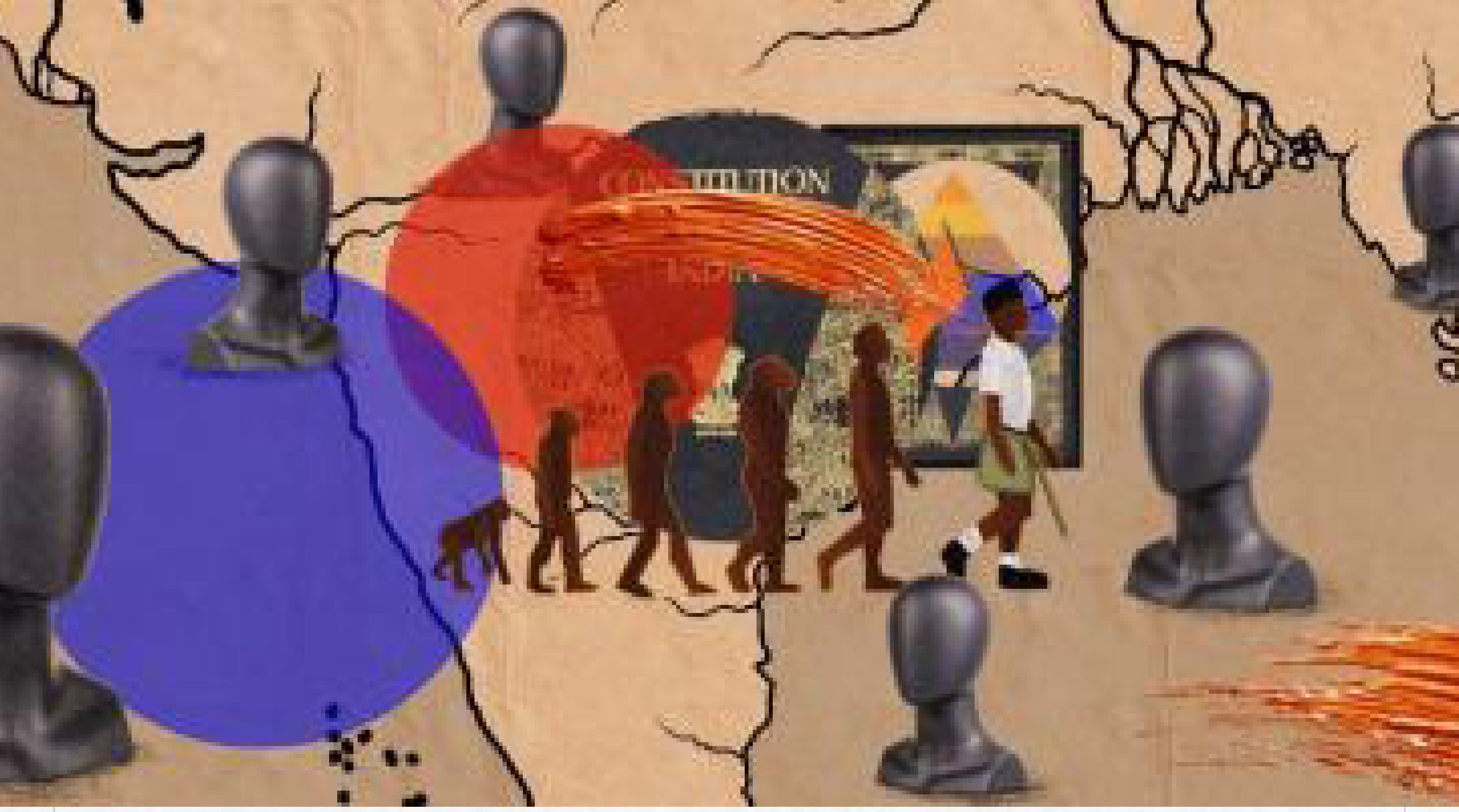
যৌন সুখ দেবে, আমার বংশ রক্ষায় সাহায্য করবে, রান্না করে আমার আহার মুখে তোলার দায়িত্ব নেবে, এই অলিখিত চুক্তিপত্রকেই এদেশে 'বিয়ে' বলে অভিহিত করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই এখানে পাত্রপক্ষ যেমন পাত্রীকে যৌনসুখের মাপকাঠিতে বিচার করে (অর্থাৎ পাত্রী সুন্দরী কিনা, রঙ ফরসা কিনা ইত্যাদি) তেমনি পাত্রীপক্ষও পাত্রকে আর্থিক নিরাপত্তার মাপকাঠিতে বিচার করে, অর্থাৎ ছেলে চাকরি করে কিনা, করলে বেতন কত ইত্যাদি। এই পারস্পারিক চুক্তিতে প্রেম বা ভালোবাসা কোথায়? সবটাই তো এক নির্লজ্জ সুযোগ সুবিধার বাজারি দরকষাকষি। বাজারে আপেলওয়ালা বা পেয়ারাওয়ালার সাথে দরকষাকষির সময় যেমন আপনি মানবিকতার কথা মাথায় রাখেন না তেমনি স্বাভাবিকভাবেই এখানেও বিয়েতে পাত্রপাত্রী দেখার ক্ষেত্রে মানবিকতার কোনো জায়গা থাকে না। উভয়েই উভয়কে 'প্রয়োজনের মাপকাঠি'-তে বিচার করে। তাই ছেলেরাও যেমন ফর্সা মেয়ে চায় মেয়েরাও তেমনি সরকারি বা উচ্চ পদস্থ বেসরকারি কর্মচারী ছাড়া বিয়ে করতে চায় না। ছেলেদের ফর্সা মেয়ে খোঁজার প্রবণতার যেমন সমালোচনা করেন তেমনি মেয়েদেরও বেকার ছেলেকে পাত্তা না দিয়ে শাঁসালো পাত্র দেখে বিয়ে বা প্রেম করতে ঝুলে পড়ার মানসিকতার সমালোচনা করুন। প্রতি বছর কালীপুজো আসলে 'ছেলেদের শ্যামা মায়ের পুজো করেও নিজের বিয়ের সময় ফর্সা মেয়ে খোঁজার মানসিকতার 'যেমন নিন্দা তেমনি নিন্দা করুন মেয়েদের বেকার বাউণ্ডুলে শিবের পুজো করেও বিয়ের সময় শাঁসালো, মোটা বেতনের পাত্র খোঁজার মানসিকতাকেও। দুটোই সুবিধাবাদিতা। দুটোই ধান্দাবাজি। শুধু একটা দিক নিয়ে মুখর হবেন না। ছেলেরা ভিড় বাসে ট্রেনে মেয়েদের সাথে অসভ্যতামি করে সেটার যেমন সমালোচনা হয় তেমনি সমালোচনা হোক মেয়েদের জন্য রিজার্ভ সিট

থাকা নিয়েও। অসুস্থ, বৃদ্ধ পুরুষমানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন আর সামনের সিটেই অল্পবয়সী দামড়া মেয়ে নির্বিকার মুখে বসে আছে এটা এদেশে বাসের খুব পরিচিত দৃশ্য। সমানাধিকারের লড়াইটা কেন এখানেও থেকেও প্রযোজ্য হবে না? পণের দাবীতে হত্যা নিয়ে যেমন হইচই হয় তেমনি স্বামীর অল্প রোজগারের কারণে মুহুর্মুহু তাকে বাক্যবাণে ক্ষতবিক্ষত করা, মানসিকভাবে প্রতিনিয়ত হত্যা করা স্ত্রীর ভূমিকা নিয়েও সমালোচনা হোক। দুটোই অন্যায়।

এরসাথে আর এক সমস্যা যোগ হয়েছে বর্তমানে তা হল উগ্র নারীবাদ। সব দোষ পুরুষের। পুরুষ মাত্রেই ‘পোটেনশিয়াল রেপিস্ট’। পুরুষমাত্রেই নারী শরীরলোভী বিকৃতকাম। পুরুষ এতদিন অমুক অমুক খারাপ কাজ করেছে বলে আমরা নারীরাও এখন থেকে তাই করবো। এতদিন পুরুষরা নারীদের উপর অত্যাচার করেছে, অতএব এখন ঘরে ঘরে নারীরা পালটা অত্যাচার শুরু করুক পুরুষকে। এতদিন পুরুষরা ধর্ষণ করেছে নারীকে, এখন নারীরাও পালটা ধর্ষণ করতে শুরু করুক পুরুষদের। তসলিমা এই চিন্তাধারার অন্যতম ধারক বাহক। কিন্তু বাস্তবে এই প্রভোকেশন কিছু অত্যাচারিত, শোষিত নারীর মনে পুলক ও উত্তেজনা আনতে পারে ঠিকই, কিন্তু কোনো বাস্তব সমাধান নয়।

শুধু একপক্ষের দোষ দেখে তাই সমতা আসবে না। সমতা আনতে হলে নারীপুরুষ উভয়েই নিজের নিজের বদগুণগুলো নিয়ে সচেতন হোক। নিজের নিজের শতাব্দীব্যাপী চলে আসা ধ্যানধারণাকে পরিত্যাগ করুক।

তবেই কোনো একদিন গড়ে উঠবে সমতার প্রকৃত নমুনা।



বিশ্বাস দ্বারা ইতিহাস পাল্টানো যায় কী?

আমরা জানি, মানুষ স্বীয় বিশ্বাস দ্বারা বর্তমানকে পাল্টাতে সক্ষম হলেও অতীতকে পাল্টাতে পারে না। কিন্তু কিছু ধর্মান্ধ ব্যক্তি যুগে যুগে তাদের বিশ্বাস দ্বারা অতীতকে পাল্টানোর কাজে সচেষ্ট থাকেন...

মোশাররফ হোসেন মুসা

ইতিহাস মানে অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনা। সে কারণে ইতিহাসবিদরা ঘটে যাওয়ার ঘটনার সত্যতা প্রমাণের জন্য বিভিন্ন স্থাপত্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের উদাহারণ দেন। এদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তুসমুহের আবিষ্কার বেশিদিন আগের নয়। সম্ভবত সে কারণে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে পৌরানিক কাহিনির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ইউরোপিয়ান দেশগুলোতে মিথোলজি থেকে ইতিহাসকে পৃথক করা হয়েছে বহু আগে। বিশেষ করে রোম ও গ্রীসে খ্রিষ্টপূর্ব আমল থেকে নগর রাষ্ট্রের দালান-কোঠাসহ বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশনগুলো দৃশ্যমান থাকায় সেখানকার ইতিহাস যুক্তি

ও সত্যবাদিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে বিশিষ্ট গবেষক শ্রী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বাঙ্গালার ইতিহাস’ নামক গ্রন্থের ভূমিকার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন– ‘যে দেশে শিলালিপি, তাম্রফলক, প্রাচীন মুদ্রা ও সাহিত্যে লিপিবদ্ধ জনপ্রবাদ ব্যতীত ইতিহাস রচনায় অন্য কোনো বিশ্বাসযোগ্য উপাদান আবিষ্কৃত হয় নাই, সে দেশের ইতিহাসের কঙ্কাল ব্যতীত অন্য কিছু আশা করা যাইতে পারে না।’

আমরা জানি, মানুষ স্বীয় বিশ্বাস দ্বারা বর্তমানকে পাল্টাতে সক্ষম হলেও অতীতকে পাল্টাতে পারে না। কিন্তু কিছু ধর্মান্ধ ব্যক্তি যুগে যুগে তাদের বিশ্বাস দ্বারা অতীতকে পাল্টানোর কাজে সচেষ্ট থাকেন। কয়েক বছর আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক কর্মী সভায় বলেছেন– ‘হিন্দু দেবতা গনেশের মাথায় হাতির মাথার সংযোজন দেখেই প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাচীন ভারতে প্লাস্টিক সার্জারির প্রচলন ছিল। মহাভারতে যে মাতৃগর্ভের বাইরে একটি শিশু জন্মানোর কথা বলা হয়েছে। তাতেই প্রমাণিত হয় এই শিশু আসলে বিশ্বের প্রথম টেস্টটিউব বেবি। রামায়ন পড়ে জানা যায়, প্রাচীন ভারতেই হয়েছিল বিমানের আবিষ্কার, পরমানু অস্ত্রের ব্যবহার ও স্টেম থেরাপি’ (কালের কণ্ঠ, ৩০ ডিসেম্বর’ ২০১৪)। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর ‘আরএসএস’ (রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ)’ ‘ঘর ওয়াপসি’ অর্থাৎ ঘরে ফেরা কর্মসুচি চালু করে।’ আরএসএস’ এর বক্তব্য ভারতীয় মুসলমানরা পূর্বে হিন্দু ছিল। সেজন্য কেউ যদি হিন্দু ধর্মে ফিরে আসে তাহলে কোনও বাধা নেই। এ নিয়ে বিতর্ক দেখা দেওয়ায় ‘এম আইএম’ দলের প্রধান আসাফ উদ্দিন ওয়াসি বলেছেন– ‘প্রত্যেক মানুষ প্রথমে মুসলমান হয়ে জন্ম গ্রহণ করে। পরে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে’ (ইত্তেফাক, ৬ জানুয়ারি’ ১৫)। অর্থাৎ তাঁরা ধর্মীয় বিশ্বাস দ্বারা ইতিহাস পাল্টাতে চান। কিন্তু প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস ঘাটলে তাদের বক্তব্যের

সমর্থনে যথাপোযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না। খ্রিষ্টপূর্ব আমলেও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বহু সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল। যেমন, মিশরীয় সভ্যতা, মেসোপটেমীয় সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা, ফিনিশীয় সভ্যতা, পারস্য সভ্যতা, হিব্রু সভ্যতা, চৈনিক সভ্যতা, গ্রিক সভ্যতা, রোমান সভ্যতার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে (নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্য বই ‘বাংলাদেশ ও প্রাচীন বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাস’ নামক বইতে এ বিষয়ে চমৎকার বর্ণনা দেওয়া আছে। বইটি ছোটোদের উদ্দেশ্যে লেখা হলেও প্রত্যেক যুক্তিবাদী মানুষের উচিত হাতের কাছে রাখা এবং সকল ছেলে-মেয়েদের পড়তে দেওয়া)। হিব্রু সভ্যতা সম্পর্কে উল্লেখ আছে, হিব্রুদের আদিবাস ছিল আরব মরুভুমিতে। বর্তমান ইসরাইলের অধিবাসীরা হচ্ছে হিব্রুদের বংশধর। পরে হিব্রুদের নেতা হন আব্রাহামের নাতি জেকব (হয়রত ইয়াকুব আঃ)। হয়রত ইয়াকুব (আঃ) হিব্রুদের নিয়ে আসেন প্যালেস্টাইনে। ১৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে হিব্রুরা চরম দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েন। জীবন বাঁচাতে তারা চলে যান মিশরে। সেখানকার শাসক ফারাওরা তাদের বন্দি করে দাসে পরিণত করেন। এরপর তাদের উদ্ধার করতে নতুন নেতা মুসা (আঃ) এর আগমন ঘটে। হিব্রুরা সর্বপ্রথম একেশ্বরবাদের কথা বললেও তাদের পূর্বেকার ধর্মীয় আচরণে বহু দেবতার অস্তিত্ব ছিল। মিশরের মিথোলজি হলো- এক ফেরাউন স্বপ্ন দেখে তাকে এক ইহুদি সন্তান হত্যা করবে। ভারতের মিথোলজি হলো- রাজা কংস স্বপ্ন দেখে তাকে হত্যা করবে তারই ভগ্নির অষ্টম গর্ভের সন্তান। অর্থাৎ এক দেশের মিথোলজির সাথে আরেক দেশের মিথোলজির মিল রয়েছে। জনৈক মৌলবাদী শিক্ষক এ বিষয়ে বলেন— ‘এগুলো পরীক্ষায় পাসের জন্য করা যেতে পারে। বিশ্বাস করা যাবে না। এগুলো মানুষের মনগড়া লেখা’। বিগত কয়েক বছর আগে জন্ম নেওয়া আর্ন্তজাতিক জঙ্গী সংগঠন ‘আইএসআই’ এর

বক্তব্যও তাই। তারা ঘোষণা দিয়েছে কাবা শরীফ ও মদীনায় হয়রত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রওজা মোবারক ছাড়া সকল স্থাপনা ধ্বংস করে দিবে। তারা ইতোমধ্যে হযরত ইউনুস (আঃ) এর মাজার ও কিছু পীর আউলীয়ার মাজার সহ অতীতের বহু স্থাপনা ধ্বংস করে দিয়েছে। তারা ইরাক ও সিরিয়ার বেশ কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক এলাকা দখল করে বাজে ভাবে লুটপাট করে বিক্রি করে দিয়েছে। তারা অ্যাসিরীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী, গ্রিসীয়-রোমান সভ্যতার বিকাশস্থল এবং মুসলমান-খ্রিস্টানদের নির্মিত স্থাপনা দখলে নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশনগুলো ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। ইউনেস্কোর মতে, এগুলো ধ্বংস হয়ে গেলে মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস লেখার জন্য আর কোনও নির্দশনই অবশিষ্ট থাকবে না।

অন্যদিকে জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য লিখিত ‘জীবনের উৎপত্তি ও বিবর্তন’ নামক বইয়ের কিছু অংশ উল্লেখ করা যেতে পারে। বিশ্বাসীদের মতে, জগতের যাবতীয় বস্তু স্রষ্টা হতে সৃষ্টি। তিনি যেমনিভাবে সৌরজগত সৃষ্টি করেছেন, তেমনি সৃষ্টি করেছেন জড় জগৎ ও জীবকুল। বাইবেলের ভাষ্য অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তা ছয় দিনে জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তৃতীয় দিনে গাছপালা, পঞ্চম দিনে মাছ-পেঁচা, ষষ্ঠ দিনে অনান্য প্রাণী ও সবশেষে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি মাটি দিয়ে মানুষ তৈরি করেন এবং রুহ দানের মাধ্যমে মানুষকে জীবন প্রদান করেন। কিন্তু বিজ্ঞানী মিলের মতে, ঈশ্বর বলে কিছু নেই। জড় প্রকৃতি হতেই এ ‘জগতের সৃষ্টি হয়েছে। দার্শনিক লুক্রেসিয়াসের মতে, রাসায়নিক ও যান্ত্রিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে জড় হতে প্রাণের উদ্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানীরা ভূত্বকের ভেতর থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন ফসিল পরীক্ষা করে দেখেছেন, ভুত্বকের বিভিন্ন বয়সের স্তরে জীবাশ্মের অবস্থান লক্ষ্য করা গেছে।

লেখক: গণতন্ত্রায়ন ও গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার বিষয়ক গবেষক। পাবনা, বাংলাদেশ।



ইজরায়েলের Iron Dome : লখিন্দরের বাসরঘর

সেরকমই কোনও এক আধুনিক যুডাস লখিন্দরের বাসরঘরে একটা ছোট্ট ফুটো নিশ্চয় করেছে যেখান দিয়ে হামাস রকেট ছুঁড়েছে... **অনুজ বিশ্বাস**

The Jerusalem Post এর দাবী অনুযায়ী, ইসরায়েলের Iron Dome এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম বিশ্বের সবচেয়ে দূর্ভেদ্য এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। এটি বিশ্বের একমাত্র পাঁচ স্তরীয় এয়ার ডিফেন্স যে প্রযুক্তি বিশ্বের বড়দা আমেরিকার কাছেও নেই। কারণ আমেরিকার হাতে থাকা সবচেয়ে শক্তিশালী M270 Multiple Launch Rocket System ও তার সর্বোচ্চ Effective Firing Range M30/31 দিয়ে Iron Dome

এর পঞ্চস্তর ভেদ করা সম্ভব নয়।

প্রথম স্তর Arrow 2
দ্বিতীয় স্তর Arrow 3
তৃতীয় স্তর Iron Beam
চতুর্থ স্তর Barak 8
সর্বোচ্চ স্তর David's Sling

আজও বিশ্বের সবচেয়ে সুরক্ষিত Air Defence System এই Iron Dome যা ইসরায়েলের জনগণের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে। হামাসের হাতে থাকা সবচেয়ে শক্তিশালী রকেট আর্টিলারি দিয়েও Iron Dome এর কেশাগ্র বাঁকানো সম্ভব নয়। হামলা চালানো অনেক দূরের কথা। Iron Dome ভাঙতে গেলে হয় দূরপাল্লার, অন্তত মাঝারি পাল্লার ইন্টার কন্টিনেন্টাল ব্যালাস্টিক মিসাইল নতুবা নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড বহনকারী স্বল্প পাল্লার রকেট দিতে আঘাত করতে হবে। হামাস হিজবুল্লাহ চেচেন সহ বিশ্বের কোন জঙ্গী সংগঠনের কাছেই ব্যালাস্টিক মিসাইল বা নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড কোনোটাই নেই। থাকলে এতদিনে কেউ না কেউ সেগুলো নিশ্চয় ব্যবহার করত। তাহলে হাজার খানেক পাতি রকেট লঞ্চার দিয়ে ইজরায়েলের মাটিতে রকেট বৃষ্টি করা কিভাবে সম্ভব?

ইজরায়েলে ছাপোষা নাগরিকের সংখ্যা হাতে গোনা। শারীরিক বা মানসিক ভাবে অসুস্থ না হলে এই দেশের প্রতিটা নর নারীর ন্যূনতম ছয় মাসের মিলিটারি ট্রেনিং নেওয়া বাধ্যতামূলক। দেশের প্রতিটা সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের অন্তত এনএসসি C-লেভেল ট্রেনিং আছেই।

এরপরেও ইসরায়েল আক্রান্ত হয় কী করে? ইজরায়েলের প্রতিটা মানুষ যুদ্ধ কালীন তৎপরতায় উদ্ধার কাজ চালাতে সক্ষম বলে দাবী করা হয়। এরপরেও এতো ক্ষয়ক্ষতি প্রাণহানী ঘটে কী করে?

সবার উপরে আরেকটা প্রশ্ন থেকেই যায়, মোসাদ কী করছে? আমেরিকার হাঁড়ির খবর যাদের মুখস্ত, যারা নাকি অপরাজেয়, তারা ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক থেকে মাত্র মাইল খানেক দূরের গাজা স্ট্রিপের খবর জোগাড় করতে পারছে না! তাই কখনও হতে পারে? অসম্ভব...

মানব সভ্যতার ইতিহাসে বারে বারে দেখা গিয়েছে দুর্নীতি আর বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া কোনও শক্তির পতন ঘটেনি। বিশ্বাসঘাতকতা ইজরায়েলের রক্তে আছে। ওরা যুডাস ইস্কারিওটের উত্তর পুরুষ, ওরা যীশুকেও ছাড়েনি। মসিহার সাথে যা ঘটেছিল সেটা কী আজ প্রমিসড ল্যান্ডে ঘটবে? যুডাসের মতন লোকজনই দুর্নীতির জন্ম দেয়। সেরকমই কোনও এক আধুনিক যুডাস লখিন্দরের বাসরঘরে একটা ছোট্ট ফুটো নিশ্চয় করেছে যেখান দিয়ে হামাস রকেট ছুঁড়েছে। জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত ইজরায়েল এত বড়ো হামলার শিকার হয়নি। হামাসের আক্রমণে ইজরায়েলের যত প্রাণহানি আর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে সেগুলো সব সত্যি হলে এটা পরিষ্কার যে ইহুদি সংহতিতে ফাটল ধরছে। আয়রন ডোমের যেসব ফাঁক দিয়ে হামাস রকেট বৃষ্টি করছে সেগুলো অবশ্যই তারা ইজরায়েলের হোমরা-চোমরা কেষ্টবিষ্টুদের কাছ থেকেই জানতে পেরেছে। আয়রন ডোম এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের সার্ভার হ্যাক করে সেসব তথ্য বার করার মত ডিগ্রি কিংবা পেডিগ্রি কোনোটাই হামাসের নেই; থাকলে তারা বোমাগুলি নিয়ে মারামারি করে বেড়াত না, ঠান্ডা ঘরে বসে বিশ্ব ব্যাংকের সার্ভার হ্যাক করত।

রূপকথার লাল রঙের গোরু খুঁজতে খুঁজতে আর দাজ্জালের আগমনের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে মস্তিষ্কে শর্ট সার্কিট হয়ে ইজরায়েল এখন চরম ফ্রাস্ট্রেশনে ভুগছে। তাদের একটাই ভয়, যদি দাজ্জাল এসে সেই লাল

গোরুটা না পায় তাহলে তাদের সব মিথ্যা হয়ে যাবে। থার্ড টেম্পলের স্বপ্নটা স্বপ্নই থেকে যাবে। এইসব ধারনার বশবর্তী হয়ে ইজরায়েল এবার বিজ্ঞানের চরম শিখরে পৌঁছে প্রকৃতির সাথে পাঙ্গা নেওয়ার প্ল্যান করেছে। এরকমই কোনও এক elan vital প্রজেক্টে বিক্রিয়ার বদলে বিষক্রিয়া ঘটে গিয়ে বাই প্রোডাক্ট হিসাবে নিজের অজান্তেই ইজরায়েল মানুষের মাথায় গোরুর গ্রে-ম্যাটার ইনস্টল করে ফ্র্যানকেনস্টাইনের দৈত্য তৈরি করে ফেলেছে। সেই দৈত্য এখন আয়রন ডোমকেই শত্রু ভেবে গুঁতো মেরে দুর্বল করে দিচ্ছে।

এ সবই ইজরায়েলী ক্রোমোজোমের চিরন্তন বিধিলিপি। যুডাস ইস্কারিওট ও ব্যারন ভিক্টর ফ্র্যানকেনস্টাইন, দুজনে জন্মগত ভাবে ইহুদিই ছিলেন।।

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী, ভারতীয় ডাক বিভাগ।
কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

"সব থেকে ক্ষতিকর হল অন্ধবিশ্বাস। এ জিনিস মস্তিষ্ককে নিষ্ক্রিয় করে দেয় এবং মানুষকে করে বিপথগামী।... সমস্ত সনাতন ধ্যান- ধারণাকেই চ্যালেঞ্জ করতে হবে। যুক্তিতর্কের শাণিত আক্রমণের মুখে যদি দাঁড়াতে না পারে তবে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে।”

— ভগৎ সিং



ব্রাহ্মণ কী সমাজের শ্রেণিশত্রু?- ভীমবাদ বনাম মার্ক্সবাদ

নিম্নবর্ণের লোকেদের খেপিয়ে তুলে কাস্টের ভিত্তিতে তাদের সংগঠিত করে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিতে যারা চাইছে, তারাও তো ঠিক বিপরীত লাইনে 'কাস্টইজম্' –এরই চর্চা করছেন। একে শ্রেণিসংগ্রাম বলা আর বিজেপিকে সাম্যবাদী বলা একই জিনিস।...

গোপাল মুখার্জী

ভীমবাদিরা মনে করেন ব্রাহ্মণরাই সমাজের শত্রু এবং তারা ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে তাদের সব আক্রমণ শানিত করেন অর্থাৎ সোজা কথায় তারা ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণ্যবাদকে খুব কৌশলে ঘুলিয়ে দেন। এটা এক ধরণের গেমপ্ল্যান। আসুন, বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মতবাদ মার্ক্সবাদের আলোয় দেখেনি তারা কতটা ঠিক আর কতটা বেঠিক। মার্ক্সবাদের একজন অতি ক্ষুদ্র ছাত্র হিসাবে মনে করি, প্রতিটি যুগকে চিনতে হবে সে যুগের মূল দ্বন্দ্বের নিরিখে। প্রাচীন যুগে যেটা ছিল দাস ও দাসপ্রভুর দ্বন্দ্ব, মধ্যযুগে সেটাই ছিল কৃষক ও সামন্তপ্রভুর দ্বন্দ্ব আর আধুনিক যুগে তা হল বুর্জোয়া মালিক ও শ্রমিক-কৃষক দ্বন্দ্ব। সমাজের বাকি সব দ্বন্দ্ব গৌণ, এটিই মুখ্য। শুধুমাত্র এই দ্বন্দ্বের অবসানে শোষিতের জয়ের মধ্যে দিয়েই নবযুগের আহ্বান ঘোষিত হবে। তাই এই যুগে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ, নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান ইত্যাদি কোনো দ্বন্দ্বই 'অ্যাবসোলিউট' বা চরম নয় এবং তা কাম্যও নয়। বরং ধূর্ত বুর্জোয়া শ্রেণি এইসব মেকি দ্বন্দ্বগুলিকে 'হাইলাইট' করে মৌলিক দ্বন্দ্বটি যেটির মধ্যে তারা বিনাশ লুকিয়ে আছে সেটিকেই লঘু করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করে। অর্থাৎ শোষিত জনতাকেই বিভিন্ন দ্বন্দ্বের ঘূর্ণিপাকে ফেলে দিয়ে তাদের ঐক্যকে বিনষ্ট করে দেওয়াই তাদের 'সিক্রেট মাস্টার প্ল্যান'। শ্রেণিচেতনাহীন হলে এই দ্বন্দ্ব উপলব্ধি করা খুব কঠিন হয়ে যায় এবং তারা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে শাসকের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে পড়েন।

ব্রাহ্মণেরা একসময় শাস্ত্রের নামে ধুয়ো তুলে নিম্নবর্ণের লোকেদের শোষণ করেছে সেটা যেমন 'কাস্টইজম্' তেমনি ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে তথাকথিত নিম্নবর্ণের লোকেদের খেপিয়ে তুলে কাস্টের ভিত্তিতে তাদের সংগঠিত করে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিতে যারা চাইছে, তারাও তো ঠিক বিপরীত লাইনে

'কাস্টইজম্'-এরই চর্চা করছেন। একে শ্রেণিসংগ্রাম বলা আর বিজেপিকে সাম্যবাদী বলা একই জিনিস। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দৈনন্দিন সংগ্রাম থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে শ্রেণিচেতনার উদ্ভব হয়, চেতনার সেই স্তরকে উত্তীর্ণ করে যখন যথার্থই শ্রমিকরা বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে এবং শ্রেণিসংগ্রাম সম্পর্কিত মার্ক্সবাদী তত্ত্ব কী তা উপলব্ধি করতে পারবে তখনই ওই শ্রেণি থেকে আসা ক্যাডাররা ব্যক্তিগত বিদ্বেষ থেকে নয়, সঠিক শ্রেণিগত চেতনার ভিত্তিতেই অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক শ্রেণি চেতনার ভিত্তিতেই বুর্জোয়া শ্রেণির আধিপত্য এবং সমাজে জাতপাতকেন্দ্রিক অবমাননার বিরুদ্ধে সঠিকভাবে লড়াই করতে শিখবে। একমাত্র তখনই তারা নিজেদের মধ্যে যে জাতগত অবমাননাবোধ (Caste humiliation) আছে তার স্বরূপটিও সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে এবং তার নিজের মধ্যে যে শ্রেণিগত অবমাননাবোধ রয়েছে, তার বিরুদ্ধেও ক্রমাগত লড়াই পরিচালনা করেই প্রকৃত কমিউনিস্ট হবার চেষ্টা করবে। আর সেই সঙ্গে সে নিজের ও নিজের সমাজের সঙ্গে সামগ্রিকভাবে শোষিত জনতারও মুক্তি ঘটাতে পারবে এবং সমাজকে যুগোত্তীর্ণ করতে পারবে। আর সেটা না করে তার অন্ধ বর্ণচিন্তা থেকে লড়াই করলে শুধুমাত্র তার সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা 'ক্রিমি লেয়ার' তৈরিতেই সাহায্য করবে এবং তার মূল যে মুক্তি সংগ্রাম তা অধরাই থেকে যাবে। তাই অযথা বর্ণান্ধ হয়ে 'ব্রাহ্মণ হঠাও, ব্রাহ্মণ তাড়াও' স্লোগান না তুলে শোষিত জনতার মূল শত্রুকে চিহ্নিত করুন। আওয়াজ তুলুন- 'পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক।', 'ধর্মীয় মৌলবাদ নিপাত যাক',। 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ জিন্দাবাদ'।



বিজ্ঞানমনস্কতা

বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা করে, যা পুনরাবৃত্তিযোগ্য পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ এবং পরিমাপের উপর ভিত্তি করে গঠিত।...**জ্যোতির্ময় দাস মণ্ডল**

প্রথাগত বিজ্ঞানশিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও একজন মানুষ বিজ্ঞানমনস্ক হতে পারেন - এবং সেটা জরুরীও।

তার জন্য আমাদের বিজ্ঞানসম্মতভাবে কিভাবে ভাবতে হয় (How to analyse scientifically) অর্থাৎ যেকোনো বিষয়কে, কিভাবে বিজ্ঞানের আলোয় দেখা হয় - তা জানা উচিত।

তাহলেই একমাত্র বিজ্ঞানের বিপরীত দুটি বিষয় ছদ্মবিজ্ঞান (Pseudoscience), না-বিজ্ঞান (Non-science) এর হাত থেকে কেউ একজন নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পারেন।

কিন্তু তার জন্য বিজ্ঞানের ভিত্তি অর্থাৎ যেখান থেকে

বিজ্ঞানের উৎপত্তি, (অর্থাৎ যুক্তিবিদ্যা বা Logic) তা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা দরকার। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে, সবসময় সেগুলো জানা বা বোঝা সম্ভব নয় – তাই সংক্ষেপে সেগুলির পরিচয় দেওয়া হবে।

বিজ্ঞান দর্শন (Philosophy of Science) হল দর্শনের (Philosophy) একটি মূল শাখা।

কিন্তু এদের মূল পার্থক্য হল; বিজ্ঞান শুধু মাত্র 'বাস্তবতা' (Reality) বা 'সত্য' (Truth) এর ব্যাখ্যা করে, তথ্য (Empirical Data) বা আরোহী যুক্তির (Deductive Logic) মাধ্যমে।

এখন 'বাস্তব', ' সত্য', ' তথ্য', আরোহী যুক্তি –এ সমস্ত কী, তাই জানব।

সবার আগে জানতে হবে, সব কথা বা দাবিই (Claim) কিন্তু বাস্তব বা সত্য নয়!

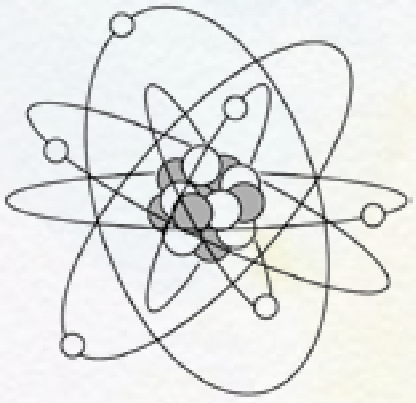
কোনো বক্তব্য (Statement) এর যুক্তিগ্রাহ্যতা বা সত্য মিথ্যা যাচাই (Falsifiability) যাচাই করতে, বহু মানুষ বহু ভুল করেন, – একে যৌক্তিক ভ্রান্তি (Logical Fallacy) বলে।

বহু ফ্যালাসি আছে। এছাড়াও পক্ষপাতদোষ (Bias) আছে। সেগুলো বলার আগে, দুয়েকটি উদাহরণ দেই – তাতে সুবিধা হবে। যেমন একজন সাধারণ মানুষ, হয়ত বললেন 'বৃষ্টি প্রকৃতি মায়ের দান '– এই বাক্য অবৈজ্ঞানিক চিন্তার একটি ছোট্ট উদাহরণ। বাক্যটিতে দুটি ভুল আছে, প্রকৃতিকে মা এর সঙ্গে তুলনা করা এবং প্রকৃতির 'দান' বলা। কিন্তু আমরা জানি প্রকৃতি এবং মা এর ধারণা আলাদা এবং দান হল একটি মানবিক গুন (অর্থাৎ তা প্রকৃতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)।

সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটি হল, আমরা কোনো ভৌত ঘটনা, ঠিক যেটুকু দেখব, সেটুকুই ব্যাখ্যা করব। তার একটু বেশিও নয় বা কম নয় – প্রকৃতিকে আমরা প্রকৃতিই বলব', প্রকৃতি বাবা', 'প্রকৃতি মা, কাকা, জ্যাঠা' কিছু না।

এবং যেহেতু আমরা 'দান' করতে 'দেখিনি' – তাই দান ও বলব না। তাহলে বিজ্ঞানসম্মত বা বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি কী বলবেন?

তিনি বলবেন, 'বৃষ্টি প্রাকৃতিক ঘটনা' বা, Rain is a natural event। এবার বলি, উপরের ঐ দাবীটি অ্যাপীল টু ইগনোরেন্স (Appeal to Ignorance) এই লজিক্যাল ফ্যালাসির উদাহরণ।



২

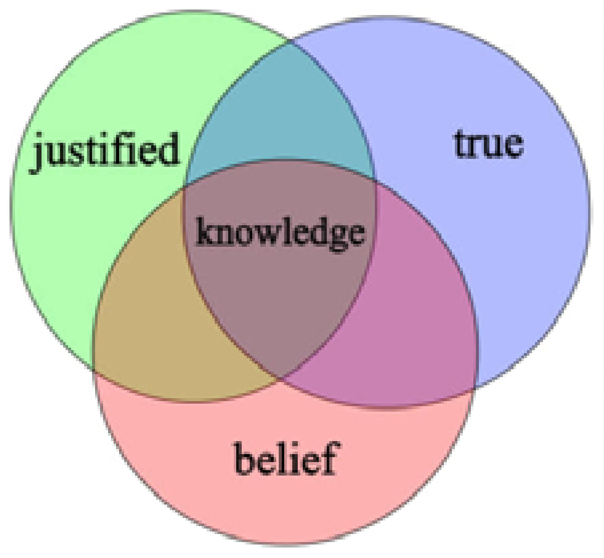
বিজ্ঞানমনস্কতার একটি উদাহরণ দিয়েছিলাম এবং তা সম্পর্কিত একটি যৌক্তিক ভ্রান্তি (Logical Fallacy) আলোচনা করছিলাম। উদাহরণটি দিয়ে শুরু করেছিলাম, যাতে আলোচনাটি আকর্ষক হয় – কারণ, বিজ্ঞান ও তৎসম্পর্কিত বিজ্ঞান দর্শন (Philosophy of Science) সবার হয়ত পাঠ্য ছিল না এবং কিছু ক্ষেত্রে ব্যাপারগুলি জটিল।

তবে শুধুই উদাহরণ জানলেই হবে না – বিজ্ঞানমনস্ক চেতনা আত্মীকৃত করতে আর একটু জানতে হবে।

প্রথমেই জেনে নিই বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতার পার্থক্য।

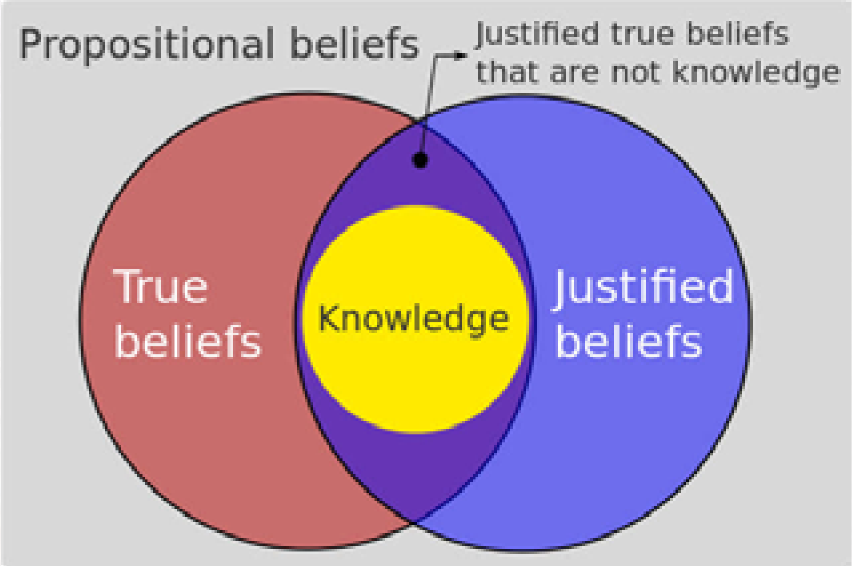
বিজ্ঞান হল এই মহাবিশ্বের কোনো ভৌত ঘটনার (Physical Phenomenon) পর্যবেক্ষণযোগ্য (Observable), পরীক্ষালব্ধ (Testable) ও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তযোগ্য (Conclusive) জ্ঞান (Knowledge) জ্ঞান কী পরে বলব) কিন্তু বিজ্ঞানমনস্কতা হল মুক্ত চিন্তা গ্রহণ করার ইচ্ছা (Open Minded Temper), যদি তা প্রচলিত ধারণা (Idea) বা মতবাদ (Opinion) এর বিরোধী হয়, তবুও। এখন ভৌত ঘটনা (Physical Phenomenon), জ্ঞান (Knowledge)কী?

ভৌত ঘটনা হল, সেই সকল ঘটনা যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (Observable) অর্থাৎ যাকে পরিমাপ করা যায়। এবং জ্ঞান হল কোনো বিষয় বা ঘটনা (Phenomenon) বিষয়ক একধরনের সচেতনতা (Awareness) বা পরিচিতি (Familiarity)।



চিত্র-১

অপরদিকে জ্ঞানের বিভিন্ন সংজ্ঞা আছে ; একটি প্রচলিত সংজ্ঞা হল, 'জ্ঞান হল যাচাইকৃত সত্য যা বিশ্বাস করা হয় (Justified True Beliefs, JTB ; প্রথম ছবি)' কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দার্শনিক এডমুন্ড গেটিয়ার একটি উদাহরণ দিয়ে দেখালেন, উপরোক্ত সংজ্ঞাটি ঠিক নয় যেখানে সত্য বিশ্বাস (TB), যাচাইকৃত (J) নয় (দ্বিতীয় ছবি)। সবচেয়ে প্রচলিত উদাহরণ, 'পোটেমকিন গ্রাম (Potemkin Village, তৃতীয় ছবি)' – এটি একটি বাড়ি ঘর সম্বলিত গ্রাম কিন্তু কোনো অধিবাসী নেই।



চিত্র-২

পরিমার্জন করে জ্ঞানের সংজ্ঞা দেওয়া হল, জ্ঞান হল যাচাইকৃত সত্য বিশ্বাস যাতে কোন মিথ্যা বিশ্বাস (False Belief, FB) নেই।


চিত্র-৩

এবার বলি জ্ঞান মূলতঃ দুপ্রকার

১) প্রস্তাবিত জ্ঞান (প্রোপোজিশনাল নলেজ) : উদাহরণ : 'আমি জানি রাম বাড়ি আছে।', '২ + ২ = ৪' ইত্যাদি।

২) অপ্রস্তাবিত জ্ঞান (ননপ্রোপোজিশনাল নলেজ) (বা নো - হাউ Know - How) : উদাহরণ, রহিম সাঁতার কাটতে দক্ষ।

৩

এর আগের অংশে (দ্বিতীয় পর্ব) দেখেছিলাম ; জ্ঞান মূলতঃ দুপ্রকার ; যথা প্রস্তাবিত জ্ঞান (বা Propositional Knowledge) ও অপ্রস্তাবিত জ্ঞান (বা non-Propositional Knowledge) [১]। বিজ্ঞানমনস্কতা বিষয়ক আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যেতে, আমাদের আরও কিছু দর্শনের ধারণা জানতে হবে - জ্ঞান তার মধ্যে অন্যতম। তাই এখানে জ্ঞান সম্পর্কে আরেকটু জানব।

জ্ঞান বিবিধ উপায়ে উৎপন্ন হয় ; বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান (Empirical Knowledge) এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল অনুভব (Perception), যা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অর্জিত হয়।

অবশ্য অনেক তাত্ত্বিকের মতে, ইন্ট্রোস্পেকশান (Introspection) কেও জ্ঞানের উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয় - তবে বাহ্যিক শারীরিক বস্তুর নয়, মানসিক অবস্থার (Mental States)।

অন্যান্য উৎসগুলির মধ্যে রয়েছে স্মৃতি, যুক্তিবাদী অন্তর্দৃষ্টি (Rational Intuition), অনুমান (Inference) এবং সাক্ষ্য (Testimony)।

ভিত্তিবাদের (Foundationalism) মতে, এই উৎসগুলির মধ্যে কয়েকটি এই অর্থে মৌলিক যে তারা অন্যান্য মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর না করে, বিশ্বাসকে ন্যায্যতা দিতে পারে।

এই দাবিটি সমন্বয়বাদীদের (Coherentist) দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়, যারা যুক্তি দেন যে জ্ঞানের জন্য বিশ্বাসীর সমস্ত মানসিক অবস্থার মধ্যে পর্যাপ্ত মাত্রার সমন্বয় প্রয়োজন।

আবার অসীমবাদ (Infinitsm) অনুসারে, বিশ্বাসের একটি অসীম শৃঙ্খল (Infinite chain) প্রয়োজন।

জ্ঞানের অনেক দিক খতিয়ে দেখা হয়, এবং এটি বিভিন্ন দর্শন শাখায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এটি জ্ঞানতত্ত্বের (Epistemology) প্রাথমিক বিষয়, যা অধ্যয়ন করে যে - কেউ কী জানে, তারা কীভাবে এটি জানতে পারে এবং কিছু জানার অর্থ কী।

জ্ঞানের মূল্যের (Value of Knowledge) প্রশ্ন করে যে জ্ঞান কেন নিছক সত্য বিশ্বাসের (True Belief, TB) চেয়ে বেশি মূল্যবান।

দার্শনিক সংশয়বাদ (Scepticism) আবার বলে, যে মানুষের কোন ধরনের জ্ঞান নেই বা জ্ঞান অসম্ভব।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞানতত্ত্ব অধ্যয়ন করে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, জ্ঞান এবং সম্পর্কিত বিষয়গুলি কীভাবে আচরণ করে এবং তারা একে অপরের সাথে কী সম্পর্ক রাখে তা নিয়ন্ত্রণ করে।

বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা করে, যা পুনরাবৃত্তিযোগ্য পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ এবং পরিমাপের উপর ভিত্তি করে গঠিত।

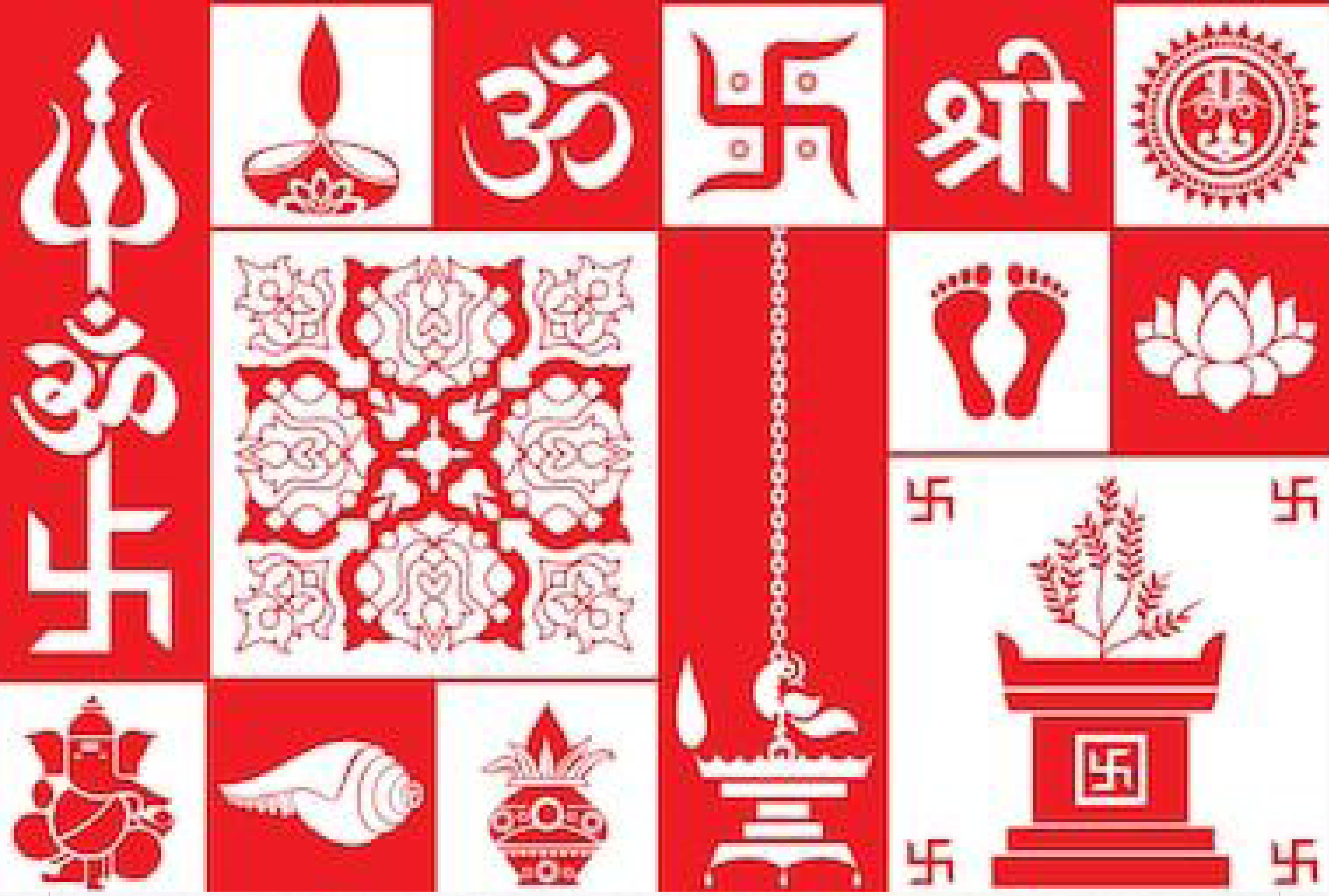
অনেক ধর্মমত আবার মনে করে যে মানুষের জ্ঞান অন্বেষণ করা উচিত এবং ঈশ্বর বা ঐশ্বরিক কিছু জ্ঞানের উৎস।

ছবি : উইকিপিডিয়া

[তথ্যসূত্রঃ [১] CD staff. 'Knowledge' . Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus. Cambridge University Press. Retrieved 3 December 2023.

[২] Ichikawa, Jonathan Jenkins; Steup, Matthias (2018). 'The Analysis of Knowledge' . The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University. Archived from the original on 2 May 2022. Retrieved 24 May 2022.

[৩] Kraft, Tim (2012). 'Scepticism, Infallibilism, Fallibilism' . Discipline Filosofiche. 22 (2): 49–70. Archived from the original on 2 June 2022. Retrieved 12 June 2022.]



হিন্দু ধর্মের বিবর্তন

সারা দেশে অজস্র গুরু, মহাগুরুরা এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। কেন্দ্র ও রাজ্যের ক্ষমতাশীল ‘ধর্মনিরপেক্ষ হিন্দু সরকার’-এর আন্তরিক সহযোগিতায়... **রাজু দত্ত**

পৃথিবীতে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের অস্তিত্ব নেই যারা ঐক্যবদ্ধ। সবাই বিভাজিত বহু শাখা প্রশাখায়। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা শিয়া-সুন্নি, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা ক্যাথলিক-প্রোটেস্টান্ট, বৌদ্ধরা হীনযান-মহাযান, জৈনরা দিগম্বর-শ্বেতাম্বর এইরকম বহুবিভাজিত সকল প্রতিষ্ঠানিক ধর্ম। তবে হিন্দুরা (পড়ুন ব্রাহ্মণ্যবাদীরা) এই জাতীয় বিভাজনে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। যার কোনো তুলনা নেই।

প্রাচীন বৈদিক যুগ, পরবর্তী বৈদিক যুগ হয়ে, পৌরাণিক যুগ, মহাকাব্যের যুগ, মঙ্গলকাব্যের যুগ পেরিয়ে সাম্প্রতিক কালের ‘গুরুবাদী’ যুগ পর্যন্ত এর অজস্র বিভাজন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার ভাগে বিভাজিত প্রাচীন বৈদিক হিন্দু (ব্রাহ্মণ্য) ধর্ম। এরপর আরও বিভাজন এই ধর্মের প্রবল অনৈক্য স্পষ্ট করেছে।

ভুলে গেলে চলবে না এ দেশে বসবাসকারী

আদিবাসীরা বৈদিক ‘হিন্দু’ নয়। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস স্বতন্ত্র। কারণ বৈদিক আর্যভাষা গোষ্ঠির জনজাতি এ দেশে আসার বহু আগেই তারা এ দেশে বসবাস করত। আর্যভাষা গোষ্ঠির জনজাতি আসার আগে এ দেশ জনশূন্য ছিল না।

হিন্দুধর্ম এই নামটিই সোনার পাথরবাটি। আসল নাম হল, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। অর্থাৎ ‘যারা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক’। এই নামেই পরিষ্কার বোঝা যায়, হিন্দু ধর্মের প্রণেতারা ছিল নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক বা একেশ্বরবাদী।

এরপর শুরু হল প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা যা ক্রমে দেবদেবীর রূপকল্পের সৃষ্টি করল। পরবর্তী বৈদিক যুগ থেকে এই রূপকল্প বিবর্তিত হতে থাকল। যেমন নদীর দেবী সরস্বতী হয়ে গেল বাকদেবী সরস্বতী। আবার পশুপালক আর্যদের উপাস্য দেবতা পশুপতি রুদ্র হয়ে গেল দেবাদীদেব মহাদেব (শিব)। এইভাবে বিবর্তিত হতে থাকল হিন্দু দেবদেবীরা।

বিবর্তনের ফলে ‘অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে বিলুপ্ত হয়ে গেল কিছু দেবদেবী (উদাহরণ, পুষণ দেবতা, অদিতি দেবী)। সৃষ্টি হল নতুন দেবদেবীদের রূপকল্প। পুরাতন রূপকল্পগুলি মন্ত্রেই টিকে থাকল। আলাদা করে তাদের আর উপাসনা করা হল না। পৌরাণিক ও মহাকাব্যের যুগের দেবদেবীরাই পূজা পেতে থাকল। এখনও ভারত জুড়ে এই সকল দেবদেবীরাই পূজা পেয়ে থাকে। বৈদিক দেবদেবীরা এখানে মন্ত্রেই অস্তিত্ব রক্ষা করে থাকে।

ছয় শতকে গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীরের ধর্মসংস্কার আন্দোলন প্রতিক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে সংকটগ্রস্থ করে তোলে। গৌতম বুদ্ধের আন্দোলন ছিল অত্যন্ত বলিষ্ঠ। তার প্রগতিশীল আধুনিক চিন্তা সমাজে আমূল পরিবর্তনেরর দিকনির্দেশ করল। সমাজের শোষিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অসহায় মানুষ তো বটেই, বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করল শাসকশ্রেণির একাংশ। যার সবচেয়ে

উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সম্রাট অশোক। তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, এই ধর্ম প্রচারে পাঠিয়েছিলেন নিজের সুযোগ্য পুত্র মহেন্দ্রকে। তার আমলে বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। শঙ্কিত হয়ে ওঠে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা। প্রবল আক্রমণ নেমে এল বৌদ্ধদের ওপর। বৌদ্ধমঠসহ বৌদ্ধদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা হল। বিস্তারিত লিখে প্রসঙ্গান্তরে যাচ্ছি না।

এরপর বাংলায় এল মঙ্গলকাব্যের যুগ। এই যুগ মূলত বাংলাকে কেন্দ্র করে উদ্ভুত। সৃষ্টি হল মনসা, শীতলা, ধর্মঠাকুর, লক্ষ্মী (বৃহস্পতিবারে পুজো হয়) সহ বেশ কিছু লৌকিক দেবদেবী। এদের উপাসনা মূলত বাঙালি মেয়েরা করে থাকে। এই সময় বাংলায় জন্মগ্রহণ করলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু।

ভক্তিবাদী যুগের সূচনা পঞ্চদশ শতকে ও মূলত সপ্তদশ শতক পর্যন্ত এর স্থায়িত্ব। এই যুগে জন্মগ্রহন করেন রামানুজ, নিম্বার্ক, কবির, গুরু নানক, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু প্রমুখ ধর্ম সংস্কারকরা। এরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরোধিতা করলেন। বিরোধিতা করলেন মূর্তিপূজার। প্রচার করলেন সব মানুষ সমান। ঈশ্বর আল্লাহ গড সব এক সৃস্টিকর্তার বহু নাম। এরা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে কাছে টেনে নিলেন।

ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বিপদ বুঝে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নামিয়ে আনলো প্রত্যাঘাত। চৈতন্যদেবের আকস্মিক 'রহস্যমৃত্যু' যার একটি দৃষ্টান্ত। ইসলামের বিরোধিতা করায় নানক পরবর্তী শিখগুরুদের উপর নেমে এসেছিল প্রবল আক্রমণ। মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে তাদের। উল্লেখ্য এই সময় 'সুফিবাদি' আন্দোলন ও গড়ে উঠেছিল। যা এই প্রবন্ধের বিষয় নয়, তাই সে বিষয় আলোচনা করছি না।

১৯ শতকের প্রথমার্ধে রাজা রামমোহন রায় হিন্দুধর্ম সংস্কার করার চেষ্টা করেন। তিনি প্রাচীন বৈদিক যুগে

বর্ণিত একেশ্বরবাদের প্রচার করেন। বিরোধিতা করেন পৌত্তলিকতার। আন্দোলন গড়ে তোলেন হিন্দুসহ সকল প্রতিষ্ঠানিক ধর্মের গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। তিনি গড়ে তুললেন এক নতুন ধর্মমত, ব্রাহ্মধর্ম। টোলের ধর্মীয় শিক্ষার বদলে তিনি খুলে দিলেন পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা ও নারীশিক্ষার দ্বার। ফলে আধুনিক প্রগতিশীল চিন্তাধারার মানুষজন দলে দলে ব্রাহ্ম হতে থাকলেন। উল্লেখ্য আমাদের একান্ত আপনারজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম পরিবারের ছিলেন। তো ব্রাহ্মদের এই উত্থান দেখে শিউরে উঠল রক্ষনশীল ব্রাহ্মণ্যবাদীরা। সংকট নেমে আসল ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজে। শুরু হল ভারতের নবজাগরণ।

ঠিক এই সময় গড়ে উঠল গুরুবাদী আন্দোলন। এই আন্দোলনে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব। তাকে গুরুবাদী আন্দোলনের পুরোধা বলা চলে। তিনিই এই আন্দোলের সফলতম মহানায়ক। শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়াও সাঁইবাবা, বামাক্ষ্যাপা, স্বামী প্রণবানন্দ, রাম ঠাকুর, অনুকূলঠাকুর সহ বহুজন এই যুগে গুরুবাদী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যান।

বর্তমান সময় গুরুবাদী আন্দোলন প্রবল জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সারা দেশে অজস্র গুরু, মহাগুরুরা এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। কেন্দ্র ও রাজ্যের ক্ষমতাশীল 'ধর্মনিরপেক্ষ হিন্দু সরকার'-এর আন্তরিক সহযোগিতায় 'গুরুবাদী আন্দোলন বর্তমানে দেশের সবচেয়ে বলিষ্ঠ আন্দোলন হয়ে উঠেছে। তবে ইস্কন ও রামকৃষ্ণ মিশনের পারস্পরিক খেয়োখেয়ি এই মহান আন্দোলন কে কালিমালিপ্ত করছে। দ্রুত এই খেয়োখেয়ির অবসান না হলে 'হিন্দুরা কখনোই ঐক্যবদ্ধ ছিল না' এটা আরেকবার প্রমাণিত হবে।



অমরনাথ আইসকেভ



অস্ট্রিয়ার আইসকেভ

আইসকেভ : অমরনাথে ও অস্ট্রিয়ায়

খোদ মহাদেব অমরনাথে বিরাজ করেন, মনে করেন হিন্দুরা। তাহলে অস্ট্রিয়াসহ পৃথিবীর বড়ো বড়ো কেভগুলিতে কে বিরাজ করেন?...**দীপক রায়**

সারা পৃথিবীতে 'আইসকেভ' বা 'স্ট্যালাগমাইট কেভ' আছে অজস্র। সবচেয়ে বড়ো এবং অবাক করার মত দৃষ্টিনন্দন আইসকেভ আছে অস্ট্রিয়ায়। তার আকৃতি, ব্যাপকতা, নান্দনিকতা অনেক বেশি। সেখানেও প্রচুর মানুষ দেশবিদেশ থেকে দেখতে যান।

অন্যদিকে ভারতের বৃহত্তম 'আইসকেভ' আছে, যা 'অমরনাথ' নামে বিখ্যাত। সেটা 'অলৌকিক শিবলিঙ্গ' বলে আখ্যায়িত। যদিও এতে অলৌকিকতার লেশমাত্র নেই। একটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঘটনামাত্র। অমরনাথ অলৌকিক হলে অস্ট্রিয়ারটাও অলৌকিক হওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু অস্ট্রিয়ার আইসকেভ সাদামাটা দর্শনীয় স্থান, ভারতের আইসকেভ তীর্থক্ষেত্র!

খোদ মহাদেব অমরনাথে বিরাজ করেন, মনে করেন হিন্দুরা। তাহলে অস্ট্রিয়াসহ পৃথিবীর বড়ো বড়ো কেভগুলিতে কে বিরাজ করেন? অনেকেই মনে করেন অমরনাথের ঘটনা বিস্ময়কর এবং এমনটি দুনিয়ার আর কোথাও নেই। এখানে মহাদেব জাগ্রত। তাহলে অন্যগুলি কী? কার সৃষ্টি? অন্য কোন ভগবানের? আল্লাহের? ঈশ্বরের? কার? বলা বাহুল্য, এই প্রশ্নের উত্তর কোন আস্তিকের কাছেই নেই।

বাস্তবতা হল, এই সুন্দর প্রাকৃতির সৃষ্টিকে ধর্মের মোড়কে রেখে ব্যবসা। সব ধর্মেই এই চেষ্টাটা আছে। এখন প্রগতির যুগ, ফলে অমরনাথের থেকেও বড়ো এবং অবাক করা কেভের ছবি প্রকাশ্যে এসে পড়ে। তবুও অমরনাথে মহাদেব বিরাজ করেই যাবেন। বোকা আস্তিকের দল সেটাকেই ভগবান বলে কপাল ঠুকবে, পয়সা ঢালবে। সরকারী অর্থ বেলাগামভাবে ঢালা হবে।

আরেকটা মজার ব্যপার আছে। দুনিয়ার কোন আইসকেভে যেহেতু ভগবান আল্লা ঈশ্বর নেই, সেহেতু সেখানে শুধুমাত্র পর্যটকেরাই যান। ফলে সেখানে অতিরিক্ত নিরাপত্তার প্রয়োজন হয় না। অপরদিকে অমরনাথ আইসকেভে যেহেতু ভগবান শিব বসে আছে, সেহেতু সেখানে ভক্তেরা যায়। হামলা অশান্তি বিস্ফোরণ রক্তপাত হয়। ফলে সেনা-পুলিশের ব্যপক নিরাপত্তার আয়োজন করতে হয়।



প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের উৎপত্তির কারণ ও ভূমিকা

যুক্তিবাদী দৃষ্টিতে বলা যায় আজ থেকে ৫০ বছর পরে ধর্ম শুধুমাত্র গরিব মানুষের এবং গরিব দেশগুলিতে রয়েযাবে। এ ছাড়া রয়েযাবে যারা উদ্বেগ ও জটিলতায় ভুগবে তাদের কাছেই।...**অভিষেক ঘোষ**

যুক্তিবাদীদের প্রশ্নের উত্তরে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সাফাই গাইতে গিয়ে ধর্মবিশ্বাসীরা বলে থাকেন শুধুমাত্র বিশ্বাস ছাড়াও ধর্মের আরও কিছু কিছু কাজ রয়েছে। ‘উত্তাল সমুদ্রে কেউ নাস্তিক নয়’ এজাতীয় কথা প্রায়ই শোনা যায়। তাদের ধর্মের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দেওয়া এক একটি যুক্তির কথা তুলে ধরা যাক। নীচে উল্লেখিত প্রয়োজনীয়তাগুলোকে আমরা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের

উৎপত্তির কিছু কারণ হিসেবেও ধরে নিতে পারি।

১. বিষয় ব্যাখ্যা (explanation) :

প্রাচীন কালে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার স্বাভাবিক ব্যাখ্যা দিতে যখন মানুষ অসমর্থ ছিল তখন সেগুলির নানান অতিপ্রাকৃত কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন করবার চেষ্টা করত। আদিম শিকারি যেমন বাঘের পায়ের ছাপ দেখে সতর্ক হতে শিখেছিল তেমনভাবেই তারা প্রকৃতির নানা ঘটনা সম্পর্কে অনুমান করত এবং সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করত। এই অনুমান অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত হত না। যেমন বলা যায় সাধারণ অনুমান থেকেই মানুষ ভাবতে বসেছিল পৃথিবী স্থির এবং সূর্য নামক নক্ষত্রটি তার চারপাশে ঘুরছে। পরবর্তীকালে যখন বিজ্ঞান উন্নত হয় তখন সূর্যকেন্দ্রিক গ্রহের ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তবে ইতিমধ্যে পৃথিবীকেন্দ্রিক ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা ধর্মগ্রন্থ গুলোতে স্থান পেয়ে গিয়েছিল। এই হাজার বছরের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আবেগকে সরাতে বিজ্ঞানী গ্যালিলিও, কোপারনিকাসদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। আমাদের দেশে সূর্যগ্রহনের ধর্মীয় ব্যাখ্যাটি যেমন এখনো অনেকের মগজে দৃঢ়প্রবিষ্ট রয়ে গিয়েছে। যাই হোক, ধর্মীয় বিশ্বাসের একটি কারণ ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা এটি সহজবোধ্য।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অপব্যাখ্যা করার প্রবণতা কমবে সঠিক কার্যকারণ পেতে থাকলে ধর্মবিশ্বাসের এই কারণটি একদিন লুপ্ত হবে এবং আশার কথা আমরা সেই দিকেই চলেছি।

২. ধর্মীয় প্রথা (ritual) প্রার্থনার মাধ্যমে উদ্বেগ হ্রাস করা (Diffusing anxiety):

ধর্মবিশ্বাস উৎপত্তির আরেকটি কারণ হল মানব মনে উদ্ভুত আশঙ্কা, উদ্বেগ, ইত্যাদির intensity কমানো। বিপদের সময় মানুষ অতিপ্রাকৃত কোন শক্তির শরণাপন্ন

হয়ে নিজের উদ্বেগ কমানোর চেষ্টা করে থাকে। মনস্তাত্বিক ভাবে বলা যায় ধর্মবিশ্বাসীদের এই বিষয়ে একটি advantage রয়েছে। অতিপ্রাকৃত অলৌকিক তাদের যন্ত্রণা লাঘব করবে এই বিশ্বাস অনেকটা placebo effect এ কাজ করে থাকে এবং কিছু ক্ষেত্রে এতে ফল পাওয়া যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই বিশ্বাস সত্য থেকে দূরের এবং যেকোন অবাস্তব চিন্তা বিজ্ঞান ও যুক্তিবিরোধী।

মানুষ এখন যে সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তাতে উদ্বেগ, জটিলতা বাড়ছে।কাজেই বলা যায় ধর্মবিশ্বাসের এই কারণটি আরও ঘনীভূত হতে থাকবে।

৩. জীবনের অর্থ সন্ধান, ধর্মদর্শন : (finding false meaning of life)

ধর্মবিশ্বাসীরা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের মাধ্যমে জীবনের অর্থ খুঁজে পাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে থাকেন। জীবনের জটিলতা থেকে বেরিয়ে গিয়ে, বাস্তব থেকে দূরে গিয়ে ‘উচ্চতর’ কিছুর চিন্তার, চর্চার মাধ্যমে তারা বোধ করেন অন্যদের থেকে তারা স্বতন্ত্র ও উচ্চভূমিতে অবস্থিত। যা একটি পলায়নপর মনোবৃত্তি সেই সঙ্গে ভ্রান্ত অহং বৃদ্ধি ও করে থাকে। এছাড়াও ধর্মগ্রন্থ গুলিতে যে দর্শন লুকিয়ে আছে, (যা কিছুটা থাকতে বাধ্য, কারণ সম্ভবত ভারতে ধর্মবিষয়েই সবচেয়ে বেশি পুস্তক লেখা হয়েছে, রয়েছে মানব মস্তিষ্কের যোগ) তার অনুসন্ধান এর মাধ্যমে অনেকে আত্মতৃপ্তি পেয়ে থাকেন।

যেমন বলা যায় প্রতি ধর্মদর্শনে যে স্বর্গের (উচ্চতর ভূমির, যাতে নাকি কোন কষ্ট নেই) কল্পনা তার সৃষ্টির মানসিক কারণ হল বাস্তব জগতের অত্যন্ত কষ্টকর যাত্রার থেকে পরিত্রাণ পাবার কাল্পনিক ইচ্ছা।

ধর্মবিশ্বাসের এই কারণটি সমাজের শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অবলুপ্তির দিকে চলে যাবে, আশা করা যায়।

৪. রাজা বা ক্ষমতাধরকে ঈশ্বরের প্রতিভূ মনে করা (king as pipeline to God):

যে সময় থেকে যখন মানুষের মধ্যে ফসলের অসমবন্টন হতে লাগল প্রায় সে সময় থেকেই সম্পদ একজনের কাছে পুঞ্জিত হল এবং সে অন্যদের থেকে আলাদা হল। tribal সমাজে মুখিয়া, বা সরপন্চ নির্বাচন বহু প্রাচীন প্রথা। মানুষ বিশ্বাস করত বা মানুষকে নানাভাবে বিশ্বাস করানো হত এই নির্বাচিত প্রধানের সঙ্গে অতিপ্রাকৃত শক্তির যোগাযোগ আছে। সম্ভবত প্রকৃতির ঘটনাবলী সম্পর্কে দীর্ঘদিনের অভ্যাসবশত এরা ভাল predict করতে পারত বলেই এই বিশ্বাস তাদের ওপর তৈরি হয়েছিল।

এই প্রধানের সঙ্গে কাল্পনিক ঈশ্বরের যোগ যখন থেকে তৈরি করা হল তখন থেকে মানুষের মনে দাসত্বের মনোবৃত্তি তেরী হল, মানুষ প্রশ্ন না করেই অন্যায়কে মেনে নেবার মানসিকতায় অভ্যস্ত হল। তবে এসব হল অনেক আগের কথা। তারপর অনেককিছু বদলেছে। রাজতন্ত্র গিয়ে গণতন্ত্র এসেছে। কিন্তু প্রধানকে ঈশ্বরের প্রতিভূ মনে করার দাসসুলভ মনোবৃত্তি এখনো যে সম্পূর্ণ লোপ পায়নি তা কিছু দেশের দিকে তাকালে এখনো বোঝা যায়।

৫. অচেনা মানুষের সঙ্গে মিশতে পারা (getting along with stranger):

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম মানুষকে দলবদ্ধ করাতে ভূমিকা নিয়েছিল। আদিম সময়ে যখন ছোটো ছোটো দলে বাস করত তখন অচেনা দলের অচেনা মানুষকে সমসময়ই তারা শত্রু মনে করত, সমস্যা হয় যখন দেখা যায় প্রতিটি দলই বড়ো হতে থাকে এবং সেক্ষেত্রে লড়াইয়ের ফলে দুপক্ষের সমূহ প্রাণনাশ হতে থাকে। এক্ষেত্রে দলগুলি একটি মধ্যপন্থা নেয়। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের ‘thou shall not kill’ জাতীয় মত হয়ত সেই সময় থেকেই এসেছে।

যাইহোক, ধর্মের কারণে পাপবোধ মানুষকে অন্য মানুষকে হত্যা করতে আদিম অবস্থাতে বারণ করেছিল একমাত্র যদি তারা একই ধর্মাবলম্বী হয়। অন্য ধর্মের ক্ষেত্রে পরস্পর হত্যাই ছিল নিজেদের দল বাঁচিয়ে রাখার পথ।

৬. যুদ্ধের সপক্ষে যুক্তি দেওয়া (justification of war):

অনেক অনেক পরে Thou shall not kill জাতীয় ধর্মীয় মতবাদ যখন মানুষের মনে ঘাঁটি গেড়েছে, সে অবস্থায় এক অন্যরকম সমস্যার সৃষ্টি হল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দেখা গেল US এর সৈন্যরা বিপক্ষের ওপর অস্ত্র চালাতে চাইছে না, তাদের সনাতন ধর্মসংস্কার তাদের হত্যা করতে নিষেধ করছে, কারণ এটা ধর্মরক্ষার যুদ্ধ নয় নিতান্তই রাজনৈতিক লড়াই। এক্ষেত্রে বিপক্ষকে অপরাধী প্রতিপন্ন করা এবং বীরের লড়াই করে স্বর্গলাভের মোহ দেখাতে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সাহায্য নিল যুযুধান পক্ষ। US সেনাদের প্রথমে একটি করে পুতুল দিয়ে তাকে target practice এ কাজে লাগানো হল। যত দিন যেতে লাগল পুতুলটিকে ক্রমেই বাস্তব মানুষের মত করে তৈরি করা হতে লাগল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি সেনাকেও এভাবেই চিনাদের বিরূদ্ধে লড়াই করতে সেখানো হয়েছিল।

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মসৃষ্টির নানা কারণ ও কোন কৌশলে তাকে স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যবহার করা হয়েছিল, সেই বিষয়ে কিছু আলোকপাত করা হল—

যুক্তিবাদী দৃষ্টিতে বলা যায় আজ থেকে ৫০ বছর পরে ধর্ম শুধুমাত্র গরিব মানুষের এবং গরিব দেশগুলিতে রয়ে যাবে। এ ছাড়া রয়ে যাবে যারা উদ্বেগ ও জটিলতায় ভুগবে তাদের কাছেই। অবশ্যই যারা ভ্রান্ত ধারণা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যথেষ্ট শিক্ষা পাবে না তাদের কাছে। বাকি সবক্ষেত্রে ক্রমে ক্রমে ধর্ম লোপ পেতে থাকবে।

এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো, ধর্ম শব্দটির সঙ্গে নৈতিকতা শব্দটিকে সমার্থক যেন করে না নেওয়া হয়। নৈতিকতা কিছুটা মানুষের স্বভাবজাত কিছুটা শিক্ষার মাধ্যমে আহরিত। আমরা চাই ধর্ম লোপ পাক। নৈতিকতা ও মানবিকতা বোধ ছড়িয়ে পড়ুক। মানবতাবাদী হিসেবে ভবিষ্যতের কাছে আমার আশা এটুকুই।



কিটোজেনিক বা ‘কিটো’ ডায়েট নিয়ে কিছু কথা

কিটো ডায়েট হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো কারণ এটি খারাপ কলেস্টেরলে কমায় ও ভালো কলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি করে যা হৃৎপিণ্ডের কার্যকারীতার জন্য উপযোগী...**সায়ন**

কিটোজেনিক বা ‘কিটো’ ডায়েট বর্তমানে বহু প্রচলিত একটি শব্দ। কিন্তু এটি কি, দৈনন্দিন জীবনে এই আহার পদ্ধতি মেনে চলা উচিত কি না এবং মানবশরীরে এর কী কী প্রভাব দেখা যায়, সেগুলোই এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

এই আহার পদ্ধতিতে কম কার্বোহাইড্রেট ও অধিক ফ্যাট সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহন করা হয়। সঠিক ওজন বজায় রাখা সহ নানান রোগ নিরাময় করার উদ্দেশ্য চিকিৎসকরা বহুদশক ধরে এই ধরনের খাদ্যপ্রণালী মেনে চলার

পরামর্শ দিয়ে আসছে। ১৯ শতকে কেটোজেনিক ডায়েট সাধারণত ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করার জন্য শুরু হয়। ১৯২০ সালে এটই ডায়েট পদ্ধতিটি শিশুদের মধ্যে মৃগীরোগের কার্যকর চিকিৎসা হিসাবে চালু করা হয়েছিল। ক্যান্সার, ডায়াবেটিস এবং আলজ্যাইমারসহ নানান রোগকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য এই পদ্ধতির পরীক্ষামূলক ব্যবহার করা হয়েছে এবং বেশকিছু যায়গায় পজিটিভ ফলাফল পাওয়া গেছে।

কিভাবে এটি কাজ করে?

ওজন কমানোর জন্য কিটোজেনিক ডায়েট কীভাবে কাজ করে সেটাই এবার আলোচনা করা হবে। কিটোজেনিক ডায়েটে যেহেতু কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার (শরীরের সমস্ত কোষ এটিকে ব্যববহার করে শক্তি উৎপাদন করার জন্য) কম থাকে, শরীর তখন সঞ্চিত ফ্যাট ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদন করার জন্য।

মস্তিস্ক শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় বেশি গ্লুকোজ ব্যববহার করে। উপবাসের সময় বা খুব কম কার্বোহাইড্রেট খাওয়া হলে, শরীর প্রথমে সঞ্চিত গ্লুকোজ থেকে টেনে নেয়। যখন কিটোন বডি রক্তে জমা হয় তখন একে কেটোসিস বলে। সুস্থ ব্যক্তিরা স্বাভাবিকভাবেই উপবাসের সময় (যেমন, সারারাত ঘুমানো) এবং খুব কঠোর ব্যায়ামের সময় হালকা কিটোসিস অনুভব করেন। কেটোজেনিক ডায়েটের প্রবক্তারা বলছেন যে যদি ডায়েটটি যত্ন সহকারে অনুসরণ করা হয় তবে রক্তে কিটোনের মাত্রা ক্ষতিকারক স্তরে পৌঁছানো উচিত নয়, কারণ মস্তিষ্ক জ্বালানীর জন্য কিটোন ব্যবহার করবে এবং সুস্থ ব্যক্তিরা সাধারণত প্রতিরোধ করার জন্য যথেষ্ট ইনসুলিন তৈরি করবে। জনপ্রিয় কেটোজেনিক সংস্থানগুলি দৈনিক মোট ক্যালোরির গড়ে ৭০-৪০% চর্বি, ৫-১০% কার্বোহাইড্রেট এবং ১০-২০% প্রোটিনের

থেকে নেওয়ার পরামর্শ দেয়। এখন পরমার্শ মানলে ২০০০-ক্যালোরি খাদ্যের জন্য, প্রায় ১৬৫ গ্রাম চর্বি, ৪০ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট এবং ৭৫ গ্রাম প্রোটিন গ্রহণ করতে হয়। কেটোজেনিক ডায়েটে প্রোটিনের পরিমাণ অন্যান্য কম-কার্ব অধিক-প্রোটিন জাতীয় খাবারের তুলনায় মাঝারি রাখা হয়, কারণ খুব বেশি প্রোটিন খাওয়া কিটোসিস প্রতিরোধ করতে পারে। কেটোজেনিক ডায়েটের অনেক সংস্করণ বিদ্যমান, তবে সব ক্ষেত্রেই কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ খাবার নিষিদ্ধ থাকে বা নাম মাত্র থাকে। বেশিরভাগ কেটোজেনিক প্ল্যানগুলিতে স্যাচুরেটেড চর্বিযুক্ত খাবার যেমন মাংসের চর্বিযুক্ত অংশ, প্রক্রিয়াজাত মাংস, লার্ড এবং মাখন খাদ্য তালিকায় রাখা হয়। আর সেইসাথে অসম্পৃক্ত চর্বিগুলির উৎস, যেমন বাদাম, বীজ, অ্যাভোকাডো, উদ্ভিদ তেল এবং তৈলাক্ত মাছ। তবে ব্যাক্তি বিশেষের স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বেশ কিছু বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে কেটোজেনিক খাদ্য তালিকা পরিবর্তনও হতে পারে।

কেটোজেনিক ডায়েট বিপাকীয় পদ্ধতিগুলোতে বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদী এবং উপকারি পরিবর্তন করে। এই পদ্ধতি ওজন কমানোর পাশাপাশি, অতিরিক্ত ওজন জনিত স্বাস্থ্যের লক্ষন, যেমন ইনসুলিন প্রতিরোধ, উচ্চ রক্তচাপ, এবং উচ্চতর কোলেস্টেরল এবং ট্রাইগ্লিসারাইড ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে আসতে দেখা গেছে। টাইপ-২ ডায়াবেটিসের জন্য কেটোজেনিক ডায়েট সহ কম কার্বোহাইড্রেট ডায়েট ব্যবহারের প্রতিও আগ্রহ বাড়ছে। কেন কেটোজেনিক ডায়েট ওজন কমাতে সাহায্য করে তা নিয়ে বেশ কিছু তত্ত্ব বিদ্যমান, যদিও গবেষণায় সেগুলো ধারাবাহিকভাবে দেখানো হয়নি।

একটি কেটোজেনিক ডায়েট আপনাকে অন্য কিছু ডায়েটের তুলনায় প্রথম ৩ থেকে ৬ মাসে বেশি ওজন কমাতে সাহায্য করতে পারে। কারণ এটি

কার্বোহাইড্রেটকে শক্তিতে পরিবর্তন করার চেয়ে ফ্যাটকে শক্তিতে পরিবর্তন করতে বেশি ক্যালোরি খরচ করে। উচ্চ-চর্বিযুক্ত ও উচ্চ-প্রোটিন খাদ্য খুব সম্ভবত খাবার গ্রহনকারীকে সন্তুষ্ট করে, তাই খাদ্য গ্রহনের পরিমাণ খানিক কমে যায়, যদিও এটি এখনও প্রমাণিত হয়নি।

ইনসুলিন হরমোন শরীরে সুগারকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার বা সংরক্ষণ করতে মূখ্য ভূমিকা পালন করে। কেটোজেনিক ডায়েট রক্তের গ্লুকোজকে দ্রুত পোড়ায়। ফলস্বরূপ শরীর প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে কম ইনসুলিন তৈরি করে। এই ইনসুলিনের কম উৎপাদন বেশ কিছু ধরনের ক্যান্সারের বিরুদ্ধে রক্ষা করতে বা এমনকি ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধিকে ধীর করতে সাহায্য করতে পারে। যদিও এই বিষয়ে আরও গবেষণা প্রয়োজন।

কিটো ডায়েট হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো কারণ এটি খারাপ কলেস্টেরলে কমায় ও ভালো কলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি করে যা হৃৎপিণ্ডের কার্যকারীতার জন্য উপযোগী।

কম কার্ব জাতীয় খাদ্য গ্রহন করার ফলস্বরূপ ত্বকে উজ্জ্বলতাসহ নানান পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, যেমন ব্রণের সংখ্যা হ্রাস পাওয়া। তবুও, ব্রণের উপর ডায়েটের আসলে কতটা প্রভাব, যদি থাকে তবে তা নির্ধারণ করতে আরও গবেষণা প্রয়োজন।

একটি কেটোজেনিক ডায়েট ক্রীড়াবিদদের সাহায্য করতে পারে-দৌড়বিদ এবং সাইক্লিস্ট, উদাহরণস্বরূপ -যখন তারা প্রশিক্ষণ নেয়। সময়ের সাথে সাথে, এটি আপনার পেশী ও চর্বি অনুপাতকে বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং কঠোর পরিশ্রম করার সময় আপনার শরীরের ব্যবহার সক্ষম অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়ায়। যদিও এটি প্রশিক্ষণে সাহায্য করতে পারে, এটি অত্যাধিক কর্মক্ষমতার জন্য অন্যান্য খাদ্যের মত কাজ নাও করতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদী কেটোজেনিক ডায়েটের কিছু নেতিবাচক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ধরা পড়েছে, যার মধ্যে রয়েছে কিডনিতে পাথর এবং অস্টিওপোরোসিসের ঝুঁকি এবং রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বৃদ্ধি (গাউটের ঝুঁকির কারণ)। সম্ভাব্য পুষ্টির ঘাটতি দেখা দিতে পারে যদি কেটোজেনিক ডায়েটে বিভিন্ন ধরণের প্রস্তাবিত খাবার অন্তর্ভুক্ত না করা হয়। শুধুমাত্র উচ্চ চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়ার উপর মনোযোগ দেওয়া উচিত নয় নয়তো, ফাইবার, বি ভিটামিন এবং খনিজগুলির (আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, জিঙ্ক) পুষ্টি উপাদানগুলি থেকে শরীর বঞ্চিত থেকে যাবে।

ডিহাইড্রেশন- কিটোসিস প্রক্রিয়ায় আমাদের শরীরের অতিরিক্ত চর্বি পোড়ানো হয়। ফলে তখন প্রস্রাবে যাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সিও বেড়ে যায়। যেখান থেকে কিন্তু মারাত্মক ডিহাইড্রেশনের সমস্যা হয়। আর চাপ পড়ে কিডনির উপর।

মাথাব্যথা কেটো ফ্লু-এর অন্যতম একটি লক্ষণ। কেটো ডায়েট শুরু করার প্রথম দিন থেকেই মাথাব্যথা, মাথা ধরা এই সব সমস্যা লেগেই থাকে। আর যতদিন এই ডায়েট আপনি করবেন, এই মাথা ধরার মত সমস্যা কিন্তু লেগেই থাকে। ডায়েট আর শারীরিক সমস্যা একসঙ্গে হলে কিন্তু খুবই সমস্যা।

উপরন্তু, রোগীদের হাড় ভাঙার ঝুঁকি বেড়ে যায়। এটি ইনসুলিন-সদৃশ বৃদ্ধির ফ্যাক্টর-১ এর পরিবর্তিত মাত্রা এবং অ্যাসিডোসিসের প্রভাব থেকে উদ্ভূত হয়। অ্যাসিডোসিস হাড়ের ক্ষয় ঘটায়, হাড়কে দুর্বল করে দেয় এবং হাড় ভাঙার ঝুঁকিতে ফেলে।

কেটোজেনিক ডায়েট অনুসরণ করা প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য, সবচেয়ে সাধারণ জটিলতার মধ্যে রয়েছে ওজন হ্রাস, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং কোলেস্টেরল এবং ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা বৃদ্ধি। মহিলারা অ্যামেনোরিয়া বা

মাসিক চক্রের অন্যান্য বাধাও অনুভব করতে পারে।

একটি কেটোজেনিক ডায়েট এমন কিছু লোকের জন্য একটি বিকল্প হতে পারে যাদের অন্যান্য পদ্ধতির সাথে ওজন কমাতে অসুবিধা হয়েছে। স্বাস্থ্য উপকারিতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিনের সঠিক অনুপাত তাদের জেনেটিক বৈশিষ্ট্য এবং শরীরের গঠনের কারণে ব্যক্তিদের মধ্যে পরিবর্তিত হবে। তাই, কেউ যদি কেটোজেনিক ডায়েট শুরু করতে চান, তাহলে নিয়ম শুরু করার পর দেহের কোনো জৈব রাসায়নিক পরিবর্তন ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য একজন চিকিৎসক এবং একজন ডায়েটিশিয়ানের সাথে পরামর্শ করার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং একটি খাবারের পরিকল্পনা তৈরি করা যা একজনের বিদ্যমান স্বাস্থ্যের অবস্থার সাথে উপযোগী এবং প্রতিরোধ করার জন্য। পুষ্টির ঘাটতি বা অন্যান্য স্বাস্থ্য জটিলতা। ওজন কমানোর পর একজন ডায়েটিশিয়ান কার্বোহাইড্রেট পুনরায় গ্রহনের বিষয়েও নির্দেশণা দিতে পারেন।



সন্তান কামনা : কার্তিক ‘ফেলা’, কার্তিক পুজো এবং পিতৃত্ব-মাতৃত্ব

প্রত্যেক পিতা মাতার উচিৎ ক্রোমোজোমের জাদু প্রদীপ তাদেরকে পুত্র বা কন্যা যে সন্তানই দিক—তা সানন্দে গ্রহণ করার মানসিকতা থাকা এবং সন্তান জন্মগ্রহণের পর তাকে লিঙ্গ নিরপেক্ষভাবে গ্রহণ করে ধন্য হওয়া... **প্রণব নাইয়া**

এটা এখন সবাই জানে যে বাবার xy ক্রোমোজোমের কোনটা সন্তান পাচ্ছে তার উপর নির্ভর করে সন্তানের লিঙ্গ পরিচয়। ফলে পিতা মাতার ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে মাতৃগর্ভ তথা পৃথিবীতে পুত্র কন্যা জন্ম গ্রহণ করে।

ছোটো থেকে গ্রামীণ পরিবেশে পুত্র সন্তানের জন্য আকুতি দেখেছি। তিন কন্যার জননী এবং নয় দশ মাসের গর্ভবতী রমণীকে ‘গোপাল দাও, গোপাল দাও’ বলে প্রার্থনা করতে শুনেছি। সাতটি কন্যার পর অষ্টমে পুত্র সন্তান জন্মের পর উল্লসিত হতে দেখেছি। ব্যতিক্রমী ঘটনাও আছে। চতুর্থ সন্তানও

পুত্র হওয়ায় জননীকে কাঁদতে শুনেছি। কিন্তু, যাদের কথা আমি জানি তারা প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত নয়, তাদের সমাজ অশিক্ষিত, অনক্ষর সমাজ। শিক্ষিত সভ্য মননশীল সমাজে সন্তান সম্পর্কিত মোটিফ আমার ভালো জানা নেই। যত দূর জানি অধিকাংশই দুই সন্তানে সীমাবদ্ধ থাকেন। এটা অবশ্য হয়ত স্বাভাবিক—পিতামাতা সন্তান হিসেবে পুত্র এবং কন্যা উভয়ই চান—কিন্তু না পেলে কী আর করা যাবে—তাঁরা মেনে নেন হয়ত...

এই প্রেক্ষিতে শিক্ষিত সভ্য সমাজে যখন কার্তিক ‘ফেলা’ ও পুজো চাপিয়ে দেওয়ার মত কুসংস্কার লালন পালন হয় তখন তাকে আমরা কীভাবে বিচার করব? পুত্র সন্তান কামনায় কার্তিক ‘ফেলা’ হয় বা ‘ফেলা’ কার্তিককে পুজো করা হয়। এই অপসংস্কৃতি আমাদের কী সামনের দিকে অগ্রসর করে নাকি মধ্যযুগে ফিরিয়ে নিয়ে যায়?

পিতা মাতা হিসেবে যখন শুধু ‘পুত্র’ কামনা বা প্রার্থনা (যদিও তাতে কোনো কাজ হয় না) করা হয় তারপর যদি পুত্র জন্মায় তাতে হয়ত কোনো সমস্যা হয় না; কিন্তু কার্তিক পুজো করে বা পুত্র কামনা করে যদি কন্যা সন্তান জন্মায় তাহলে তো সেই কন্যা পিতা মাতার কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত, অবাঞ্ছিত সন্তান হয়ে জন্ম নেয়। সেই সন্তান যখন বড়ো হয়ে যখন জানবে পিতামাতা কার্তিক পুজো করেছিলেন পুত্র সন্তানের আশায় কিন্তু তাদের সেই আশা পূরণ হয়নি তার জন্মের কারণে। এবং যখন সেই কন্যা উপলব্ধি করবে যে সে পিতামাতার অনাকাঙ্ক্ষিত, অবাঞ্ছিত সন্তান তখন সেই গ্লানি সেই সন্তান কোথায় রাখবে? একই ভাবে কন্যা সন্তান কামনা করে যে দম্পতি পুত্র সন্তান পায় সে পুত্র সন্তান অনাকাঙ্ক্ষিত, অবাঞ্ছিত হিসেবেই জন্মায় — অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তানের গ্লানি সেই পুত্র

সন্তানের ভবিতব্য!

যারা শিক্ষিত মননশীল মানুষ তারা সন্তানের লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে যদি এত রক্ষণশীল ধারণা পোষণ করেন এবং সন্তানের ভবিষ্যত উপলব্ধিতে গ্লানির বোঝা চাপিয়ে দিতে থাকেন তাহলে শিক্ষাহীন পশ্চাদপদ সমাজ কী করবে?

প্রত্যেক পিতা-মাতার উচিৎ ক্রোমোজোমের জাদু প্রদীপ তাদেরকে পুত্র বা কন্যা যে সন্তানই দিক—তা সানন্দে গ্রহণ করার মানসিকতা থাকা এবং সন্তান জন্মগ্রহণের পর তাকে লিঙ্গ নিরপেক্ষভাবে গ্রহণ করে ধন্য হওয়া — যে আচরণ পিতামাতাকে ভবিষ্যতে সন্তানের কাছে শ্রদ্ধার আসন করে দেবে।

কুসংস্কারের অনুশীলন বন্ধ হোক। সবাই আদর্শ পিতা মাতা হয়ে উঠুন - সন্তানকে লিঙ্গ বৈষম্যের বিপক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে, সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে শেখান। তাহলে আর কোন অলৌকিক শক্তির মিরাকলের প্রত্যাশায় অকারণে অপেক্ষার বৃথা সময় আর অর্থ নষ্ট করতে হবে না।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখা উচিত — কারও ধ্যান-ধারণাকে নিজের সন্তানের উপর চাপিয়ে দেওয়ার কোন অধিকার যে কারও নেই সেটা লেবাননের বিখ্যাত কবি কাহলিল জিবরান তাঁর ‘On children’ কবিতায় উল্লেখ করেছেন,

‘তোমার সন্তানেরা তোমার সন্তান নয়।
জীবনের নিজের প্রতি নিজের যে তৃষ্ণা, তারা হল
তারই পুত্র কন্যা।
তারা তোমাদের মাধ্যমে আসে, তোমাদের থেকে নয়।
এবং যদিও তারা থাকে তোমাদের সঙ্গে, কিন্তু তাদের
মালিক তোমরা নও।
তুমি তাদের দিতে পারো তোমার ভালোবাসা।
কিন্তু দিতে পারো না তোমার চিন্তা, কারণ তাদের
নিজেদের চিন্তা আছে।

তুমি তাদের শরীরকে বাসগৃহ জোগাতে পারো, কিন্তু তাদের আত্মাকে নয়।
কারণ তাদের আত্মা বাস করে ভবিষ্যতের ঘরে।
যেখানে তুমি যেতে পারো না, এমনকি তোমার স্বপ্নের মধ্যেও নয়।

তুমি তাদের মত হওয়ার সাধনা করতে পারো, কিন্তু তাদের তোমার মত বানানোর চেষ্টা করো না।
কারণ জীবন পিছনের দিকে যায় না, গতকালের জন্যে বসেও থাকে না।
তোমরা হচ্ছ ধনুক, আর তোমাদের সন্তানেরা হচ্ছে ছুটে যাওয়া তির।
ধনুর্বিদ অনন্তের পথে চিহ্নের দিকে তাকিয়ে থাকেন।
যেন তার তির ছোটে দ্রুত আর দূরে।

তুমি ধনুক, তুমি বাঁকো, ধনুর্বিদের হাতে তোমার বেঁকে যাওয়া যেন আনন্দের জন্য হয়।
তিনি কেবল চলে যাওয়া তিরটিকে ভালোবাসেন তা-ই নয়,
তিনি তো দৃঢ় ধনুকটিকেও ভালোবাসেন।’

যযাতির মত সন্তানের কাছে থেকে যৌবন চুরি পিতামাতার আদর্শ হতে পারে না। বাবরের আত্মত্যাগই পিতামাতার আদর্শ হওয়া উচিত। বাবরের মত তাঁরাও যেন নির্দ্বিধায় বলতে পারেন –

‘এই তো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিম
আজ বসন্তের শূন্য হাত —
ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।’ (‘বাবরের প্রার্থনা’, শঙ্খ ঘোষ)



সাপ নিয়ে কিছু কথা

নাগ পঞ্চমীতে সাপ বের করে সামনে দুধের বাটি ধরা হয় তৃষ্ণার্ত সাপ তৃষ্ণা মেটাতে সেই দুধ পান করে নেয়! সে সময় দুধের বদলে কোকোকলা রাখলেও সাপ তৃষ্ণার জন্য খেতে বাধ্য হবে...**অদিতি গাইন**

প্রথমত, বলে রাখি, সাপ সরীসৃপ শ্রেণিভুক্ত শীতল রক্তের মাংসাশী প্রাণী। তার খাদ্য হল পোকামাকড়, টিকটিকি, ব্যাঙ, পাখি, ছোটো ও মাঝারি আকারের

স্তন্যপায়ী, এবং অন্যান্য সাপ। আর যেহেতু এরা স্তন্যপায়ী নয় জন্ম থেকেই মায়ের দুধ খেয়ে এরা বড়ো হয় না তাই এদের জন্মের পর থেকেই শিকার করে বেঁচে থাকতে হয়। তাছাড়া সাপ ল্যাকটোজ ইনটলারেন্ট। ল্যাকটোজ কি? সাধারণভাবে বললে এই উৎসেচক শরীরে না থাকলে দুগ্ধজাতীয় খাবার হজম হয় না। সাপের পক্ষে দুধ হজম করা অসম্ভব। দুধ সাপের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। দুধ খেলে সাপের শরীরে নানা সমস্যা থেকে শুরু করে সাপের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

বিশেষ করে গ্রামের দিকে অনেকে দাবি করেন নাকি নিজে চোখে দেখেছেন, সাপ গোরুর পা পেঁচিয়ে গোরুর ওলান এ মুখ লাগিয়ে দুধ চুষে খাচ্ছে।

গোরুর ওলান থেকে দুধ টেনে চুষে খেতে হলে একটি শক্ত জিভ থাকা দরকার। সাপের জিভ দুর্বল ও দু-ভাগে বিভক্ত যার ফলে সাপের দুধ খাওয়া অসম্ভব।

আচ্ছা তাহলে গোরুর পা পেঁচিয়ে ধরে কেন?

অনেক সময় সাপ ইঁদুরের খোঁজে গোয়াল ঘরে ঢুকে পরে তা দেখে গোরু ভয় পেয়ে লাফালাফি করে এবং সেই দেখে সাপও ভয় পেয়ে পা জড়িয়ে ধরতে পারে।এই ঘটনা খুবই কম চোখে পরে! বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাপ ভয়ে পালিয়ে যায়।

তাহলে গোরুর ওলান ফুলে থাকে কেন? বা শক্ত হয়ে কী করে? আমরা তো ভাবি সাপ দুধ খেয়েছে তাই ওরকম হয়।

আপনার ভাবার স্বাধীনতা আছে আপনি যা খুশি ভেবে নিতে পারেন তাতে সত্য পরিবর্তন হয় না। ওটা গোরুর একটা রোগ যার নাম ম্যাস্টাইটিস বা ওলান ফোলা স্থানীয় ভাবে ওলান পাকা রোগ বলে। কেন এই রোগ হয়? আমি পশু চিকিৎসক নই আমার কাছে এ প্রশ্নের উত্তর জানতে চাওয়া আপনার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। তবে সাধারণ

বিজ্ঞানের ছাত্রী হিসেবে বলতে পারি বিভিন্ন প্রকারের ব্যাকটেরিয়া, ফাংগাস, মাইকোপ্লাজমা ও ভাইরাস এর জন্য হয়।

আচ্ছা, নিজের চোখে নাগপঞ্চমীতে দেখলাম যে সাপ বাটি থেকে দুধ পান করছে, তাহলে সেটি কী?

প্রথমেই বলেছি সাপ দুধ খায় না। সাপুরেরা নাগ পঞ্চমীর একসপ্তাহ বা তার বেশি সময় ধরে সাপকে জল খেতে দেন না ফলে সাপ তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ে। নাগ পঞ্চমীতে সাপ বের করে সামনে দুধের বাটি ধরা হয় তৃষ্ণার্ত সাপ তৃষ্ণা মেটাতে সেই দুধ পান করে নেয়! সে সময় দুধের বদলে কোকোকলা রাখলেও সাপ তৃষ্ণার জন্য খেতে বাধ্য হবে।

তাহলে সাপুড়েরা এই কাজ করে কেন?

সাপ ইঁদুর বা ডিম খায় বললে সাপুড়েকে কেউ



দক্ষিনা দেবে না। ধর্মীয় বিশ্বাসকে হাতিয়ার করেই এই অমানবিক ধান্দাবাজি বহুকাল থেকে চলে আসছে।

তাহলে কী সাপ জল পান করে না?

হ্যাঁ, সাপ বেঁচে থাকার জন্য জল পান করে। এখুনি যে বললেন সাপ চুষে কিছু খেতে পারে না! হ্যাঁ, সাপ গোরুর ওলান থেকে দুধ চুষে খেতে পারে না। জলও চুষে পান করতে পারে না। জল চিবিয়ে পান করে।

আর কলা? কলাও খায় না! কলা খেলে গাছে একটাও কলা থাকত না সব সাপেরা খেয়ে নিত। সাপেরা ফল খায়

না ওরা মাংসাশী!

এইবার আপনি বলুন অবলা প্রাণীদের উপর অত্যাচার আর কতদিন করবেন? সাপ মাটির হলে পুজো করেন আর জ্যান্ত হলে পুড়িয়ে মারেন কেন?

তাই বলছি, এই কুসংস্কারগুলো মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন। চোখের সামনে সাপুড়েদের এইসব অমানবিক কাজ দেখলে তাতে বাধা দিন। বনদফতর বা লোকাল থানায় খবর দিন।

"নাস্তিক হওয়া সহজ নয়। এ এক অনন্য শক্তিধর অভিব্যক্তি। কেননা বিশেষ জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও মনোবল না থাকলে নাস্তিক হওয়া যায় না। আশৈশব লালিত বিশ্বাস, সংস্কার, আচার-আচরণ, রীতিনীতি পরিহার করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়, কেবল অসামান্য নৈতিক শক্তিধর যুক্তিবাদী মানুষের পক্ষেই তা সহজ।"

— আহমদ শরীফ



জৈন ধম্মের ইতিবৃত্ত

জৈন মতে বিশ্ব অনাদি অনন্ত, কোনও ঈশ্বর বা অবতার নেই। ফলে কর্মফলকে কেউই বদলাতে পারে না, কাজেই কর্মফল বলেও কিছু নেই।...**সৌরাষ্ট্র দাশ**

ভূমিকা

জৈনরা জৈন ধম্ম পালন করে। আমি আপনাদের সুবিধার জন্য (ধম্ম) শব্দের বদলে ধর্ম শব্দ ব্যবহার করবো। জৈন ধম্মের সময় এই আজকের ধর্ম শব্দটাই ছিল না।

এই ধর্ম অত্যন্ত প্রাচীন, খ্রিস্টপূর্ব নবম শতক বা তারও আগে এই ধর্মের প্রচার শুরু হলেও খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে এর প্রকৃত প্রসার শুরু হয় মহাবীর জৈনের (৫৯৯-৫২৭

খৃ.পূ.) হাত ধরে। জৈন শব্দটা এসেছে সংস্কৃত জীন শব্দ থেকে, যার অর্থ ইন্দ্রিয়কে বিজয় করা। তবে অধিকাংশ জৈন গ্রন্থ বা শাস্ত্রগুলি আদি মাগধী ভাষায় তবে বুঝতেই পারছেন কী ভাবে সংস্কৃত ঢুকলো এদের মধ্যে তা আর নতুন করে বলতে হবে না। আমার লেখা যারা পড়ছেন তারা হয় তো এই বিষয় অবগত থাকবেন।

জৈন ধর্মের মূল রীতিনীতি, ধর্মীয় আচার, চিন্তাধারা – ইত্যাদির সাথে হিন্দু ধর্মের বিশেষ পার্থক্য নেই, কেবল পার্থক্য হল জৈনরা দেবদেবীর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না এবং বেদ মানেন না। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে জাতপাত, বলিপ্রথা ইত্যাদি বৈদিক আর্য রীতিনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ জৈন ধর্মের উৎপত্তি হয়। মগধে এই ধর্মের প্রসার হয়েছিল সবচেয়ে বেশী। তবে বাংলা-বিহার-নেপাল ইত্যাদি অঞ্চলে জৈন ধর্মের প্রচার সবচেয়ে বেশী করে হয়েছিল। তবে জৈন ধর্ম কোনওদিনই বৌদ্ধ ধর্মের মত বিশ্বজনীন ধর্ম হয়ে উঠতে পারেনি, কেবলমাত্র ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। বর্তমানে জৈন ধর্ম কেবল রাজস্থান, গুজরাত, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে, পশ্চিমবঙ্গেও এদের সংখ্যা নেহাত কম না। এই কারণে হিন্দু ও শিখ ধর্মের মতই জৈন ধর্মকে ভারতীয় ধর্ম বলাই যুক্তিসঙ্গত।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকেই জৈন ধর্ম ধীরে ধীরে পূর্ব ভারতে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আবেদন হারাতে শুরু করে। জৈন ধর্মগুরুরা জনসমর্থন জোগাড় করতে পশ্চিম ভারতের দিকে যেতে শুরু করে। তারা শুরুতে মথুরা ও উজ্জয়িনিতে, তারপর দক্ষিণ ভারতে চলে আসে। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে দাক্ষিণাত্য মালভূমিতে জৈন ধর্ম বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে – বিশেষ করে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও অন্ধ্র প্রদেশে। সাতবাহন সম্রাটরা জৈন ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পরে চালুক্য ও রাষ্ট্রকূট সম্রাটরাও জৈনদের পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করে। এই

কারণে দাক্ষিণাত্যের উপরোক্ত অঞ্চলে জৈন ধর্ম বেশ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল সেখানকার মানুষের মধ্যে। অনুরূপ ভাবে গুজরাত ও রাজস্থান অঞ্চলে চালুক্যদের কারণে সেখানেও জৈন ধর্মের ভিত্তি মজবুত ছিল। যা দিন-কে-দিন বাড়ছে।

ভৌগলিক দিক থেকে বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকায় স্বাভাবিক ভাবেই জৈন ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মের তুলনায় অনেক বেশী বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক চর্চার সুযোগ পেয়েছিল। রাষ্ট্রকূট থেকে চোল যুগ পর্যন্ত জৈন ধর্ম ছিল দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে সবচেয়ে উন্নত ধর্ম। জৈনদের জনপ্রিয়তা যত বাড় ছিল, হিন্দু ধর্মগুরুরা ততই অনুভব করছিল হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান দরকার। এই মনোভাব থেকেই অষ্টম শতকের শেষদিকে দক্ষিণ ভারতে ভক্তি আন্দোলন শুর হয়, যা সাত শতাব্দী ধরে ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং মোটামুটি তখন থেকেই ভারতে জৈন ধর্মের প্রভাব কমতে শুরু করে। ত্রয়োদশ শতকের পর থেকে পশ্চিম ভারত হয়ে দাক্ষিণাত্যে যত বেশী করে মুসলিমদের অনুপ্রবেশের ঘটনা বাড়তে থাকে, উপদ্রুত অঞ্চলে জৈনদের প্রভাব ততই কমতে থাকে। খিলজি আমলে জৈনদের ওপর অত্যাচার বাড়তে থাকে, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে কয়েক শত মন্দির ভেঙ্গে দেওয়া হয়। এরপর থেকে জৈনরা আর কখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি।

অবস্থান ও স্বদেশ

এই মুহুর্তে ভারতে ঠিক কত সংখ্যক জৈন আছে, তা নিরূপণ করা প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে। ২০০১ সালে ভারতের জনগণনা অনুসারে জৈনদের মোট জনসংখ্যা ৪২ লক্ষের কিছু বেশী। যদিও এই সংখ্যা সঠিক কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অবশ্য এটা সত্যি যে, জৈনদের মধ্যে জন্মহার অন্যান্য জাতির তুলনায় কম। ২০০৮

সালে একটি বেসরকারি জনগণনা অনুসারে জৈনদের জনসংখ্যা ৬৫ লাখের কিছু বেশী। বেশ কিছু জৈন ধর্মীয় ওয়েবসাইটে দাবি করা হয়েছে জৈনদের সংখ্যা এক কোটির কিছু বেশী, যা যথেষ্টই সন্দেহজনক দাবি। বাস্তবে ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে জৈনদের জনসংখ্যা বলা হয়েছে ৪৯ লক্ষের বেশী, যা বাস্তবোচিত বলেই মনে হয়। গুজরাত ও রাজস্থানে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক জৈন বসবাস করেন। এছাড়া মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর, কর্ণাটকের মহীশুর জেলা ইত্যাদি জায়গায় জৈনদের সংখ্যা বেশ ভালই আছে। এছাড়া মুম্বাই, চেন্নাই, কলকাতা ও দিল্লিতেও জৈনদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। মজার কথা এই যে, যে পূর্ব ভারতে জৈন ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল; সেই পূর্ব ভারতে জৈনদের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে – কলকাতা আর পাটনা ছাড়া কোথাও এদের বসতি নেই।

উনবিংশ শতকের শেষদিকে অসংখ্য জৈন পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকা মহাদেশে পাড়ি দিয়েছিল উন্নত জীবনযাপনের আশায়। এছাড়া আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ক্যানাডায় চলে যাওয়া জৈনদের সংখ্যা নেহাত কম ছিল না।

ভাষা

জৈনদের মধ্যে কোনও ধর্মীয় ভাষা নেই, যেমনটা হিন্দুদের (সংস্কৃত), শিখদের (পাঞ্জাবী) বা বৌদ্ধদের (পালি) আছে। তারা যেখানে থাকে, সেখানকার ভাষাতেই ধর্মীয় আচার পালন করে থাকে। জৈনদের মুখ্য ভাষা হল – কন্নড়, রাজস্থানি, গুজরাতি ও মারাঠি। তাহলে নিশ্চয়ই বলবেন আদি মাগধী ভাষার কী হবে? কিছুই না তারা সময়ের সাথে ভাষা পরিবর্তন করেছে। ভাষা নিয়ে পবিত্র অপবিত্র বলে কিছুই নেই। যদিও শুরুটা মাগধী ভাষা থেকেই...

লোককথা

আগেই বলেছি যে, জৈনরা দেবদেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। জৈন ধর্মে তাই প্রতিমা পূজার ব্যবস্থা শুরুর দিকে ছিল না। তারা ২৪ জন তীর্থঙ্কর (আদি জৈন ধর্মপ্রচারক) এর পূজা করেন, সেটাই এদের প্রতিমা পূজার সমতুল্য। জৈন মতে বিশ্ব অনাদি অনন্ত, কোনও ঈশ্বর বা অবতার নেই। ফলে কর্মফলকে কেউই বদলাতে পারে না, কাজেই কর্মফল বলেও কিছু নেই। জৈনরা মনে করে নিজেই নিজেকে সব পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তীর্থঙ্কররা সে পাপ থেকে মুক্ত। অতএব প্রত্যেক জৈনকে অবশ্যই তীর্থঙ্করের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পাপমুক্ত হতে হবে।

যেহেতু ঈশ্বরের অস্তিত্বে জৈনরা বিশ্বাস করেন না, তাই তীর্থঙ্করদের প্রতিমা বানিয়ে তার উপাসনা করেন জৈনরা। তাদের সাহিত্যে তীর্থঙ্করদের কর্ম ও জীবনের বর্ণনা আছে। যদিও মাত্র দুজন তীর্থঙ্করের অস্তিত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিক সত্যতার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবে বিংশ শতক থেকে জৈনরা অন্তত দুই হিন্দু ঈশ্বরকে আপন করে নিয়েছেন এবং তার পূজাও করেন – লক্ষ্মী ও গণেশ। এই দুই দেবদেবীকে উপাসনা করার পেছনে ঐতিহাসিক কারণ আছে–জৈনরা মুখ্যত বাণিজ্যজীবী সম্প্রদায় এবং উপরোক্ত দুই দেবদেবী বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। জৈন ধর্ম সম্বন্ধিত বিষয়ে সবচেয়ে ভাল জানার উপায় হল আজমীঢ় (Ājmiṟ) শহরে অবস্থিত লাল মন্দিরে যাওয়া। দোতলা এই মন্দির অত্যন্ত প্রাচীন। এখানে প্রথমতম আদি তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের (R̄iśabhaḍev) জন্ম থেকে মৃত্যুর সব কাহিনি ব্যাস রিলিফের আকারে বিবৃত করা হয়েছে। এছাড়া অযোধ্যাতেও বিখ্যাত বটবৃক্ষে, যেখানে ঋষভদেব ‘বোধি লাভ’ করেছিল বলা হয়; সেখানেও একটা ছোটো মন্দির আছে। এই দুই মন্দির জৈনদের লোককথা থেকে

শিক্ষা লাভ করা যায়।

ধন্ম (ধর্ম)

জৈন ধর্ম খ্রিস্টপূর্ব নবম শতকে উদ্ভূত হলেও প্রক্রিতপক্ষে এই ধর্মের সূচনা ঘটে মহাবীর বর্ধমানের (Mahāvīr Varḍhamān) হাতেই, যিনি আনুমানিক ৫৯৯ খ্রিস্টপূর্ব নাগাদ আজকের বিহারের কাছে বৈশালীতে একটি ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মেছিলেন। যদিও কিছু জৈন গ্রন্থে বলা হয়েছে তার জন্ম হয়েছিল ৫৪৯ খ্রিস্টপূর্ব নাগাদ। তবে সব জায়গাতেই বলা হয়েছে তার মৃত্যু হয় ৭২ বছর বয়সে, অর্থাৎ ৫২৭ কিংবা ৪৭৭ খ্রিস্টপূর্ব নাগাদ। জৈনদের মতে মহাবীর ছিলেন তাদের চব্বিশতম এবং অন্তিম তীর্থঙ্কর। অবশ্য মহাবীর জৈনের আগের তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ বা পরেশনাথের ঐতিহাসিক অস্তিত্বের প্রমাণ সমসাময়িক রচনায় পাওয়া যায়। পরেশনাথ সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের লোক ছিলেন। বেশ কিছু জৈন পণ্ডিত দাবি করেন যে হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো সভ্যতার আমলেও জৈন ধর্মের অস্তিত্ব ছিল, তাদের দাবি সত্যি বলে মেনে নিলে ধরে নিতে হবে জৈন ধর্মের বয়স ৫০০০ বছরেরও বেশী প্রাচীন। এখানে বলে রাখা ভাল স্বস্তিকা হিন্দুদের পাশাপাশি জৈনদেরও ধর্মীয় প্রতীক, যা সত্যিই অবাক করার বিষয়...

জৈনদের কিংবদন্তী অনুসারে তাদের উপাস্য মহাবীর বিবাহ করার তিন বছর বাদে কন্যা ও স্ত্রীকে ত্যাগ করে মাত্র ৩০ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করেন। তিনি ১২ বছর ধরে কঠোর তপশ্চর্যার বাদে বোধিলাভ করেন এবং দেশ জুড়ে ঘুরে বেড়িয়ে সবাইকে জৈন ধর্মে দীক্ষা দিতে শুরু করেন। তীর্থঙ্কর মহাবীর নিজে এবং তার শিষ্য-শিষ্যারা প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ নগ্ন হতেন, আহার করতেন অত্যল্প, নিদ্রা দিতেন খুব অল্প সময়ের জন্য। এক কথায় মহাবীর ও তার অনুগামীরা লজ্জা, ভয়

ও ঘৃণা ত্যাগ করেছিলেন। মহাবীর ছিলেন গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক, দুজনে প্রায় এক জায়গা থেকেই ধর্ম প্রচার শুরু করেছিলেন। কিন্তু দুই যুগান্তকারী পুরুষের মধ্যে কখনও সাক্ষাত হয়েছিল কিনা, সে বিষয়ে ইতিহাস নীরব থেকেছে। তবে ত্রিপিটক দুইজনের সাক্ষাৎকার হয়েছিল এই বিষয় কিছুটা তথ্য পাওয়া যায়। মহাবীর মোক্ষ লাভ করার পর স্বেচ্ছামৃত্যুর সিদ্ধান্ত নেন। ৭২ বছর বয়সে সান্তারা প্রথায় আত্মহত্যা করেন।

তার মৃত্যুর প্রায় ২০০ বছর বাদে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক নাগাদ জৈনদের মধ্যে বস্ত্র পরিধান নিয়ে তর্ক বাঁধে এবং জৈনরা দুই মতাবলম্বীতে বিভক্ত হয়ে যায় — দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর। বর্তমানে জৈনদের মধ্যে ৯৯% শ্বেতাম্বর অর্থাৎ সাদা রঙের কাপড় পরিধান করেন। দুই ধর্মে বিভক্ত হওয়ার সময়েই উত্তর ভারতে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ শুরু হওয়ায় জৈনরা দক্ষিণ ভারতে চলে আসে এবং মহীশুর অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। এই সময়ে জৈনদের তীর্থ হয়ে ওঠে শ্রাবণবেলগোলা, যেখানে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য প্রাণত্যাগ করেন সান্তারা প্রথায়। শ্বেতাম্বররা সারা ভারতে পাওয়া গেলেও দিগম্বররা শ্রাবণবেলগোলার বাইরে কোথাও পাওয়া যায় না। দিগম্বর সম্প্রদায়ে মেয়েরা জৈন মন্দির বা মঠে প্রবেশ করতে পারেন না। এমনকি তাদের নগ্ন হওয়াও নিষেধ, তাদের পক্ষে সন্ন্যাসী হওয়াও সম্ভব নয়।

জৈন 'ধর্মপ্রতিষ্ঠাতা' মহাবীর জৈন ধর্মের প্রবর্তক তীর্থঙ্কর মহাবীর জৈনের প্রদত্ত শিক্ষাগুলি নিম্নরূপ —

১. পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে সমজ্ঞানে ভালোবাসতে হবে। ধর্ম-বর্ণ-অর্থে কোনো বিভাজন থাকবে না।

২. পৃথিবীর সব ধর্মের মূল কথা হল এক - নিজেকে জানো অর্থাৎ নিজেকে উপলব্ধি করো।

৩. সবধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রকাশ করবে। মনে রাখবে পৃথিবীর সব ধর্মই সমান। ধর্মের মধ্যে যে বিভাজন, তার

আমাদের সৃষ্টি।

৪. কোনো মানুষকে কখনো ছোটো করবে না। কোনো মানুষের প্রতি কটূবাক্য প্রয়োগ করবে না। সব মানুষকে নিজের ভাই বা বোনের মত দেখবে।

৫. সবসময় সৎ চিন্তা করবে, সৎ বন্ধুর সান্নিধ্যে আসার চেষ্টা করবে, সৎ ভাবনায় মনকে প্রফুল্ল রাখবে। তাহলে দেখবে তোমার মধ্যে এক আশ্চর্য শক্তির উত্তরণ ঘটে গেছে।

৬. নিজেকে বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ বলে মনে করবে। নিজেকে কখনো ছোটো বলে ভাববে না। নিজেকে ছোটো ভাবলে তুমি কখনো আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে উঠতে পারবে না।

৭. উচ্চাশা রাখবে, উচ্চাশা না থাকলে মানুষ জীবনে বড়ো হতে পারে না।

৮. ইচ্ছা করলে তুমি অসাধ্যকে সাধন করতে পারো। ইচ্ছা করলে তুমি এমন কাজ করতে পারো যা আর কেউ কখনো করেনি।

৯. অযথা ভোগসুখের মধ্যে জীবন কাটাবে না। মনে রাখবে এই যে বাহ্যিক ভোগ, এর অন্তরালে কিছুই নেই।

১০. স্থল-জল-অন্তরীক্ষ কখনো কোথাও হিংসার অনুপ্রবেশ ঘটতে দেবে না। হিংসার বিন্দুমাত্র ছায়া দেখলে তার দূর করার আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

এখানে বলে রাখা দরকার জৈন ধর্ম কিন্তু হিন্দু বা অন্যান্য ধর্মের মত আস্তিক্য নয় — বরং নাস্তিক্য মতবাদ বলাই যুক্তিসঙ্গত হবে। অতীতে জৈন মন্দিরে কোনও বিগ্রহ থাকত না। বিংশ শতকের শুরুতে তারা মন্দিরে ২৪ তীর্থঙ্করদের পূর্ণাঙ্গ প্রতিমা রাখে, তবে হিন্দুদের মত নৈবেদ্য রেখে পূজা করা হয় না। দিগম্বর মন্দিরে ২৪ জন তীর্থঙ্করের প্রতিমাকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে রাখা হলেও শ্বেতাম্বর মন্দিরে কোমরে একটুকরো কাপড় রাখা হয়। বর্তমানে জৈনরা হিন্দুদের প্রতিমা পূজার অনেক বৈশিষ্ট্য,

যেমন আরতি, অঞ্জলি, নিবেদন ইত্যাদি রপ্ত করে নিয়েছে। তবে জৈনদের মধ্যে কোনও নির্দিষ্ট পুরোহিত শ্রেণি নেই, যে কেউ স্বেচ্ছায় পূজার দায়িত্ব নিতে পারে।

জৈনদের তৃতীয় শাখা স্থনকবাসীদের মন্দিরে কোনও প্রতিমা থাকে না, যেমনটা অতীতে জৈনদের মন্দিরে থাকত না।

ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব

জৈনরা যেহেতু নাস্তিক্যবাদের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তাই তাদের কোনও ধর্মীয় উৎসব ছিল না। এই কারণে তারা হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসবকে আপন করে নিয়েছে। অবশ্য তীর্থঙ্করদের জন্ম ও মৃত্যু দিবসকে তারা ধর্মীয় উৎসবের দিন হিসাবে পালন করে। তবে আমি এখানে যে নাস্তিক্যবাদ নিয়ে বলছি তা ভারতীয় দর্শনের উপর এই বিষয় ও আমি লিখেছি। আপনারা এই বিষয় আরও জানতে হলে! রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায় চার্বাক দর্শন উপর লেখা অধ্যায় করতেন পারেন।

আগস্ট মাসের মাঝামঝি সময়ে একটি জৈন উৎসব পালিত হয়, নাম তার 'পাজ্জুসানা'। এই উৎসব উপলক্ষ্যে জৈনরা সামর্থ্য থাকলে ৮ থেকে ১০ দিন ধরে উপবাস রাখে। অষ্টম বা দশম দিনে অর্থাৎ পাজ্জুসানার শেষ দিনে জৈনরা বিগত এক বছর ধরে যা যা পাপ, অন্যায় করেছে, তার জন্য ২৪ তীর্থঙ্করদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়। তারা এরপর জৈন প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধবদের কাছেও ক্ষমা চেয়ে নেয়। তারপর জৈনরা দরিদ্রনারায়ণ সেবার মাধ্যমে পাপমোচনের অনুষ্ঠান পালন করে। এবং এখানে অনেকে মনে প্রশ্ন নাস্তিক ধর্ম হলে পাপ পুণ্য বলে কী কিছু আছে? উত্তর খুব পরিষ্কার তাদের কাছে এই জগত স্বর্গ নরক আর পাপ বলতে অপরাধ আর পুণ্য বলতে উপকার যা এই জগতেই এর বিচার করতে হবে। এই জগতের বাইরে

আর কোনো জগতের অস্তিত্ব নেই। তারা দশম দিনের বিকেলবেলায় রথ বের করে তার মধ্যে তীর্থঙ্করদের প্রতিমা রেখে নগর পরিক্রমায় বেরন। বর্তমানে শ্রাবণবেলগোলা ও গুজরাতের মেহসানা শহরের বাইরে কোথাও এই ধরণের রথ পরিক্রমা দেখা যায় না।

মহাবীর জয়ন্তী জৈনদের কাছে সবচেয়ে বড়ো ধর্মীয় উৎসব, যা সাধারণত অক্টোবরের শেষ বা নভেম্বরের শুরুতে হয়ে থাকে। হিন্দু দীপাবলির কয়েকদিন বাদে মহাবীর জয়ন্তী আসে, এই দিনেই মহাবীরের জন্ম ও মৃত্যু হয়েছিল বলে জৈনরা মনে করে। এই রকমই আরেক জৈন উৎসব হল জ্ঞান পঞ্চমী, এই দিনে জৈন ধর্মগ্রন্থগুলোকে পরিষ্কার করে, ধুলোবালি মুছে নিয়ে তা পাঠ করা হয়।

জৈনদের কাছে পবিত্র তীর্থ হল –

বিহার – বৈশালী (মহাবীরের জন্মস্থান), পরেশনাথ পর্বত

রাজস্থান – মাউন্ট আবু

গুজরাত – গিরনার ও শত্রুঞ্জয় পাহাড়

কর্ণাটক – শ্রাবণবেলগোলা

শত্রুঞ্জয় পাহাড়ের ওপর নির্মিত জৈন মন্দির ভারতের সবচেয়ে রহস্যময়, বিপজ্জনক তীর্থস্থানের মধ্যে একটা। এই মন্দিরে উঠতে গেলে সব মিলিয়ে ১০০০ সিঁড়ি ভাংতে হয়। কথিত আছে কেউ যদি এক টানা ৯৯ বার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে ও নামতে পারে, তার নাকি সব পাপ মুছে যায়। যা সত্যিই সময়ের সাথে এক প্রকার কুসংস্কার তৈরি হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য শুধু জৈন নন, বহু হিন্দুও এই মন্দিরে ওঠেন। প্রতি পনেরো বৎসর অন্তর জৈনরা যেভাবেই হোক শ্রাবণবেলগোলা যাবেনই, যা তাদের কাছে সবচেয়ে বড়ো তীর্থস্থান হিসাবে গণ্য। এখানেই জৈন সন্ন্যাসী গোমতেশ্বরের ১৭ মিটার (৫৭ ফুট) দীর্ঘ মূর্তি আছে। এই মূর্তির মাথায় জল ঢাললে পুণ্য হয় বলে প্রবাদ আছে।

জীবনযাত্রা সংস্কার

আগেই বলেছি যে, জৈনরা যেখান থাকেন, সেখানকার রীতিনীতি মেনে চলেন; তাদের কোনও নিজস্ব ধর্মীয় বা সামাজিক রীতি নেই। উদাহরণ স্বরূপ অন্তিম সংকারের কথাই ধরা যাক। তারা বিভিন্ন রাজ্যে সেখানকার রীতিনীতি মেনে দাহ করে থাকে। আবার উচ্চবর্ণের জৈনরা নিম্নবর্ণের জৈনদের থেকে নিজেদের আলাদা করে চেনানোর জন্য পৈতে ধারণ করে থাকে। উপনয়ন, বিবাহ, অন্নপ্রাশন, অন্তিম সংকার – সবকিছুই জৈনরা বিভিন্ন প্রদেশের রীতিনীতি মেনে করে থাকে। কিন্ত এইসব সময়ের সাথে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি তাদের মধ্যেও এসেছে যা অবাক হবার কিছুই নেই। জৈন ধর্মে আদেও উঁচু নীচু বলে কিছুই নেই! কিন্ত সময়ের সাথে হিন্দুদের এই আচার তারা নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করেছে। অনেক ব্রাহ্মণ তারা নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে জৈন হলেও পূর্বের ধর্মের আচার আচরণ সব কিছু ছাড়তে পারেনি।

আন্তঃব্যক্তিগত সম্পর্ক

জৈনরা সম্প্রদায়গত ভাবে হিন্দুদের চেয়ে বেশী ঐক্যবদ্ধ। তারা জৈন প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধবদের সাথে যোগাযোগ রাখে বেশী, বছরে বেশ কয়েকবার ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবের সময়ে স্বজাতিদের সাথে দেখা করে ক্ষমা চেয়ে নেয়। এছাড়া বাণিজ্যিক কারণে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করে।

জীবনযাত্রার মান

জৈনরা সাধারণত গ্রামাঞ্চলে বসবাস করেন না, সেই খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকেই। এর পেছনে যে কারণটা প্রধান সেটা হল – ব্যবসার সুবিধা গ্রামাঞ্চলে বিশেষ নেই। যেহেতু প্রায় সব জৈন ধর্মাবলম্বীই ব্যবসায়ী হন, সেই কারণে তারা শহরে ব্যবসা করা সুবিধাজনক মনে করে

এবং সেখানেই সপরিবারে থাকেন। সারা বিশ্ব জুড়ে যত জৈন আছেন, তার প্রায় ৯৯% জৈন নগরাঞ্চলে বসবাস করেন। গুজরাত, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, তামিল নাড়ু, দিল্লি ও পশ্চিমবঙ্গে এদের সর্বাধিক পরিমাণে দেখা যায়। এছাড়া ডারবান (সাউথ আফ্রিকা), নাইরোবি (কেনিয়া), নিউ ইয়র্ক (আমেরিকা), লন্ডন (ব্রিটেন) ও টরোন্টো শহরে এদের অস্তিত্ব আছে।

পারিবারিক জীবন

অতীতে না থাকলেও বর্তমানে জৈনদের মধ্যেও হিন্দুদের ন্যায় জাতপাতের বিষ প্রবেশ করেছে এবং এক বর্ণের লোক অন্য বর্ণের লোককে বিবাহ করেন না। জৈন বর্ণের মধ্যে অগ্রবাল, ওসবাল, শ্রীমালি, চতুর্থ ও পঞ্চম প্রধান। এর মধ্যে ওসবাল আবার দুই উপবর্ণের বিভক্ত — বিসবাল ও দাস। একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে জৈনদের মধ্যে বর্ণ ও উপবর্ণের সংখ্যা সব মিলিয়ে ৫০০ ছাড়িয়ে গেছে।

পোশাক পরিচ্ছদ

স্থানীয় রীতি অনুসারে জৈনদের পোশাকআশাক বদলে যায়। তবে তাদের পোশাকআশাক কিন্তু ধর্মীয় রীতিনীতি মেনেই পড়তে হয়। জৈনরা অহিংসা ধর্মের রীতি মেনে পালক, লোমশ চামড়া, রেশমি, বা পশমের তৈরি জিনিস গায়ে দেন না। এমনকি তারা চামড়ার তৈরি জিনিসও গায়ে দেন না। যদি দিতে হয়, তারা আগে খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করেন — যে প্রাণীর চামড়া দিয়ে তৈরি জিনিস তারা পড়ছেন, তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল কিনা। তবে জৈনদের মধ্যে গহনা নিয়ে কোনও রকম বিধিনিষেধ নেই। বহু জৈন ব্যবসায়ী আছেন যারা অলঙ্কারের ব্যবসা করেন।

আগেই বলেছি যে জৈনদের মধ্যে দুটি ধর্মীয় শাখা

আছে – দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর। দিগম্বররা সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়ান। তবে দিগম্বর সম্প্রদায়ের নারীরা শ্বেতাম্বরদের ন্যায় সাদা পোশাক পরিধান করেন। তাদের নগ্ন হওয়া নিষেধ, এমনকি তাদের দিগম্বর মন্দির বা মঠে যাওয়াও নিষেধ।

আহার্য ও পানীয়

জৈনরা কঠোরভাবে নিরামিষভোজী, তাদের কোনও প্রকার মাংস, ডিম খাওয়া নিষেধ। এমনকি তাদের মাটির তলায় জন্মায় এমন সব্জি খাওয়াও নিষেধ, এই কারণে তারা আলু, গাজর, পেঁয়াজ ইত্যাদি ভক্ষণ করেন না। তবে কালের প্রভাবে বহু জৈন আমিষ ভক্ষণ করা শুরু করেছেন, বিশেষ করে আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকায় – কেননা সেখানে নিরামিষ আহারের সুবিধা নেই। জৈনদের মধ্যে সব রকম পানীয় চললেও, মধু পান নিষিদ্ধ কেননা তা মৌমাছিকে হত্যা করে সংগ্রহ করা হয়।

শিক্ষাদীক্ষা

জৈনদের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার বেশ ভাল। গড়পড়তা অধিকাংশ জৈন গ্র্যাজুয়েট বা তার উপরের স্তরের উচ্চশিক্ষা গ্রাহক হন। তবে জৈনদের মধ্যে বিজ্ঞান বা কলা নিয়ে পড়ার বদলে বাণিজ্য নিয়ে পড়ার প্রবণতা বেশী, বিশেষ করে পুরুষদের মধ্যে; কেননা বাণিজ্যের সাথে তারা বেশী যুক্ত থাকেন। বণিক, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টান্ট ইত্যাদি পেশা তাদের বিশেষ পছন্দের। অব্যবসায়ী নন এমন জৈন পরিবার ভারত ও বিশ্বে ১০% এ রকম হবে। বেশিরভাগ জৈন পারিবারিক ব্যবসা চালান এবং ব্যবসায়ী জাত হিসাবে তাদের সুনাম বা দুর্নাম দুইই রয়েছে।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

মহাবীর বর্ধমান তার ধর্মীয় বাণীগুলি অর্ধমাগধী ভাষায় দিতেন, যা আজ মৈথিলী নামে পরিচিত। প্রায় সব জৈন

গ্রন্থ স্থানীয় ভাষায় লিখিত, এবং তাদের মধ্যে কোনও নির্দিষ্ট ধর্মীয় ভাষা নেই – যেমন সংস্কৃত (হিন্দু), আরবি (মুসলিম), পাঞ্জাবী (শিখ), ল্যাটিন (খ্রিস্টান) বা পালি (বৌদ্ধ) আছে। জৈন ধর্মগ্রন্থগুলি সূত্র (Sūṭra) নামে পরিচিত, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগ্রন্থ হল কল্পসূত্র (Kalpasūṭra)। এই কল্পসূত্র গ্রন্থেই রয়েছে তাদের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় উপাস্য তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্ধমানের জীবনী ও তার বাণীগুলি। জৈন গ্রন্থগুলি উত্তর ভারতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংস্কৃত আর দক্ষিণ ভারতে কন্নড় ও মারাঠি ভাষায় রচিত হয়েছে। কিছু জায়গায় গুজরাতি ও তেলুগু ভাষাতেও আছে। জৈনদের মধ্যে ভারতের প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাগার রয়েছে গুজরাতের ভাদনগর ও কর্ণাটকের শ্রাবণবেলগোলা জেলায়, দুটো গ্রন্থাগারই প্রায় ১৭০০ বছরের পুরানো।

জৈন স্থাপত্য হিন্দু স্থাপত্যের পরেই সবচেয়ে বেশী প্রভাব ফেলেছে ভারতীয়দের মধ্যে। বণিক জাত বলে জৈনদের পক্ষে অসাধারণ সুন্দর স্থাপত্য গড়া সম্ভব হয়েছে। রাজস্থানের দিলবাড়া, রণকপুর, গুজরাতের গিরনার, শত্রুঞ্জয় পার্বত্য মন্দির এরকমই টিকে থাকা কয়েকটা প্রাচীন জৈন স্থাপত্যের উদাহরণ; যা একাদশ শতক প্রাচীন।

কর্মজীবন

যেহেতু জৈন ধর্মে অহিংসা পালন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় নীতি, তাই তারা এমন কোনও পেশায় কোনও ভাবেই যাবেন না, যেখানে সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে প্রাণী হত্যা করা হয়। এই কারণে তাদের মধ্যে কসাই, চামড়ার কাজ, গম পেশাই ইত্যাদি জীবিকা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। একই কারণে চাষাবাদ বা পশুপালন করাও সম্ভব নয়, কেননা তারা বিশ্বাস করেন মাটিতে পতঙ্গ বা অণুজীব আছে; যা লাঙ্গল চালালে মরে যায়। আর জীবহত্যার

চেয়ে বড়ো পাপ জৈনদের কাছে নেই। এখানে বলে রাখা দরকার চতুর্থ বর্ণের জৈনরা এই তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না এবং মহীশুর অঞ্চলে তারা চাষাবাদ করেন। যা অবশ্যই একমাত্র ব্যতিক্রম ঘটনা। একই কারণে জৈনরা ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে চাকরী করেন না, কেননা তাদের ধারণা ধারাল অস্ত্রের আঘাতে নিশ্চিত ভাবেই পতঙ্গ বা অণুজীবের মৃত্যু হয়।

এত রকম বিধিনিষেধের কারণেই জৈনরা চাকরীর বদলে ব্যবসাকে পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছে। প্রায় সব জৈনই জন্মগত ভাবে ব্যবসায়ী কিংবা স্বাধীন জীবিকায় আগ্রহশীল। ভারতে এদের বানিয়া বা ব্যবসায়ী বলা হয়। জৈনদের মধ্যে যেসব ব্যবসা বিশেষ প্রচলিত তা হল – ১. ব্যাঙ্কার ২. চার্টার্ড অ্যাকাউন্টান্ট ৩. সুদের ব্যবসা ৪. অলঙ্কারের ব্যবসা ৫. কাপড়ের ব্যবসা ৬. ধাতুর তৈজসপত্রের ব্যবসা ৭. ঔষধ ইত্যাদি। ভারতের ইতিহাসে বহু শিল্পপতির নাম পাওয়া যায়, যারা জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তবে ২০০০ সালের পর থেকে নানান কারণে জৈন যুবকদের মধ্যে ব্যবসার প্রতি আগ্রহ কমছে, তার বদলে সরকারী চাকরির প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। ধর্মীয় কোটায় তারা চাকরী পাচ্ছেন বলে চাকরির প্রতি তারা আগ্রহশীল হয়ে উঠছেন। কেন্দ্রীয় সরকারী চাকরীতে তাদের অংশ নেওয়ার পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে, বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে।

জাতীয় ক্রীড়া

এমন কোনও বিশেষ ক্রীড়া নেই, যা জৈনদের জন্য নির্দিষ্ট।

বিনোদন

একজন সাধারণ শহুরে ভারতীয়রা যেসব ক্ষেত্র থেকে বিনোদন গ্রহণ করেন, জৈনরা তাদের মধ্যে কোনও

ব্যতিক্রম নন। তাদের ধর্মের সাথে যুক্ত কোনও নির্দিষ্ট খেলাধুলা নেই।

সামাজিক সমস্যা

দিল্লিতে সব মিলিয়ে ৫ লক্ষ জৈন আছে, তারা ১৯৯৯ সালে নিজেদের জন্য ধর্মীয় সংখ্যালঘু তকমা পাওয়ার জন্য লড়ছিল, তারা এ ব্যাপারে শিখ, বৌদ্ধ ধর্মের উদাহরণ দেখিয়েছিল। তাদের দাবি মেনে নিয়ে ১৯৯৯ সালে দিল্লি মাইনরিটি কমিশন অ্যাক্ট বদলে ধর্মীয় সংখ্যালঘুর মর্যাদা দেওয়া হলেও, ২০১২ সালের পূর্বে তারা সমগ্র দেশ জুড়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তকমা পায়নি। দিল্লিতে অন্তত ৮ জৈন স্কুল থাকলেও ১৯৯৯ সালের আগে সেখানে ধর্মশিক্ষা দেওয়া বৈধ ছিল না। কেননা জৈন ধর্ম ধর্মীয় সংখ্যালঘু ছিল না। এই কারণে তারা ক্ষোভ প্রকাশ করছিল। দিল্লি ১৯৯০ দশকে একমাত্র রাজ্য ছিল, যেখানে জৈনরা ধর্মীয় সংখ্যালঘু ছিল না; কেননা সেখানে সংখ্যার দিক থেকে জৈনরা আদৌ সংখ্যালঘু ছিল না।

জৈনরা ধনী সম্প্রদায়ের লোক বলে তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক সমস্যা সেভাবে কোনওদিনই ছিল না, যা অন্যান্য ধর্মের বেলায় দেখা যায়। এছাড়া জাতপাতের সমস্যাও জৈনদের মধ্যে সেভাবে নেই, যা হিন্দু, শিখ, খ্রিস্টান বা মুসলিমদের মধ্যে দেখা যায়। তাদের প্রধান সমস্যা হল পরিচ্যগত সমস্যা। অর্থাৎ তাদের মধ্যে জৈন নাকি হিন্দু এই পরিচয়ঘটিত সঙ্কট যত সময় যাচ্ছে বেড়েই যাচ্ছে। বহু ধর্মতত্ত্ববিদের মতে, জৈনদের মধ্যে আত্মপরিচয়ের সমস্যা ক্রমশ বৃদ্ধি বাড়ছে, কেননা তাদের মধ্যে জন্মহার কমছে এবং ধর্মীয় শিক্ষার হার কমছে। তাছাড়া তাদের মধ্যে অন্য ধর্মের লোককে বিবাহ বাড়ার পরিমাণ বাড়ছে, যার ফলে জৈন ধর্ম বিপন্ন হচ্ছে।

লিঙ্গগত সমস্যা

ধর্মগত ভাবে জৈন ধর্মের মধ্যে কোনও প্রকার লিঙ্গগত, বর্ণগত, জাতিগত বা ধর্মীয় বিভেদ নেই। কিন্তু তা পুরোপুরি সত্য নয়। বাকি যে কোনও ধর্মের ন্যায় জৈন ধর্মে নারীদের প্রতি দৃষ্টিকটু বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। দিগম্বর শাখায় নারীরা মোক্ষ লাভের অধিকারী নন, এমনকি পুরুষের আগে তারা মুক্তি লাভ পেতে পারেন না। তাদের নগ্ন হয়ে ঘোরার স্বাধীনতাও দেওয়া হয়নি, যা পুরুষদের দেওয়া হয়েছে। এইসব কারণে জৈন ধর্মে মেয়েরা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকের বেশী কিছু নয়। এমনকি মহিলারা দিগম্বর শাখায় সন্ন্যাসীও হতে পারেন না। মহিলাদের নগ্ন হওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞার পেছনে আছে বিচিত্র যুক্তি — নারীরা নগ্ন হয়ে ঘুরলে পুরুষরা যৌন আকাঙ্ক্ষায় ভুগবে, ফলে তার মুক্তির পথে বাধার সৃষ্টি হবে। দিগম্বররা এও বিশ্বাস করে পুরুষদের তুলনায় নারীরা বেশী হিংস্র, কামাতুর ও লোভী। যুগপৎ শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর মতাবলম্বীরা বিশ্বাস করে রজস্বলা নারীরা রক্ত ঝরানোর মাধ্যমে জীবহত্যা করে থাকে, তাই তারা পুরুষদের তুলনায় বেশী হিংস্র। যদিও এই ধারণার কোনও বৈজ্ঞানিক সমর্থন নেই, তবুও জৈনরা একে অন্ধের মত বিশ্বাস করে থাকে।

জৈন ধর্মগ্রন্থের সূত্র অনুসারে রজস্বলা হওয়ার অর্থ হল সে মহিলা অপবিত্র। অবশ্য একই ধারণা হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ ও অন্যান্য একেশ্বরবাদী ধর্মেও দেখা যায়। আধুনিক যুগে এসেও এই ধারণা কোনও ধর্ম থেকে দূরীভূত হয়নি। কাজেই জৈনদের খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না।

শ্বেতাম্বররা অবশ্য মেয়েদের বিষয়ে কিছুটা উদারবাদ অবলম্বন করেছেন। বহু শ্বেতাম্বরবাদী সন্ন্যাসিনী আছে, যারা নিজ কর্ম দ্বারা জৈনদের বিখ্যাত করেছেন। জৈন সন্ন্যাসিনীদের সাধ্বী বলা হয়। এরা সমাজসেবার জন্য

বিখ্যাত।

জৈনদের মধ্যে নারী শিক্ষার হার ভারতের বাকি ধর্মের লোকের মধ্যে সবচেয়ে কম। জৈন নারীদের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার মাত্র ৯%, যেখানে জৈন পুরুষের স্বাক্ষরতার হার প্রায় ৯০%। এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় জৈনরা আদৌ চান না নারীরা শিক্ষালাভ করে ধর্মীয় বৈষম্য থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা করুক। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য নারীদের মধ্যে স্কুলে যাওয়ার হার জৈন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সবচেয়ে কম। এই অবস্থা প্রায় সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়, কেবল পাশ্চাত্য দেশ বাদে, সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক এবং মেয়েদের স্কুলে না পাঠালে অভিভাবকদের কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।

জৈনদের মধ্যে কন্যাভ্রুণ হত্যার রেকর্ডও বেশ উন্নত, বস্তুত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে জৈনদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী কন্যাভ্রুণ হত্যা করা হয়। এই কারণে হাজার পুরুষ পিছু জৈন নারীর সংখ্যা বেশ কম। ১৯৮০ দশক থেকে এই ‘ট্রেন্ড’ চলছে, যা এখনও বদলায়নি।

তথ্যসূত্র / গ্রন্থপঞ্জী

1. Dundas, Paul. The Jains. London and New York: Routledge, 1992.
2. Jain, Saṭīsh Kumār and Kamal Chānd Sogānī, ed. Perspectives in Jaina Philosophy and Culture. New Delhi: Ahiṃsā International, 1985.
3. Jaini, Padmanābh S. ed. Collected Papers on Jaina Studies. Delhi: Moṭilāl Banārsidass, 2000. ———. The Jaina Paṭh of Purifcation. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1970.
4. Kumār, Rājjan. Different Aspects of Jainism. Delhi: Sunrise Publications, 2006.
5. Lodrick, Deryck O. ‘Ahiṃsa, Man and Animals: Aspect of Religion in the Cultural Landscape of Western India.’ In India: Cultural Patterns and Processes, edited by Allen G. Noble and Aṣok K. Duṭṭ. Westview Press: Boulder, Co., 1982.
6. Saṃgāve, Vilās Ādināth. Jaina Community: A Social Survey. Bombay: Popular Prakashan, 1980.
7. https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A7%88%E0%A6%A8_%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE



সমাজের অর্থনৈতিক শ্রেণিবিভাগ ও প্রাথমিক সাম্য

যে ৭০% লোক আসলে মৌলিক অধিকারগুলো বা প্রাথমিক সাম্য পায়নি তারা কীভাবে ওগুলো অর্থাৎ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা আদায় করবে?...**দিলীপ দাস মণ্ডল**

আমাদের সমাজে অর্থনৈতিক ভাবে যে শ্রেণিগুলো প্রচলিত আছে সেগুলো মোটামুটি এইভাবে ভাগ হয়ে আছে— ১) ধনী ২) উচ্চ মধ্যবিত্ত ৩) মধ্যবিত্ত ৪) নিম্ন-মধ্যবিত্ত ৫) নিম্নবিত্ত ৬) গরীব। বিভিন্নস্থানে এই ভাগগুলো ছাড়া অনেক উপভাগেও বলা হয়ে থাকে। ধনী ভাগকে ধনী, উচ্চ ধনী, সুপার ধনী ইত্যাদি নামে বলা যেতে পারে। এখানে এই ছ-টা ভাগ হিসেবেই পর্যালোচনা করার চেষ্টা হচ্ছে।

ভাগগুলো তৈরি হয়েছে কে কেমন আয় করে আর কেমন খরচ করার সামর্থ্য আছে তার উপর নির্ভর করে। আমরা কয়েকজন পর্যালোচনা করে আয়ের মাপ

ধরে শ্রেণিগুলো আলাদা করার চেষ্টা করেছি। (যেহেতু শ্রেণিগুলো ভাগের কোনো মাপ ঠিকঠাক কোথাও নেই)

তিনজনের পরিবারে মাসে মোট যে আয় করে সংসারে যে খরচ করার সামর্থ্য তৈরি হয় তারওপর নির্ভর করে পরপর মাসিক আয়গুলো হল—

গরীব শ্রেণি পরিবারে আয় ৫০০০ টাকার কম (তিনজনের সংসার)।

নিম্নবিত্ত শ্রেণি পরিবারে আয় ৫০০০ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকা।

নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণি পরিবারে আয় ১০,০০০ টাকা থেকে ২০,০০০ টাকা।

মধ্যবিত্ত শ্রেণি পরিবারে আয় ২০,০০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকা।

উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণি পরিবারে আয় ৫০,০০০ টাকা থেকে ১০০,০০০ টাকা।

ধনী শ্রেণি পরিবারে আয় ১০০,০০০ টাকার বেশি।

এগুলো সবই তিন জনের সংসারে এক মাসের আয়। পরিবারে বেশি সদস্য সংখ্যা হলে অনুপাতে আয় বেশি হতে হবে।

২

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা ন্যূনতম যতটা মানুষের পাওয়া দরকার তা ভারতের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বা ফান্ডামেন্টাল রাইট। এটা কার্যকর করার দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু দেখা গেল স্বাধীনতার পর থেকে এখনও পর্যন্ত কোন সরকার ভারতের বা কোন রাজ্যের ৭০% নাগরিকদের জন্য তা কার্যকর করতে পারেনি।

শাসক দল কার্যকর করতে পারেনি আসলে নয়। আসলে দলগুলো দেখেছে উপরের ৩০% জনগণকে তাদের অবস্থানে রক্ষা করতে পারলেই ঐ ৩০%

নাগরিকই বাকি ৭০% নাগরিককে মগজ ধোলাই এবং ভাঁওতা দিয়ে নির্দিষ্ট দলকে শাসন ক্ষমতায় বসাবে।

তাই শাসক দল ক্ষমতায় আসার পর ঐ ৩০% নাগরিক কীভাবে সন্তুষ্ট থাকে তার হিসাবে কাজ করে বাকি ৭০% নাগরিকের জন্য প্রকল্প তৈরি করে সেই প্রকল্পের সুযোগের ললিপপ দেখিয়ে যাবে আর আসলে প্রকল্পগুলিকে প্রকৃত কার্যকর না করে কায়দা করে তার সুযোগগুলোর কাটমানি ঐ ৩০% লোকই কুক্ষিগত করে। যত প্রকল্প আছে তার মধ্যে নিচু লেভেলরা ১০০ দিনের কাজ ছাড়া আর কোন প্রকল্প থেকে ৭০% লোক কোন আয় করতে পারে না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রতিরক্ষা, পরিবহন ইত্যাদি যত শতশত প্রকল্প আছে তার থেকে আয় করে নেয় বাকি ৩০% লোকই।

আমাদের দেশে সিস্টেম এমনই যে ওই সিস্টেম দিয়েই সরকারের প্রায় সব খরচ আয় হয়ে যাবে ঐ ৩০% লোকের মধ্যেই। দেশের ৭০% লোক জানেই না যে লোকের সামনে যে সিস্টেম দেখানো হয় তার বাইরে ঐ সিস্টেমে বুড়ো আঙ্গুল দেখানো অন্য গোপণ সিস্টেম আছে। আর জানলেও সিস্টেমের মধ্যে এমন আইনি ঘোরপ্যাঁচ আছে যে সে ব্যাপারটা বুঝতে পারবে?

এই ৭০% লোকের মধ্যে ১০% থেকে ২০% লোক আসলে মৌলিক অধিকারগুলি পায় না অথচ নিজে মনে করে সে উপরের ৩০% শ্রেণির লোক।

যে ৭০% লোক আসলে মৌলিক অধিকারগুলো বা প্রাথমিক সাম্য পায়নি তারা কিভাবে ওগুলো অর্থাৎ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা আদায় করবে? যেকোনো জিনিস বা পরিষেবা পেতে গেলে যেহেতু খরচ করতে হয় তাই তাকে প্রথমত আয় করতে হবে।

কোনোভাবে ঠিকমত আয় করতে না পারলে যাতে ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমে আয় হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। আয়ের অনেক রাস্তা আছে তা খুঁজে বের করতে

হবে। কখনোই ১০০ দিনের কাজের মজুরির চেয়ে কম মজুরিতে অন্য জায়গায় কাজ করবে না।

যারা ৭০% মধ্যের লোক বা তোমার সত্যিই অভাব অনুভব করছে তাদের ছাড়া উপরের ৩০% মানুষের কাছে প্রকৃত সাহায্য পাবে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে। এই ৭০% লোকের মধ্যে সংগঠিত হবার চেষ্টা করতে হবে। উপরের ৩০% শ্রেণি বা টিভি চ্যানেল গুলো তোমাকে প্রকৃত রাস্তা দেখাবে না। উল্টে বিপথগামী করে তুলবে। মনে রাখবে টিভি চ্যানেল ঐ ৩০% লোকের প্রতিনিধি।

ধনী, উচ্চ-মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, গরীব ইত্যাদি শ্রেণির মধ্যে যখন যে শ্রেণির লোক সে সেই শ্রেণির ঠিক উপরের শ্রেণি আর নিজের শ্রেণি ছাড়া অপর শ্রেণির লোকের সঙ্গে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত কাজে কম্পিটিশনে জড়িয়ে পড়া থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে। অন্যথায় পরে নিজের লেভেল থেকে আরও নিচের লেভেলে পড়ে যাবে।

এখানে নিচের তিন লেভেলের (নিম্ন মধ্যবিত্ত, নিম্ন বিত্ত, গরীব) সঙ্গে সংযুক্ত মানুষদেরই সতর্ক করছি। অর্থাৎ আয় বুঝে ব্যয় কর। লক্ষ্য রাখ যে অন্তত প্রাথমিক সাম্য আদায় করে নেওয়া যায়।



ইসকনের মানব প্রেম না মানব ঘৃণা

তিনি নাতিকে সেসব খাওয়াবেন না। ওনার যুক্তি হল – ডিম, মাংস ছাড়া কেউ কী বাঁচে না নাকি! কী আর করা! পুত্রবধূ বাধ্য হয়ে বারবার রেস্তরাঁয় নিয়ে গিয়ে পুত্রকে মাংস খাওয়ান...**মানব চৌধুরী**

ইসকন (ISKCON) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৬ সালে। সদর দপ্তর মায়াপুর, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। গীতাকে তারা অনুসরণ করে 'হরে কৃষ্ণ' আন্দোলন করে থাকেন। অর্থাৎ, ওনারা শ্রী কৃষ্ণের ভক্ত। এতে কোন সমস্যা নেই। সমস্যা হচ্ছে তাদের ইসকনিক নিয়ম-নীতিতে। ইসকনে যোগ দেওয়া একজন আরেক জনকে 'প্রভু পাদ' বলে ডেকে থাকেন। আপনি চাইলেই ইসকনের 'মুরিদ' হতে পারবেন না। আপনি অবশ্যই তাদের মন্দিরে যেতে পারবেন, তবে ইসকনের মুরিদ হতে গেলে প্রথমে আপনাকে তাদের মন্ত্র নিতে হবে। মানে তাদের লাইনে আসতে হবে। তাদের লাইনে আসার পর আপনি আর

কখনো আমিষ– মানে মাছ, মাংস, পেঁয়াজ, রসুন, মসুরের ডাল ইত্যাদি খেতে পারবেন না। তারপর আরও আছে। চা, কফি, পান, সিগারেট, ড্রিংস এগুলোও খেতে পারবে না।

তবে এতে কোন আপত্তির কিছু নেই, প্রত্যেকেরই তার নিজের খাদ্যাভ্যাস নির্বাচন করার অধিকার আছে। কিন্তু সমস্যা হল ওনাদের নিয়ম – যা বলে যে, যিনি মন্ত্র নেননি – মানে যিনি ইসকনের লোক না, সেই লোকের হাতে রান্না করা কোন কিছু তারা খেতে পারবে না। সে মানুষটা যদি নিজের মা–ও হয়, তাহলেও। সেই নিয়ম অনুযায়ী আমাদের এলাকার কিছু যুবক হঠাৎ করেই ওদের লাইনে চলতে লাগল এবং তারা তাদের মায়ের হাতের পানি খাওয়ার অভ্যাসও ত্যাগ করল।

তাদের মায়েরা কান্নাকাটি করে বলতে লাগল যে, এটা আবার কেমন ধর্ম! আমি সেই ছেলেগুলোকে জিজ্ঞেস করলাম – 'খেলে কী হয়?' জবাবে ওরা বলল যে, তাদের মায়েরা যেহেতু মন্ত্র নেয়নি, সেহেতু তার রান্না করা খাবার যদি তারা খায় তাহলে মায়ের শরীরের রাগ–দুশ্চিন্তা, মানে সেই মানুষের নেতিবাচক জিনিসগুলো তাদের মধ্যে চলে যাবে।

এইসব উত্তর শুনে আমার মনে হল যে, ইসকনের লোকেদের বোধহয় কোন রাগ বা দুঃখ নেই। সেই জন্যই পুরোপুরি বৈজ্ঞানিকভাবে তারা আহার করে থাকে। কিন্তু আমি তো একজন অধম মানুষ, তাই আমি আমার বাসায় বলে দিয়েছি যে, বাসায় যেন কোন ইসকনের লোক না আসে। যে মানুষ আমার বাসার খাদ্য গ্রহণ করবে না সেই মানুষের খাদ্য আমিও খেতে রাজি নই।

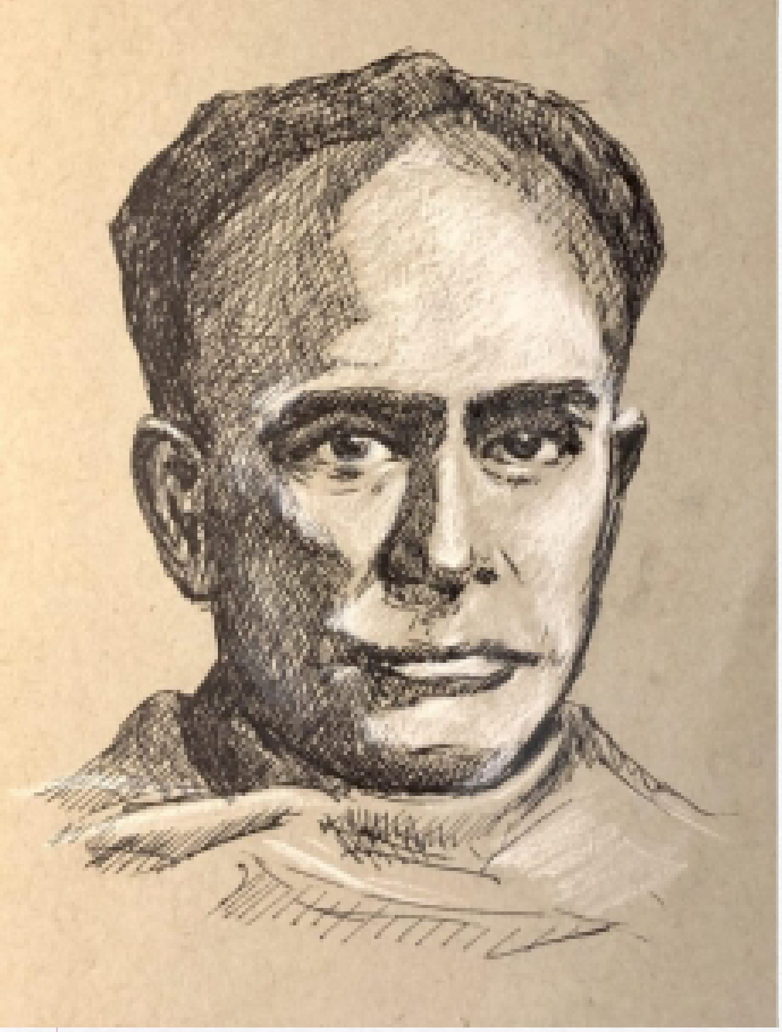
তারা নাকি মানব প্রেমের প্রচার করে! মানব প্রেম হল সেটা, যা মানুষকে ভালবাসতে শেখায়, কাছে টানতে শেখায়, ধর্মীয় বিধি–নিষেধে দূরে ঠেলা দেওয়া নয়। হিন্দুদের ব্রাহ্মণরা অন্যের বাড়িতে পানিও খেত না। যুগের ঠেলায় পড়ে এখন তারা ভাতও খাচ্ছে। তাহলে কী, এই যুগের ইসকনরা নিজেদেরকে 'নতুন কালের

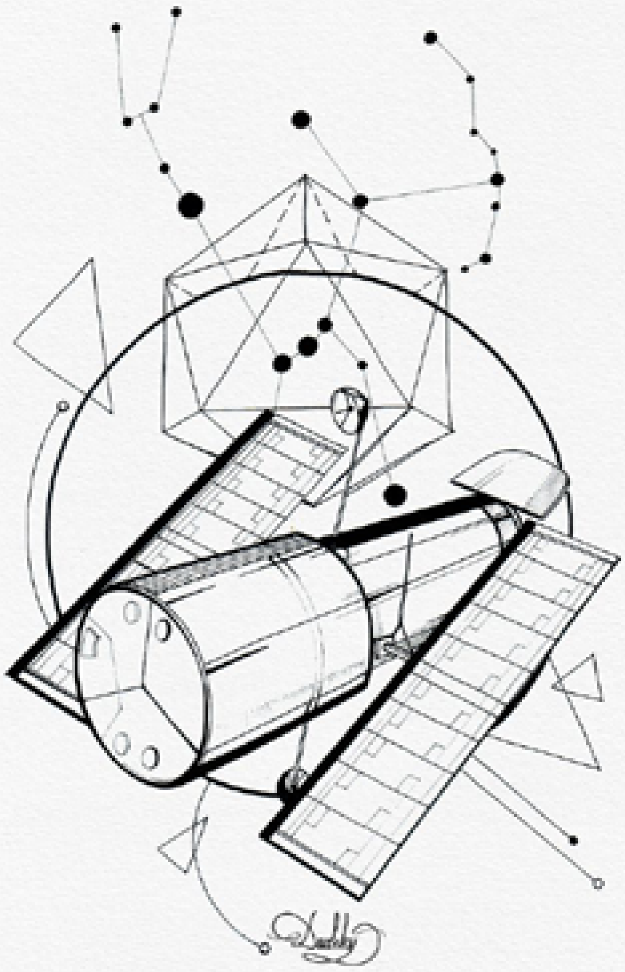
ব্রাহ্মণ’ হিসেবে হাজির করতে চাইছে? তারা তো আবার ইসকনিক ছাড়া বিয়েও করেন না।

আমার এক আত্মীয় ইসকনের নতুন সদস্য হলেন। তবে ওনার দাঁত ভাল মতন পরীক্ষা করলে খাসির ও গোরুর পায়া পাওয়া যাওয়ার খুবই সম্ভাবনা আছে। তবে এতে আপত্তির কিছু ছিল না। তিনি কৃষ্ণ প্রেমে ইসকনের সদস্য হতেই পারেন। কিন্তু ঝামেলা হল তার নাতি জন্মানোর পর। ডাক্তার, নাতিকে ডিম, মাংস ইত্যাদি খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তবে তিনি নাতিকে সেসব খাওয়াবেন না। ওনার যুক্তি হল – ডিম, মাংস ছাড়া কেউ কী বাঁচে না নাকি! কী আর করা! পুত্রবধূ বাধ্য হয়ে বারবার রেস্তরাঁয় নিয়ে গিয়ে পুত্রকে মাংস খাওয়ান। এই হল ওদের মানব প্রেম!

এই যদি হয় কৃষ্ণ প্রেম, তাহলে এত প্রেম আমরা রাখব কোথায়! শুধু তাই না। এই ইসকনধারীরা আবার উগ্র-ধার্মিক হয়ে থাকে। এরা ছলে বলে নিজের পরিবারের অন্যদের এই পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। ‘যত মত তত পথ’ – এই নীতি তারা মানতে রাজি নয়। উদ্বিগ্নের বিষয় হল বাঙলাদেশে বর্তমানে রথ-যাত্রাসহ অন্যান্য হিন্দু-ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব দিচ্ছে এই সংগঠনটি। তাঁর সঙ্গে বলে রাখা ভাল যে, অন্য ধর্মের মানুষদের সম্পর্কে এদের ধারনা খুবই নিচু প্রকৃতির।

মানুষের অসহায়ত্ব, অনিশ্চয়তার সুযোগ প্রতিটি ধর্মীয় সংস্থা নিয়ে থাকে। যে দেশের মানুষ যত বেশি দরিদ্র তারা তত বেশি ভীত। ফলে তত বেশি ঈশ্বর-আল্লা অভিমুখী। বাঙলাদেশে হিন্দু বা সনাতনীরা সংখ্যালঘু। আর সংখ্যালঘুদের অনুভূতি সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ হয় না। ফলে মুসলিমদের কুসংস্কার যতোটা চোখে পড়ে, হিন্দুদেরটা ততোটা চোখে পড়ে না। অথবা পড়লেও তাঁর সংখ্যা কম হওয়ার অনেকেই আমরা সেটা এড়িয়ে যাই।





বিদ্যাসাগরের যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানচর্চা

সাহিত্যের লোক হয়ে তাঁর বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসা নজরে পড়ার মতো। এবং সে বিজ্ঞানের ক্ষেত্র বহুধাবিস্তৃত। বাংলা ভাষায় বলা যেতে পারে তিনি আদি বিজ্ঞান লেখক।

...**জ্যোতির্ময় ধর**

বিদ্যাসাগর বাঙালির বিস্ময়। তিনি এক অখ্যাত গ্রামের খুব সাধারণ ঘর থেকে এসেছেন, কিন্তু অত্যন্ত অসাধারণ হয়ে উঠেছেন তাঁর পাণ্ডিত্য, সাহিত্যকীর্তি, ব্যক্তিত্ব, প্রতিভার জন্যই শুধু নয়, সমাজ সংস্কারকরূপে যাঁরা এসেছেন তাঁদের মধ্য অন্যতম বলেই শুধু নয়, সেই প্রায় অন্ধকার কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুগে অবিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞানের যুক্তিহীন অনড় অচল নিগড়ে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা কালের সঙ্গে তাল রাখতে না পারা পিছিয়ে পড়া জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করে তিনি যুক্তিবাদের কথা বলেছেন, মনুষ্যত্বকে খর্ব করে দেয়, এমন দেশাচার ও কালাচারের উর্ধ্বে উঠতে চেয়েছেন, কঠিন অধ্যবসায় সহকারে যুক্তি পারস্পর্যের মধ্যে দিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে

এসেছেন, সাড়ম্বরে তা ঘোষণা করেছেন, তাঁর মত প্রতিষ্ঠায় চমৎকার মরণপণ সংগ্রাম করেছেন, বক্তব্যে ছিল তাঁর ঋজু ও সুস্পষ্টতা, ছিল তাঁর তীব্র বিশ্লেষণ ক্ষমতা, সঠিক সাক্ষ্য প্রমাণ পেলে কোনও কিছু তিনি গ্রহণ করেছেন, না পেলে করেছেন বর্জন, পরিচয় দিয়েছেন প্রখর বাস্তববোধের এবং এ সমস্তের মূলে ছিল তাঁর বিজ্ঞানমনস্কতা।

বিদ্যাসাগরের বিজ্ঞানমস্কতা, বিজ্ঞান ভাবনা ও চেতনা নিয়ে বড়ো একটা আলোচনা হয়েছে বলে মনে হয় না। তাঁকে একজন নিবেদিত প্রাণ সমাজবিজ্ঞানী বলতে কী পারা যায় না? জনস্বাস্থ্য বিষয়ক চেতনাও ছিল তাঁর মধ্যে, তাঁর কাজে, তাঁর লেখায়। তিনি মূলত সাহিত্যের লোক। সাহিত্যে তাঁর কীর্তি ও অবদান কালজয়ী। কিন্তু বিজ্ঞানের অমল আলোয় উদ্ভাসিত ছিল তাঁর হৃদয়। যে কালে তিনি জন্মেছিলেন, সেই কাল ছাড়িয়ে, ছাপিয়ে উঠেছিল তাঁর মাথা। মান্ধাতার আমলের ধ্যানধারণার আঘাত হেনেছিলেন। ছিলেন অতি আধুনিক।

বিদ্যাসাগর তাই তাঁর কালে এবং এখন আমাদের এই কালেও এক পুরোধা পুরুষ, যিনি লোকাচারের অন্ধবদ্ধ ক্ষয়িষ্ণু মায়া-মমতাহীন, নিষ্প্রাণ নিষ্ঠুর প্রচলিত ছকের বাইরে সমাজ ও জাতিকে পথ দেখান, ধরে থাকেন অগ্রগতির অনির্বাণ মশাল।

আশ্চর্য এই যে আচারে, ব্যবহারে, আহারে, পরিধানে, জীবনযাত্রায় তিনি শতকরা ১০০ ভাগ বাঙালি। বাঙালি তো ভীরু, দুর্বল, লঘুমতি, অব্যবস্থিত চিত্ত, স্বপ্ন বিলাসী! এ সবের এক কণাও বিদ্যাসাগরের ধারে কাছে ঘেঁষতে পারেনি। বাঙালি মনীষার অন্তরের অন্তঃস্থলে হিমালয় ছাড়িয়ে যাবার যে কল্পনা, বিদ্যাসাগর তার বাস্তব রূপ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন, হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তির মিলিত বিকাশ দেখি তাঁর খর্বকায় দৃঢ় ঋজু চরিত্রে, বাঙালির মধ্যে যুগোপযোগী এক—স্বতন্ত্র উজ্জ্বল আবির্ভাব। জাতীয়

উজ্জীবনের প্রেতনাদাতৃ। পৌরুষের উদ্গাতা। কোমলে কঠোরতায় মিলিয়ে এক আদর্শ বাঙালির চিরকালীন অমল নির্দশন।

তাঁর বিজ্ঞানমনস্কতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ তাঁর রচিত ‘জীবন চরিত’ গ্রন্থ। বইটি লিখেছিলেন ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর বয়স তখন উনত্রিশ। চেম্বার্স সংগৃহীত বহু সুপ্রসিদ্ধ পুরুষের জীবনীর যে সঙ্কলন, তার থেকে কয়েকজনকে বেছে নিয়েছিলেন। মূলত অনুবাদ করেছিলেন, যদিও স্বকীয় বিশিষ্টতা, টিকা-টিপ্পনীও রয়েছে। এই বইয়ে বেছে নিয়েছেন তিনি কাদের জীবনী? বেশির ভাগ বিখ্যাত সব বিজ্ঞানী এবং এঁদের অনেকে প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন, কারণ সত্য তাঁদের কাছে ছিল সব থেকে বড়ো ধর্ম।

বইটিতে যাঁদের জীবনী আছে: নিকলাস কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, আইজাক নিউটন, উইলিয়ম হর্শেল, গ্রোশ্যস, লিনিয়স, বলন্টিন জামিরে ডুবাল, তামস জেস্কিন্স ও উইলিয়ম জোন্স। প্রচলিত তথাকথিত অভ্রান্ত ধর্মশাস্ত্রের বিধান না মেনে কোপার্নিকাস বলেছিলেন পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, গালিলিয়ও তাই প্রমাণ করেছিলেন, এর ফলে তাঁকে নির্বাসিত হতে হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। শেষ জীবনে যদিও তিনি অন্ধ বধির হয়ে গিয়ে ছিলেন তাহলেও তাঁর বিজ্ঞানসঞ্জাত বিশ্বাস ত্যাগ করেনি গালিলিয়। মাধ্যাকর্ষণ সঙ্গে নিউটনের নাম অভিন্নভাবে জড়িত। তিনি আলোক ও বর্ণ দুই পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় করেছেন, ভৌতবিদ্যার আরও অনেক প্রশ্নের মীমাংসা করেছেন। উইলিয়াম হার্শল আধুনিক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের জনক। গতিশাস্ত্রে পারদর্শী গ্রোশ্যস ‘সর্বতন্ত্র পক্ষীয়’ (যেখানে রাজা নাই, সর্বসাধারণ লোকের মতানুসারে যাবতীয় রাজকার্য নির্বাহ হয়) সমর্থন করতে বলে জেলে গিয়েছিলেন, চিকিৎসক লিনিয়ন জীবজগত ও উদ্ভিদজগতের বিজ্ঞানানুযায়ী নতুন নামকরণ করেন।

বোধোদয়

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত

কলিকাতা।

সংস্কৃতযন্ত্রে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯০৮।

ডুবাল ছিলেন জ্যোতিষ, ভূগোল, পুরাবৃত্ত ও পৌরণিক বিশারদ। জেঙ্কিস-আফ্রিকা দেশীয় কোনও রাজার পুত্র ছিলেন ল্যাটিন ভাষায় দক্ষ। স্যার উইলিয়াম জোন্স অনুবাদ করেছিলেন শকুন্তলা, মনুসংহিতা প্রভৃতির।

বিজ্ঞানীদের চরিত্র চিত্রণে ধর্মের উপর সত্যের স্থান বিদ্যাসাগরও তাঁর রচনায় আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন

এক জায়গায় তিনি লিখছেন: 'গ্রোশ্যস অত্যন্ত কুৎসিত সময়ে ভূমন্ডলে আসিয়াছিলেন। ঐ কালে জনসমাজ ধর্ম ও দন্ডনীতি বিষয়ক বিষম বিসংবাদ দ্বারা সাতিশয় বিসস্কুল ছিল। মনুষ্যমাত্রই ধর্মসংক্রান্ত বিবাদে উন্মত্ত এবং ভিন্ন ভিন্ন পক্ষের ঔদ্ধতা ও কলহপ্রিয়তা দ্বারা সৌজন্য ও দয়া দক্ষিণ্য একান্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল'।

বইটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। সাধারণ মানুষ যে বিজ্ঞান সচেতন এটি তার প্রমাণ। বিদ্যাসাগর সেই সচেতনতা যাতে ছড়িয়ে যায় তাঁর জন্যই এ রকম পুস্তক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। ছয় মাসের মধ্যে বইটির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যায়।

অন্য একদিক দিয়ে জীবনচরিত গ্রন্থটির গুরুত্ব আছে। বিদ্যাসাগর দুরূহ বিজ্ঞান বিষয়ক ইংরেজি শব্দের বাংলা পরিভাষা বেশ কিছু সন্নিবেশিত করেছেন পুস্তকটির শেষাংশে। যেমন অস্থিত পাটীগণিত = Arethmetic of Infinites, উদ্ভিদবিদ্যা = Botany, কক্ষ = Orbit, কেন্দ্র = Centre, গণিত = Mathematics, গবেষণা =Research, গ্রহনীহারিকা = Planatary Nebulae, ছায়াপথ = Milky Way, দূরবীক্ষণ= Telescope, দৃষ্টিবিজ্ঞান = Optics, স্থিতিস্থাপক Elusticity= প্রভৃতি। এ সবের মধ্যে কতকগুলি তো কাব্যের মত মনোরম, যেমন গ্রহনীহারিকা, ছায়াপথ প্রভৃতি। বঙ্গভাষায় গদ্যের সেই সবের আধুনিক যাত্রা। সেকালে তিনি পরিভাষার চিন্তাও করে গেছেন এবং নিজে এ বিষয়ে হাত লাগিয়েছেন। বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার যে ধ্বনি তুলেছিলেন কুদরাৎ-এ-খুদা ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর নানান প্রতিবন্ধকতার মধ্যে একটি যে পরিভাষা সমস্যা ছিল তার উল্লেখ অনেকেই করেছেন। অথচ তাঁদের বহু আগে দাঁড়িয়ে বিদ্যাসাগর এ বিষয়ে তাঁর সাধ্যমত পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, এই ছোট্ট কথাটুকু ভুলে গেলে চলবে না।

হাজার হোক, জীবনচরিত অনুবাদ গ্রন্থ। বিজ্ঞানের প্রতি

তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগের আর একটি প্রমাণ– 'বোধোদয়' গ্রন্থটি (প্রথম প্রকাশ ১৮৮১)। এটি পরিণত বয়সের লেখা। তাঁর জীবৎকালেই ৯৬টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে রয়েছে চেতন পদার্থ, ঈশ্বর, পদার্থ, মানবজাতি, পঞ্চ ইন্দ্রিয় (চোখ, কান, নাক, জিভ, ত্বক) প্রভৃতির কথা। গণনা–অঙ্ক, নানা বস্তুর বিজ্ঞানভিত্তিক বর্ণনা (যেমন ধাতু, সোনা, রূপা, পারদ, সীসা, তামা, লোহা, রাঙ, দস্তা প্রভৃতি)। হীরা, কাচ, ক্রয়–বিক্রয়, জল–নদী–সমুদ্র–উদ্ভিদ প্রভৃতি।

বর্ণনাগুলি পড়লে বিদ্যাসাগরের অন্য একটি গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর ছিল প্রখর বাস্তববোধ। বইটিতে রয়েছে কৃষিকর্ম, শিল্প–বাণিজ্য–সমাজের কথাও।

আরও একটি ব্যাপার লক্ষণীয়। যখন তাঁর বর্ণনার কোনও ভুল কেউ দেখিয়ে দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা সংশোধন করেছেন এবং যাঁরা ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এঁদের মধ্যে যেমন আছেন মুসলমান শ্রীযুক্ত মহম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহম্মদ মহাশয়, তেমনই আছেন ডাক্তার চন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয় প্রমুখ। একটি সংস্করণের বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করেছেন ওঁদের নাম। এতে মনে হয়, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি হতেও তিনি মুক্ত ছিলেন।

আপাদমস্তক বিজ্ঞানের বই 'বোধোদয়'

বোধোদয় বিদ্যাসাগরের বিজ্ঞান–নির্ভর আর একটি পুস্তক। আগেই বলেছি এটিতে ভৌতবিজ্ঞান, গণিত, জীবনবিজ্ঞান, ভূগোলবিদ্যা ইত্যাদিরই প্রাধান্য। বিদ্যাসাগর ভেবেছিলেন এমন পাঠ্যই প্রয়োজনীয়। সে পাঠ্যে আছে পদার্থ, চেতন পদার্থ, মানবজাতি, স্বপ্ন, মৃত্যু, শিক্ষা, ইন্দ্রিয়, বাক্যকথন–ভাষা, কাল, গণনা–অঙ্ক, বর্ণ, বস্তুর আকার পরিমাণ, ধাতু, হীরক, কাচ, ক্রয়বিক্রয় মুদ্রা, জল–নদী–সমুদ্র, উদ্ভিদ, ইতর জন্তু, কয়লা, কৃষিকাজ প্রভৃতির কথা। পাঠ্য হিসেবে সে সময়ে এ একেবারে

যুগান্তকারী পরিবর্তন। এ-কথা মনে রাখা ভালো বোধোদয় Rudiments of Knowledge থেকে নেওয়া হলেও তার অনুবাদ নয়। আর তা যে অন্য কল্পনাশ্রয়ী গল্প পাঠের চেয়ে উপকারের হবে সে বিষয়ে বিদ্যাসাগরের কোনো সংশয় ছিল না। তাই, বোধোদয়-এর বিজ্ঞাপনে ঈশ্বরচন্দ্রকে লিখতে দেখি-

'বোধোদয় নানা ইঙ্গরেজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত হইল, পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে। যে কয়টি বিষয় লিখিত হইল, বোধ করি, তৎপাঠের অমুলক কল্পিত গল্পের পাঠ অপেক্ষা অধিকতর উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা।অল্পবয়স্ক সুকুমারমতি বালক বালিকারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেক, এই আশয়ে অতি সরল ভাষায় লিখিবার নিমিত্তে সবিশেষ যত্ন করিয়াছি; কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। মধ্যে মধ্যে অগত্যা, যে যে প্রচলিত দুরূহ শব্দের প্রয়োগ করিতে হইয়াছে, পাঠকবর্গে বোধসৌকার্য্যার্থে, পুস্তকের শেষে সেই সকল শব্দের অর্থ লিখিত হইল। অক্ষণে, বোধোদয় সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইলে, শ্রম সফল বোধ করিব।'

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা
কলিকাতা
২০ শেষ চৈত্র, সংবৎ ১৯০৭

গোপাল হালদার সম্পাদিত বিদ্যাসাগর রচনা সম্ভারের অন্তর্গত বোধোদয় প্রথমবারের বিজ্ঞাপন এমনটাই। প্রথমনাথ বিশী সম্পাদিত বিদ্যাসাগর রচনাসম্ভারের প্রথমবারের বিজ্ঞাপনটিও অনুরূপ।

দ্বিতীয় মুদ্রণের 'প্রথম বারের বিজ্ঞাপনের দ্বিতীয় বাক্যে' যে কয়টির পরিবর্তে 'যে কয়েকটি', 'অধিকতর উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা'র বদলে 'অনেক উপকার

দর্শিতে পারিবেক’ রয়েছে। তৃতীয় বাক্যে ‘বুঝিতে পারিবেক’ এর বদলে ‘বুঝিতে পারিবে’, ‘সবিশেষ যত্নের বদলে’ বিশেষ যত্ন রয়েছে। চতুর্থ বাক্যে ‘দুরূহ শব্দের প্রয়োগ’ বদলে হয়েছে ‘দুরূহ শব্দ প্রয়োগ’। ভাষাকে সরল করার যে বাসনা প্রতিনিয়ত তাঁর মধ্যে ছিল সেই জায়গা থেকেই প্রথমবারের বিজ্ঞাপনের এই সংশোধন তিনি নিজেই দ্বিতীয় মুদ্রণে করেছিলেন বলে ধারনা

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপনে তিনি লিখেছেন-

‘বোধোদয় প্রথমবার যে রূপ মুদ্রিত হইয়াছিল প্রায় তাহাই রহিল, কেবল কোন কোন স্থানে ভাষার কিছু পরিবর্ত্ত করা গিয়াছে, যে যে স্থানে ভুল ছিল সংশোধিত হইয়াছে আর সুসংলগ্ন করিবার নিমিত্ত কয়েকটী প্রকরণের ক্রম বিপর্য্যয় করা গিয়াছে।’

শ্রীঈশ্বরচন্দ্রে শর্ম্মা

কলিকাতা

১৯ এ ফাল্গুন। সংবৎ ১৯০৮

বোধোদয় এর প্রথম রচনা ‘পদার্থ’। বিশ্ব পদার্থময়। সুতরাং পদার্থ চেনানো গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে আসে চেতন অচেতন আর উদ্ভিদ এই তিন ধরণের পদার্থের কথা। এখন আমরা পদার্থকে জড় আর জীব এই দু-ভাগে ভাগ করি। উদ্ভিদ বিষয় তখনও নানা সংশয় মিটে যায়নি। তাই এই সাবধানী প্রয়াস তাঁর। পরে ‘চেতন পদার্থ’ বিষয়ে লেখাটি দীর্ঘ। সেখানে প্রাণীদের (জন্তু!) স্থলচর, জলচর, উভয়চর বিভাগ হয়। মানুষ যে বুদ্ধি ও ক্ষমতার গুণে সর্বপ্রধান প্রাণী তার উল্লেখ থাকে সযত্নে। তাদের খাদ্যসহ জীবনের অন্যান্য উপকরণ আলোচনায় আসে। আসে পাখির কথা, তাদের জীবনযাত্রা, মাছেদের কথা, সরীসৃপের কথা, ব্যাঙ-পতঙ্গ-মনকি আনুবীক্ষণিক ক্ষুদ্র কীটের কথাও। পরম যত্নে ছাত্র-ছাত্রীদের জানানো

হয় স্তন্যপায়ী জন্তুদের কথা। পাঠক জেনে যান বাদুড় উড়লেও পাখি নয়, চিংড়ি আর তিমি মোটেও মাছ নয়।

সবার কথা জানা হল কিন্তু বিশেষ করে জানা দরকার তো নিজেদের কথা। তাই 'মানবজাতি' রচনা উঠে আসে। সে রচনা মানুষের আর সমাজের নানা কথায় পূর্ণ। মানুষ যে সমাজ তৈরি করা ছাড়া থাকতে পারে না, আসে সে কথাও। পাঁচ ইন্দ্রিয় মানুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎস তাই তাদের বিস্তৃত আলোচনা বোধোদয়ে। আর সপ্ন। তার ব্যাখ্যা তখনও আসেনি বিদগ্ধ মহল থেকে। তাই এ আলোচনায় বিদ্যাসাগর স্পষ্ট আর নির্মম। 'স্বপপ অমূলক চিন্তামাত্র, কার্যকারক নহে'। তেমনি মৃত্যু রচনায় তাঁর বাস্তববাদী মন বলে ওঠে।

মরণের অবধারিত কাল নাই.. কেহই অমর নহে। সকলেই মরিতে হইবে। বস্তুর আকার আর পরিমাণ চর্চাও আছে বোধোদয়-এ, যা ভৌত বিজ্ঞানের অন্যতম পাঠ্য, সেখানে দৈর্ঘ্য, বিস্তা (প্রস্থ) ও বেধ (উচ্চতা) এর ধারণা সঙ্গে ভারী আর হাল্কা, উচ্চতা-গভীরতার জ্ঞানও সহজ ভাষায় রাখা আছে। মৌল বস্তু মাত্রই ধাতু বা অধাতু। আট রকম ধাতু বিষয়ে আলোচনা আছে বোধেদয়-এ- যেগুলিকে বলা হয়েছে প্রধান ধাতু। সেগুলি হল স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ, সীসা, র, লৌহ, বঙ্গ (বা টিন) এবং দস্তা। পারদ যে ধাতু হলেও তরল তা জানিয়ে দিতে ভুল হয়নি। দস্তা সম্পর্কে বলার সময় অ্যালয় বা সঙ্কর ধাতু সম্পর্কে ধারণাও দেওয়া হয়েছে। অ্যালয় হল নির্দিষ্ট অনুপাতে দুটি ধাতুর বিগলিত অবস্থায় সমস্বত্ব মিশ্রণ। পিতল হল দস্তা বা জিঙ্ক এবং তামা বা কপারের একটি অ্যালয়। 'তিন ভাগ দস্তা ও চারি ভাগ তামা মিশ্রিত করিলে পিতল হয়। তামায় যত শীঘ্র মরিচা ধরে, পিতলে তত শীঘ্র ধরে না একথা বোধোদয়-এরই।

বোধোদয়-এর রচনায় বিজ্ঞান শিক্ষার-ই প্রাধান্য। কিন্তু অবকাশ পেলে বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজ-দর্শনের শিক্ষা দিতেও তাঁর কলম পিছিয়ে থাকেনি। হীরক বিষয়ে আলোচনার কয়েকটি কথা উল্লেক করলে এই বক্তব্যের যথার্থতা বোঝা যাবে।

'এ পর্যন্ত যত বস্তু রহিয়াছে, হীরা সকল অপেক্ষা কঠিন... বিচেনা করিয়া দেখিলে হীরা অতি অকিঞ্চিতকর পদার্থ। ঔজ্জ্বল্য ব্যতিরিক্ত উহার আর কোনও গুণ নাই। কাচ কাটা বই আর কোনও বিশেষ প্রয়োজনে আইসে না, এরূপ একখণ্ড গৃহে রাখিবার নিমিত্ত অত অর্থ ব্যয় করা কেবল মনের অহঙ্কার প্রদর্শ ও মূঢ়তা মাত্র। ...ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যরে বিষয়, এই মহামূল্য প্রস্তর ও কয়লা, দুই ই এক পদার্থ।

বোধোদয়-এ ভুগোলবিদ্যার শিক্ষা রয়েছে অনেকটা জুড়েই। কাল, দিনরাত্রি, মাস, ঋতু, বৎসর প্রভৃতি যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে জল-নদী সমুদ্রের কথা। জোয়ার ভাটার কথা। রয়েছে জলচক্রের কথাও। পাথরিয়া কয়লা ও কেরাসিন তেলের মত সম্পদের কথা শিক্ষার্থীদের জানানোর সঙ্গে জানানো হয়েছে কৃষিকাজ তার গুরুত্ব আর কৃষিসম্পদের কথাও।

প্রাণিবিদ্যার বহু বিষয়র আলোচনা রয়েছে 'চেতন বস্তু' অংশে যা আগেই আলোচনা হয়েছে। কিন্তু উদ্ভিদবিদ্যার ও আলোচনা আছে বোধোদয়-এ। সেখানে ভোজী ও পরভোজী উদ্ভিদসহ ছত্রাকের কথাও সংযুক্ত রয়েছে। উদ্ভিদের উপকারী গুণগুলোর কথাও তুলে ধরা আছে। Medinical Plant এবং অ্যারোমেটিক প্ল্যান্টের গুরুত্ব আজ শুধু আমরাই অনুভব করছি তা নয়, বিদেশেও এর চর্চা হচ্ছে। বহু আগে আমাদের চরক-শুশ্রূতের সময়ে এই চর্চা গুরত্বপূর্ণ জায়গা পেয়েছিল। বোধেদয় সে ঐতিহ্যকে ভুলে যায়নি।

বিভিন্ন প্রাণি থেকে আমরা অর্থকরী উৎপাদন কী কি পেতে পারি তা নিয়ে আজকাল অর্থনৈতিক প্রাণিবিদ্যা বা 'ইকোনমিক জুলজি' বলে প্রাণিবিদ্যার একটি নতুন শাখা জন্ম নিয়েছে। আশ্চর্যের কথা বোধোদয়-এ তারও ছোঁয়া আছে। ইতর জন্তু আলোচনায় চামর, মুক্তো, লাক্ষা, রেশম, মধু, মোম প্রভৃতি পাওয়ার কথা সহজভাবেই এসেছে। দেড়শো বছর আগেও বিদ্যাসাগর এই বিষয়ে গুরুত্ব সমানভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন।

বোধোদয়ে তাই বজ্ঞান শিক্ষার নানা প্রসঙ্গে সচেতন পদচারণা। আর তারই সঙ্গে একজন সমাজসচেতন ঋজু পুরুষের ঐকান্তিক প্রয়াস, আগামী প্রজন্মকে বিজ্ঞানসচেতন করে তোলার।

বোধোদয়ের একটা সংক্ষিপ্ত ছবি আগের পাতাগুলোতে হয়ত তুলে ধরা হল। কিন্তু বিজ্ঞানের বিভাগ ধরে ধরে আরও আলোচনার অবকাশ আছে। গুণী পাঠক তাহলে সহজে বুঝতে পারবেন বিজ্ঞানের বিবিধ বিভাগে কী সাবলীল পদাচারণা ছিল তাঁর।

পদার্থ বিজ্ঞান

প্রথমে পদার্থ বিজ্ঞানের কথা ধরি। চেতন, অচেতন আর উদ্ভিদ এই তিনরকমের পদার্থের কথা বিদ্যাসাগর শুনিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু চেতন বা প্রাণিজগত আর উদ্ভিদজগত বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন আলোচনার বিভাগের বিভক্ত হবে। স্বভাবতই পদার্থবিজ্ঞানের পরিধিতে আসবে অচেতন বস্তু। তার আকার জানা দরকার, দরকার তার পরিমাণ কিংবা ওজন জানা। বিদ্যাসাগর তা জানাতে লিখছেন–

'সকল বস্তুরই দৈর্ঘ্য, বিস্তার, বেধএই তিন গুণ আছে। 'আর ওজন? তার কথা বলতে বোধোদয়ের পাতায় বিদ্যাসাগরের কলম লিখছে' বস্তুর ভারের পরিমাপক ওজন কহে। 'এই ওজন যে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের ক্ষেত্রে সম

আকারের হলেও ভিন্ন হবে, পদার্থের এই বিশেষ গুণটি বুঝিয়ে দিতে তাঁর ভুল হয়নি। বলেছেন,

'সমান সমান আকারের এক খণ্ড কাষ্ঠ অপেক্ষা এক খণ্ড লৌহ অধিক ভারী।'

বোধোদয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে একটি অধ্যায় 'বর্ণ রঙ'। সেখানে তিনি বলেন

'কি স্বাভাবিক, কী কৃত্রিম, উভয়বিদ পদার্থেরই নানা প্রকার বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যেখানে যত বর্ণ আছে সকলই তিনটি মাত্র মূল বর্ণ হইতে উৎপন্ন। সেই তিন মূল বর্ণ এই; নীল, পীত, লৌহিত। এই তিন মূলীভূত বর্ণকে যত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে মিশ্রিত করা যায় ততপ্রকার বর্ণ উৎপন্ন হয়। ঐ সকল বর্ণকে মিশ্র বর্ণ কহে। মিশ্র বর্ণের মধ্যে হরিত, পাঠল, ধূমল এই তিনটি প্রধান। নীল ও পীত এই দুই মূল বর্ণ মিশ্রত করিলে হরিত বর্ণ উৎপন্ন হয়। পীত ও লোহিত এই দুই মিশ্রিত করিলে পাটল বর্ণ হয়। নীল ও লোহিত এই দুই বর্ণের মিলনে ধূমল বর্ণ হয়।

এভাবেই মৌলিক রঙ ও যৌগিক রঙের এর পাঠ শেষ করে বিদ্যাসাগর যান মিশ্র রঙ বা টারসিয়ারী কালার বোঝাতে। বলেন,

'তদ্ভিন্ন কপিশ, ধুসর, পিঙ্গল ইত্যাদি নানা মিশ্র বর্ণ আছে। সেসকল ও ঐ তিন মূলীভূত বর্ণের মিশ্রণে উৎপন্ন হয়।'

আলোক বিজ্ঞানের পরের পাঠটি যেভাবে দ্বিতীয় সংস্করণে রয়েছে তা যথোচিত নয়। বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন,

'সৃষ্ট বর্ণের অভাব, অর্থাৎ যেখানে কোন বর্ণই নাই, সেই শুল্ক বর্ণ। আর নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারই কৃষ্ণবর্ণ।

বোধোদয়ের পরবর্তী সংস্করণে এই ভ্রম সংশোধন করে নিতে তাঁর ভুল হয়নি। সেখানে নতুন করে

'আলোর প্রকৃতি 'আলোর বিচ্ছুরণ' নামে নতুন নতুন অধ্যায়ে তাঁকে লিখতে দেখি। সত্যি সহজ সরল ভঙ্গিতে বিজ্ঞান পরিবেশন — আজ থেকে প্রায় ১৭৭ বছর আগে দাঁড়িয়ে।ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

বিদ্যাসাগরের বিজ্ঞানমনস্কতার অপর প্রমাণ ধর্মসম্পর্কে তাঁর একান্ত নিস্পৃহ মনোভাব। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাতের বিবরণ সবিস্তৃত লিপিবদ্ধ আছে শ্রী ম লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের দ্বিতীয় খণ্ডে। শ্রীরামকৃষ্ণ কোন রকমেই বিদ্যাসাগরের মুখ থেকে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনও স্থির বিশ্বাসভক্তির একটি কথাও আদায় করতে পারেনি। তিনি কোনও ধর্মযাজকের কাছে ঘেঁষেননি-মন্দিরে যাননি। পূজা-অর্চনা জপতপ করতেন না। কিন্তু ছিলেন মানবতায় উদ্বুদ্ধ দয়ার সাগর। এত সব সত্ত্বেও বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতাকে বলেছেন, রামকৃষ্ণের পরেই তাঁর গুরু বিদ্যাসাগর। এই প্রসঙ্গে কাশীর পাণ্ডাদের প্রতি তাঁর উত্তরও স্মরণীয়- 'সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা আমার জনক-জননী, তাঁদের প্রসাদ পাই, আমার বিশ্বনাথ দর্শণে বা গঙ্গা স্নানে কী প্রয়োজন? তবে কেউ কিছু মানলে তিনি আপত্তি করতেন না, শিবনাথ তো ছিলেন ব্রাহ্ম, তাঁকে ওই ধর্মমত থেকে দূরে সরিয়ে আনার কথা ভাবেননি। তাঁর চরিত্রে পরমত সহিষ্ণুতার এ এক উজ্জ্বল নির্দশন।

বিজ্ঞানমনস্ক মন কখনও কুসংস্কার বিশ্বাস করে না। বিদ্যাসাগরও কুসংস্কার তাড়াতে চেয়েছেন দেশের মানুষের মন থেকে।

২২ জানুয়ারি, ১৯৫১ বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হন। এর অল্প কয়েক মাস পরে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাড়াও কায়স্থরা কলেজে প্রবেশাধিকার পায়। আগে কলেজে পড়ার অনুমতি ছিল শুধু ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদের। এক বছরের ভিতর যে কোনও হিন্দুসন্তান কলেজে ভর্তি

হতে পারবে, এই মর্মে নিয়ম জারি করা হয়।

খলিফা ওমর নাকি গোঁড়ামির বশবর্তী হয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় গ্রন্থশালা পুড়িয়েছিলেন। ওই কাহিনি উল্লেখ করে পরিহাসছলে বিদ্যাসাগর বলছেন– 'ভারতীয় পণ্ডিতদের গোঁড়ামি ঐ আরব খলিফাদের গোঁড়ামির চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। ... ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতদের নতুন বৈজ্ঞানিক সত্য গ্রহণ করিবার কোন সম্ভাবনা আছে, এমন আমার বোধ হয় না।'

'বাঙালির ইতিহাস' গ্রন্থে একটি নৃশংস কুসংস্কার কিভাবে দূর হল বলছেন: 'বহুকাল অবধি ব্যবহার ছিল পিতামাতা গঙ্গাসাগরে গিয়া শিশুসন্তান সাগর জলে নিক্ষিপ্ত করিতেন। তাঁহারা এই কর্ম ধর্মবোধে করিতে বটে, কিন্তু ধর্মশাস্ত্রে ইহার কোন বিধি নাই। গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর এই নৃশংস ব্যবহার একেবারে উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত ১৮০২ সালের ২০ শে আগস্ট এক আইন জারী করিলেন ও তাহার পোষকতার নিমিত্ত গঙ্গাসাগরে একদল সিপাই পাঠাইয়া দিলেন। তদবধি এই নৃশংস ব্যবহার একবারে রহিত হইয়া গিয়াছে।

আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতি বিদ্যাসাগরের আস্থা এখানে সুপ্রকট। মৌলবাদীরা দেশকে যে পিছনের দিকে টানছে, সেই ধারণা তখনই হয়েছে তাঁর। কী ভাবে এর মোকাবেলা করা যেতে পারে, সে বিষয়েও তিনি তাঁর মত নিয়েছেন, এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। তিনি বলছেন: 'বাঙলাদেশে যেখানে শিক্ষা বিস্তার হচ্ছে সেখানেই পণ্ডিতদের প্রভাব কমে আসছে। দেখা যাচ্ছে বাঙালার আধিবাসীরা শিক্ষা লাভের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র।। ...জনসাধারণের জন্য শিক্ষা বিস্তার– এই এখন আমাদের প্রধান প্রয়োজন। ...মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ দখল প্রয়োজনীয় বহুবিদ তথ্যে যথেষ্ট জ্ঞান, দেশের কুসংস্কারের কবল

থেকে মুক্তি শিক্ষকদের এই গুণগুলি থাকা চই। ...সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা কলেজের পাঠ শেষ করে এই ধরণের লোক হয়ে উঠবে এমন আশা করবার যথেষ্ঠ কারণ আছে।'

বস্তুত শিক্ষাবিস্তারে তিনি তাঁর মনপ্রাণ সমর্পণ করেছিলেন এবং বাংলা ভাষায় শিক্ষা বিস্তার যাতে জনসাধারণের মধ্যে প্রসার লাভ করবে শিক্ষা। তিনি জানতেন, শিক্ষা বিস্তারের অর্থই হল কুসংস্কারের কালো হাত থেকে যুক্ত বিজ্ঞানের অগ্রগতির কারণ জনগণ ছিল বিজ্ঞান ও আধুনিক জীবনকে বরণ করে নেবার জন্য ব্যগ্র। শিক্ষার প্রসার ও প্রচারে নানা প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়েও তিনি একা যা করেছেন, তা আজকের দিনে বিস্ময়ের সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। বীরসিংহ গ্রামে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন ((১৮৫৩), নদিয়া, বর্ধমান, হুগলি মেদিনীপুরে ৫টি করে মডেল স্কুল স্থাপন করেছিলেন (১৮৫৫-৫৬)। স্ত্রীশিক্ষা প্রচারেও তার ভূমিকা অনুধাবনযোগ্য। হুগলি জেলায় ২০টি, বর্ধমানে ১১টি, মেদিনীপুরে ৩টি ও নদিয়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন (১৮৫৭-৫৮)। এছাড়া প্রতিষ্ঠা করেন মুর্শিদাবাদের কাঁদিতে ইংরেজি, বাংলা স্কুল (১৮৫৯)। মৃত্যুর এক বছর আগেও (১৮৯০) বীরসিংহ গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভগবতী বিদ্যালয়। সাঁওতাল পরগনার কর্মাটারে শেষ জীবনেও তিনি পাঠশালা চালাতেন সাঁওতাল পড়ুয়াদের নিয়ে। শিক্ষার অগ্রগতির জন্য তাঁর প্রায় একক প্রচেষ্টার এ এক আশ্চর্য নিদর্শন।

বাঙালি মেয়েদের মধ্যে সর্বপ্রথম এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন চন্দ্রমুখী বসু। বিদ্যাসাগর একপ্রস্থ শেকসপীয়ার গ্রন্থাবলী উপহার দিয়া তাঁকে একটি সুন্দর চিঠি লেখেন। এই রকম গুণ ও গুণীর সমাদর করতে তিনি জানতেন। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত হতে পেরেছেন কবি মধুসূদন। তিনি নিজে বাংলা গদ্যের

আদিপুরুষ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বাংলাভাষায় প্রথম যথার্থ শিল্পী। সেই সঙ্গে তাঁর উদ্যোগে পালিত হয়েছে আধুনিক বাংলা বাক্যের আবির্ভাব-মধুসুধনের কাব্যে। তাঁর বিজ্ঞান মনস্কতাই সাহিত্যের আধুনিকতার এই ধারাকে উস্কে দিয়েছেন।

বিদ্যাসাগরের বিজ্ঞান প্রীতির আর একটি প্রমাণ এখানে প্রশংস উল্লেখের দাবি রাখে। নিজের জীবনযাত্রায়, আচার-আচরণে বিদ্যাসাগর ছিলেন কিঞ্চিৎ কৃপণ। একটি ব্যাপারে কৃপণতা ছিল না বই সংগ্রহ। অত্যন্ত ভালভাবে বইগুলো বাঁধাতেন। এতই ছিল প্রতি মমতা। তার থেকেও বড়ো কথা ১৮৭০ সালের জানুয়ারিতে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভায় তিনি এক হাজার টাকা দান করেছিলেন। বিজ্ঞানকে মনেপ্রাণে ভালো না বাসলে এমনটি সম্ভব নয়।

সাহিত্যের লোক হয়ে তাঁর বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসা নজরে পড়ার মতো। এবং সে বিজ্ঞানের ক্ষেত্র বহুধাবিস্তৃত। বাংলা ভাষায় বলা যেতে পারে তিনি আদি বিজ্ঞান লেখক। আধুনিক বাংলা গদ্যের জন্মলগ্নেই তিনি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, বিজ্ঞানকে সাহিত্যে অন্বিত করেছেন। বিদ্যাসাগর চিকিৎসক ছিলেন না। কিন্তু জন-স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাঁর বিজ্ঞানভিত্তিক কতকগুলি ধারণা ছিল। আর ছিল মমতামাখা বিশাল হৃদয়। এর জন্যে প্রয়োজনের সময় তিনি বসে থাকতে পারেননি। কলেরা মহামারীর সময় কার্মাটারে সাঁওতালপল্লীতে তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন। এ সম্পর্কে পরে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন, খুব সম্ভবত তাঁর মনোভাবও ছিল তাই। রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে, তাঁর মত সাহিত্য-ডাক্তারকে দায়ে পড়ে ভিষক-ডাক্তার হতে হয়, লিখেছেন, ‘যাদের সাধ্যগোচরে কোথাও কোন চিকিৎসার উপায় নেই। তারা যখন কেঁদে এসে পায়ে ধরে পড়ে, তাদের তাড়িয়ে দিতে পারি, এত বড়ো নিষ্ঠুর শক্তি আমার নেই। এদের সম্বন্ধে

পণ করে বসতে পারি যে পুরো চিকিৎসক নই বলে কোন চেষ্টা করব না। আমাদের এই হতভাগ্য দেশে আধা চিকিৎসকদেরও যমের সঙ্গে যুদ্ধে আড়কাঠি দিয়ে সংগ্রহ করতে হয়। 'যে মনোভাবের উপর ভিত্তি করে বিদ্যাসাগর ওই সেবাব্রত করেছিলেন, জনস্বাস্থ্য কর্মী হিসেবে তাঁকে স্বাগত জানাতে হয়।

বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের জন্য তাঁর যে প্রচেষ্টা, তার অন্যতম একটি কারণ ছিল এই যে গোপণ ব্যভিচারের স্রোত বন্ধ হবে। জনস্বাস্থ্যের এটা একটা দিক তো বটেই। স্বাস্থ্য মানে শুধু শারীরিকভাবে সুস্থ থাকাই নয়, মানসিকভাবেও সুস্থ থাকা। সামাজিকভাবে সুস্থ থাকা।

তাছাড়া তিনি অবশ্যই চেয়েছিলেন স্ত্রীজাতির দুঃখ লাঘব করতে। সমানাধিকার যদি স্ত্রী ও পুরুষের না থাকে, তাহলে কখনই সে জাতির স্বাস্থ্য ভাল হতে পারে না। এই জন্য বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বহু বিবাহ রদ করবার জন্যও আন্দোলন করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বঙ্কিমচন্দ্রের মত উচ্চশিক্ষিত সাহিত্যিকও বরাবর বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আইনের ও বহু বিবাহ নিরোধক প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। সমাজের কুপ্রথার শিকড় কত দূর পর্যন্ত গেড়ে বসতে পারে এবং তা উপড়ে ফেলা কত শক্ত, এ তার একটা প্রমাণ।

'সর্ব শুভঙ্করী'-তে বিদ্যাসাগরের প্রথম সামাজিক লেখা 'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রকাশিত হয়। জন স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে নাতিদীর্ঘ এই প্রবন্ধটি অত্যন্ত মূল্যবান এবং তাঁর প্রখর বিজ্ঞানমনস্কতা ও বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় দেয়।

'সর্ব শুভঙ্করী' নামে একটি সভা ছিল। তাঁর মুখপত্রেরও নাম ছিল সর্ব শুভঙ্করী। ১৮৫০ সালে ওই পত্রিকায় 'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগরের নাম না থাকলেও তাঁর জীবনীকার ও গবেষকগণ একবাক্যে

স্বীকার করেছেন লেখাটি বিদ্যাসাগরের। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন মতিলাল চট্টোপাধ্যায় এবং বিদ্যাসাগর ছিলেন প্রেরণার উৎস।

বিদ্যাসাগরের প্রথম সামাজিক প্রবন্ধটি সম্বন্ধে অন্য একটি বক্তব্য আছে। বিধবা বিবাহ বিষয় নিয়ে লেখার আগে তিনি এই প্রবন্ধটি লিখেছেন। এটি একাধারে সমাজসংস্কারমূলক ও জন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত লেখা। জন-স্বাস্থ্য আন্দোলনে এখনও এ লেখা একটি অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে কাজ করতে পারে।

বাল্যবিবাহের দোষ সম্পর্কে তাঁর প্রথম বক্তব্যে, নারী-পুরুষ উভয়েই, শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়, অন্যদিকে মন যায়, নিজের নিজর জীবন গঠন করতে পারে না। আপনার ভাগ্য জয় করবার সাধনায় ব্রতী হতে পারে না। তাদের মেধা, শক্তি, ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ হয় না। তিনি লিখেছেন, ‘নব বিবাহিত বালক বালিকারা পরস্পরের চিত্তরঞ্জনার্থে রসালাপ, বিদগ্ধতা, বাক্চাতুরী, কামকলাকৌশল প্রভৃতির অভ্যাসকরণে ও প্রকাশকরণে সর্বদা সযত্ন থাকে, এবং তদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপায় পরিপাটী পরিচিন্তনেও তৎপর থাকে, সুতরাং তাহাদিগের বিদ্যালোচনার বিষম ব্যাঘাত জন্মিবাতে সংসারের সারভূত বিদ্যাধনে বঞ্চিত হইয়া কেবল মানুষের আকারমাত্রধারী, বস্তুঃ প্রকৃতরূপে মনুষ্য গণনায় পরিগণিত হয় না’

দ্বিতীয় আপত্তি তাঁর স্বাস্থ্যের হানি:’ সকল সুখের মূল যে শারীরিক-স্বাস্থ্য, তাহাও বাল্যপরিণয় প্রযুক্ত ক্ষয় পায়। ফলতঃ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আমদ্দেশীয় লোকেরা যে শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যে নিতান্ত দরিদ্র হইয়াছে, কারণ পরিশেষে বাল্যবিবাহই ইহার মূল কারণ নির্ধারিত হইবেক সন্দেহ নাই।’

বিদ্যাসাগর বলেছেন: ‘আমদ্দেশীয়রা ভূমণ্ডলস্থিত প্রায় সর্বজাতি অপেক্ষা ভীরু, ক্ষীণ, দুর্বল স্বভাব এবং

অল্প বয়সেই স্থবিরদশাপন্ন হইয়া অবসন্ন হয়, যদ্যপি এতদ্বিষয়ে অন্যান্য সামান্য কারণ খুঁজিলে করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিলে ইহাই প্রতীতি হইবে যে, বাল্যবিবাহই এ সমুদায়ের মুখ্য কারণ হইয়াছে। পিতামাতা সকল ও দৃঢ়শরীর না হইলে সন্তানরা কখন সবল হইতে পারে না যেহেতু ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, দুর্বল কারণ হইতে সবল কার্যের উৎপত্তি কদাপি সম্ভব না।'

তৃতীয়ত মনের ঐক্য ওই বয়সে সম্ভব নয়। অথচ, 'মনের ঐক্যই প্রণয়ের মূল। সেই ঐক্য বয়স, অবস্থা, রূপ, গুণ, চরিত্র, বাহ্যভাব ও আন্তরিকভাব ইত্যাদি নানা কারণের উপর নির্ভর করে।বালদম্পতিরা পরস্পরের আশয় জানিতে পারিল না, অভিপ্রায় অবগান করিতে অবকাশ পাইল না, অবস্থার পাইল না, আলাপ পরিচয়ের দ্বারা ইতরেতর চরিত্র পরিচয়ের কথা দূরে থাকুক... এই জন্যই আমদ্দেশে দাম্পত্যনিবন্ধন অকপট প্রণয় প্রায় দৃষ্ট হয় না, কেবল প্রণয়ী ভরভা স্বরূপ এবং প্রণয়িনী গৃহপরিচালিকা স্বরূপ হইয়া সংসার যাত্রা নির্বাহ করে।'

চতুর্থত বালদম্পতিদের উপার্জন ক্ষমতার জন্ম হতে না হতে সন্তানের জন্মদাতা হতে হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় অর্থের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হতে হয়। তখন তারজন্য নানা দুষ্কৃতির শরণাপন্ন হতে হয়। নানা অপকর্মের জাল জড়িয়ে পড়তে হয়। সন্তানদের ভার বোধ হয়।

পঞ্চমত তাঁর মতে বাল্যবিবাহ রদ হলে অল্প বয়সে মৃত্যুর হার অনেক কমবে, কমবে বাল্যবিধবার সংখ্যাও: 'কত বয়সে মনুষ্যদিগের মৃত্যু ঘটনার অধিক সম্ভাবনা, যদি আমরা এই বিষয়ের আলোচনা করি, তবে অবশ্যই প্রতীতি হইবে। মানুষের জন্মকাল অবদি বিংশতিবর্ষ

বয়স পর্যন্ত মৃত্যুর অধিক সম্ভাবনা। অতএব, বিংশতি বর্ষ অতীত হইলে যদ্যপি উদ্বাহকর্ম নির্বাহ হয়, তবে বিধবার সংখ্যাও অধিক হইতে পারে না।'

বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনই হোক, বহুবিবাহ রোধ বা বাল্যবিবাহ রোধের ব্যাপারই হোক, সবটাই এসেছে তাঁর স্ত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধাসম্ভ্রম থেকে, তাঁদের বিড়ম্বিত জীবন তাঁকে কাঁদিয়েছে, সখেদে তাই তিনি বলেছেন 'হা অবলাগণ তোমরা কী পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না।'

বিদ্যাসাগরের রচনায় কতকগুলি স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে জন-স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কিছু বিষয় আছে।

'মানবজাতি' প্রবন্ধে (বোধোদয়) আছে: 'প্রাণিগণ যখন সচ্ছন্দ শরীরে আহারবিহার করিয়া বেড়ায়, তখন তাহাদিগকে সুস্থ বলা যায়; আর যখন তাহাদের পীড়া হয়, সচ্ছন্দে আহারবিহার করিতে পারে না, সর্বদা শুইয়া থাকে, ওই সময় তাহাদিগকে অসুস্থ বলে।'

ওই প্রবন্ধে আছে, অসাবধানতার জন্য মানুষের পীড়া হতে পারে, অসুখ হলে চিকিৎসক দেখান উচিত। তাঁহাদের কথামত চললে ত্বরায় রোগমুক্তি সম্ভব। তা না হলে বিস্তর ক্লেশ, তাহাদের মধ্যে অনেকে মরে যায়।

আবার ওই প্রবন্ধের অন্যত্র 'মরণের অবধারিত কাল নাই, অনেকে প্রায় ষাট বৎসরের মধ্য মরিয়া যায়। যাহারা সত্তর, আশি, নব্বই অথবা একশত বৎসর বাঁচে, তাহাদিগকে লোকে দীর্ঘজীবী বলে। কিন্তু অনেকেই শৈশবকালে মরিয়া যায়।' শৈশবে তখন অনেকের মৃত্যু হত।

বোধেদয়ে কয়েকটি ইন্দ্রিয়ের সহজ সরল সর্বজনবোধ্য বর্ণন আছে যেমন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। বোধোদয়ের উদ্ভিদ প্রবন্ধ 'কতকগুলি বৃক্ষের ছালে আমাদের অনেক উপকার হয়।...আমেরিকার পেরু প্রদেশস্থ সিঙ্কোণা নামক বৃক্ষের ত্বক সিদ্ধ করিলে যে ক্লাথ হয়, তাহা হইতে কুইনাইন উৎপন্ন হয়। ইদানীং দার্জিলিঙ

অঞ্চলে সিঙ্কোণার চাষ হইতেছে।'

বলা বাহুল্য, সে যুগে ম্যালেরিয়ার একমাত্র চিকিৎসা ছিল কুইনাইন। ওই প্রবন্ধেই আছে, 'অসুখের সময় রোগীকে যে এরোরুট পথ্য দেওয়া হয়, তাহা হরিদ্রাজাতীয় এক প্রকার বৃক্ষের মূল হইতে উৎপন্ন।' বার্লি, এরোরুট প্রভৃতি ওই সময় রোগীর পথ্য হিসাবে বহুল প্রচলিত ছিল।

পরিশ্রমের গুণগাণ করেছেন বোধোদয় এর আর একটি প্রবন্ধ। লিখেছেন: 'বালকগণের উচিত, বাল্যকাল অবধি পরিশ্রম করিতে অভ্যাস করে, তাহা হইলে বড়ো হইয়া অনায়াসে সকল কর্ম করিতে পারিবে।'

জন্তুকে ক্লেশ দেওয়া অন্যায়। এরকম একটি পাঠ আছে বর্ণ পরিচয় দ্বিতীয় ভাগে: 'সুরেন্দ্র শুনিয়া অতিশয় লজ্জিত হইল এবং কহিল, মহাশয়! আমি আর কখনও কোনও জন্তুকে ঢেলা মারিব না।'

বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগে তিনি শেখাচ্ছেন: 'আমি মুখ ধুইয়াছি।' দিন শুরু করা পরিচ্ছন্নতার মধ্যে দিয়ে। সকালে ওঠা অভ্যাসটি করতে পারলে ভাল:

'আর রাতি নাই। ভোর হইয়াছে। আর শুইয়া থাকিব না। উঠিয়া মুখ ধুই। মুখ ধুইয়া কাপড় পরি।'

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় নবজাগরণ না হলেও মধ্যবিত্তের বিজ্ঞান ও বুদ্ধি চর্চার জগতে তাদের সমস্ত দ্বিধা ও দ্বন্দের মধ্যে উজ্জ্বলতম সাফল্য বিদ্যাসাগর — এতে কোন সন্দেহ নেই।

Reference :
Haldar, Gopal. (1998) [1982]. 'I. C. Vidyasagar: Realist and Humanist' . In Bishop, Donald H. (ed.). Thinkers of the Indian Renaissance
Nineteenth-Century Colonialism and the Great Indian Revolt
Universalisation of Education: India in a Trap
বিদ্যাসাগর রচনাবলী

লেখাটি সামহ্যোয়ার ইন ব্লগে প্রকাশিত।



মহান বিজ্ঞানী শ্রী জগদীশচন্দ্র বসু

মৃত্যুর সামান্য কিছুকাল আগে আজীবন সঞ্চিত ১৭ লক্ষ টাকার মধ্যে ১৩ লক্ষ টাকা তিনি নিজের প্রতিষ্ঠিত 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' -কে দান করে যান... **রাজেশ রাজু বাউরী**

নিজেদের স্বভাবের জন্য বাঙালির ঘরকুনো অপবাদ থাকলেও, কিছু বাঙালিদের দেখলেই বোঝা যায় যে তারা বহুমুখী প্রতিভা অধিকারী। এমনই এক প্রতিভাবান প্রখ্যাত বাঙালি হলেন শ্রী জগদীশচন্দ্র বসু - একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি বিজ্ঞানী।

আধুনিক ভারতের বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক গোপালকৃষ্ণ গোখলে এক সময় বলেছিলেন যে 'What Bengal thinks today, India thinks tomorrow.' তাঁর এই মন্তব্যের পিছনে কাজ করেছিল তৎকালীন বাঙালি সমাজের অভূতপূর্ব সমৃদ্ধ রূপ। সেই সময় বাঙালি বিভিন্ন দিক থেকে সমগ্র ভারতবর্ষকে নেতৃত্বদানে এগিয়ে এসেছিল।

সময়ের প্রয়োজনে সেই সময় বাংলার বুকে আবির্ভাব

হয়েছিল এমন অসংখ্য ধূমকেতুর, যারা বাংলা তথা বাঙালির গৌরবকে ভারতবর্ষের সমাজে এক সুউচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ বা সমাজ সংস্কারক, কেউ বা দার্শনিক, কেউ বিপ্লবী, আবার কেউ বৈজ্ঞানিক। সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে আপন প্রতিভার বহুমুখী বিকাশের মাধ্যমে সমগ্র সমাজকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। সমকালীন বাংলার বুকে জন্ম হয়েছিল এমনই এক কৃতী বিজ্ঞানীর – শ্রী জগদীশচন্দ্র বসু। তাঁর প্রতি বাংলা তথা সমগ্র বিশ্বের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। বাংলার এই মহামানবের প্রতি নিবেদন করি পরম শ্রদ্ধার্ঘ।

শ্রী জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম হয় ১৮৫৮ সালের ৩০শে নভেম্বর তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির পূর্বপ্রান্তে বা অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত ময়মনসিংহ গ্রামে। তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় তাঁর জন্মস্থান ময়মনসিংহের জেলা স্কুল থেকে। এর পর তৎকালীন কলকাতার হেয়ার স্কুলে দীর্ঘদিন পড়াশোনা করে ১৮৭৯ সাল নাগাদ তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি.এ. পাস করেন। স্নাতক স্তরের পড়াশোনা করবার সময়ই 'ইউজিন ল্যাফন্ট' নামে একজন খ্রিস্টান যাজক, প্রকৃতি বিজ্ঞানের উপর জগদীশচন্দ্র বসুর উৎসাহ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেন। যদিও স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পূর্ণ করবার পর ১৮৮০ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনার জন্য তিনি লন্ডনের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান। পরবর্তীকালে লন্ডনেই ভগ্নিপতি আনন্দমোহন বসুর সাহায্যে তিনি প্রকৃতি বিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষালাভের জন্য কেমব্রিজের ক্রাইস্টচার্চ কলেজে ভর্তি হন। এরপর ১৮৮৪ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি নিজের বি.এস. সি.-র পড়াশোনা সম্পন্ন করেন।

জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর কর্মজীবনে প্রবেশ করেন একজন শিক্ষক হিসেবে। বি.এস.সি.-র পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরে আসার পর তৎকালীন ভারতের

গভর্নর জেনারেল 'রিপনে'র অনুরোধে জগদীশচন্দ্র বসুকে প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করা হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার সময়েই, অনেক বাধার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত গবেষণাকর্ম শুরু হয়। এই সময়ে মাত্র ২৪ বর্গফুটের একটি ছোট্ট ঘরে তাঁকে নিজের গবেষণা চালাতে হত। তা সত্ত্বেও তিনি কখনো নিজের গবেষণার কাজে অমনযোগী হয়ে পড়েননি। প্রতিদিন অধ্যাপনার পর তিনি যতটুকু সময় পেতেন, ততটুকুই গবেষণার কাজে ব্যয় করতেন। চরম অর্থ-সংকট এবং অন্যান্য প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়েও জগদীশচন্দ্র বসু যেভাবে বিজ্ঞানের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তা সারা পৃথিবীর কাছে উদাহরণস্বরূপ হয়ে রয়েছে।

তাঁর অসংখ্য গবেষণাকর্মগুলির মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল তাঁর বেতার সংক্রান্ত গবেষণা। আমরা বর্তমানে যে ৪জি কিংবা ৫জি প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকি, তার ভিত্তিপ্রস্তর রচনা করেছিলেন শ্রী জগদীশচন্দ্র বসু। বিশ্বে তিনিই প্রথম অতি ক্ষুদ্র বেতার তরঙ্গ সৃষ্টি করতে এবং কোন 'তার' ছাড়া এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তা প্রেরণ করতে সক্ষম হন। তিনি তাঁর ক্ষুদ্র গবেষণাগারে প্রায় ৫ মিলিমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বেতার তরঙ্গ সৃষ্টি করেন। এই বেতার তরঙ্গই হল বর্তমানকালে সর্বক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ বা মাইক্রোওয়েভ।

আধুনিক যুগে টেলিভিশন, রাডার কিংবা মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে এই তরঙ্গকে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়। এই তরঙ্গকে কাজে লাগিয়ে তিনি সর্বপ্রথম বেতার-যন্ত্র তৈরি করতে সক্ষম হন। তবে তিনি তাঁর এই আবিষ্কারকে অর্থ উপার্জনের জন্য ব্যবহার করতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন তার আবিষ্কার সমগ্র বিশ্ববাসীর উপকারে আসুক। সে কারণে এই আবিষ্কারের পেটেন্ট নেবার জন্য তিনি কোনদিন আবেদন করেননি।

জগদীশচন্দ্র বসুর অন্যান্য বিভিন্ন গবেষণার মধ্যে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হল তাঁর উদ্ভিদ সংক্রান্ত গবেষণা। এই গবেষণার জন্য পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রী জগদীশচন্দ্র বসুর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে গেছে। ছেলেবেলা থেকেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ উৎসাহ থেকে তিনি একজন বৈজ্ঞানিকের চোখ দিয়ে উদ্ভিদ জগতকে পর্যবেক্ষণ করতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনাকালে উদ্ভিদদের পর্যবেক্ষনের উদ্দেশ্যে তিনি একটি বিশেষ যন্ত্র 'ক্রেস্কোগ্রাফ' আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্রের দ্বারা দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জগদীশচন্দ্র বসু প্রমাণ করেন যে উদ্ভিদ উত্তেজনায় সাড়া দেয়। তাদেরও আনন্দ, দুঃখ, কষ্ট, আবেগ-অনুভূতি ইত্যাদি রয়েছে। এছাড়া তাঁর উদ্ভিদ সংক্রান্ত গবেষণাগুলির মধ্যে উদ্ভিদের অন্তঃকলা সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণগুলিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জীবনব্যাপী অসংখ্য উল্লেখযোগ্য গবেষণাকর্মের জন্য শ্রী জগদীশচন্দ্র বসু পৃথিবীর বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণ লাভ করেছিলেন। এইগুলির মধ্যে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন এবং রয়াল ইনস্টিটিউশনে তাঁর দেওয়া বক্তৃতাগুলি সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। তাঁর এই বক্তৃতা সম্বন্ধে স্পেক্টেটর পত্রিকায় লেখা হয়েছিল 'একজন খাঁটি বাঙালি লন্ডনে সমাগত, চমৎকৃত ইউরোপীয় বিজ্ঞানীমন্ডলীর সামনে দাঁড়িয়ে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের অত্যন্ত দুরূহ বিষয়ে তিনি বক্তৃতা দিচ্ছেন- এ দৃশ্য অভিনব।'

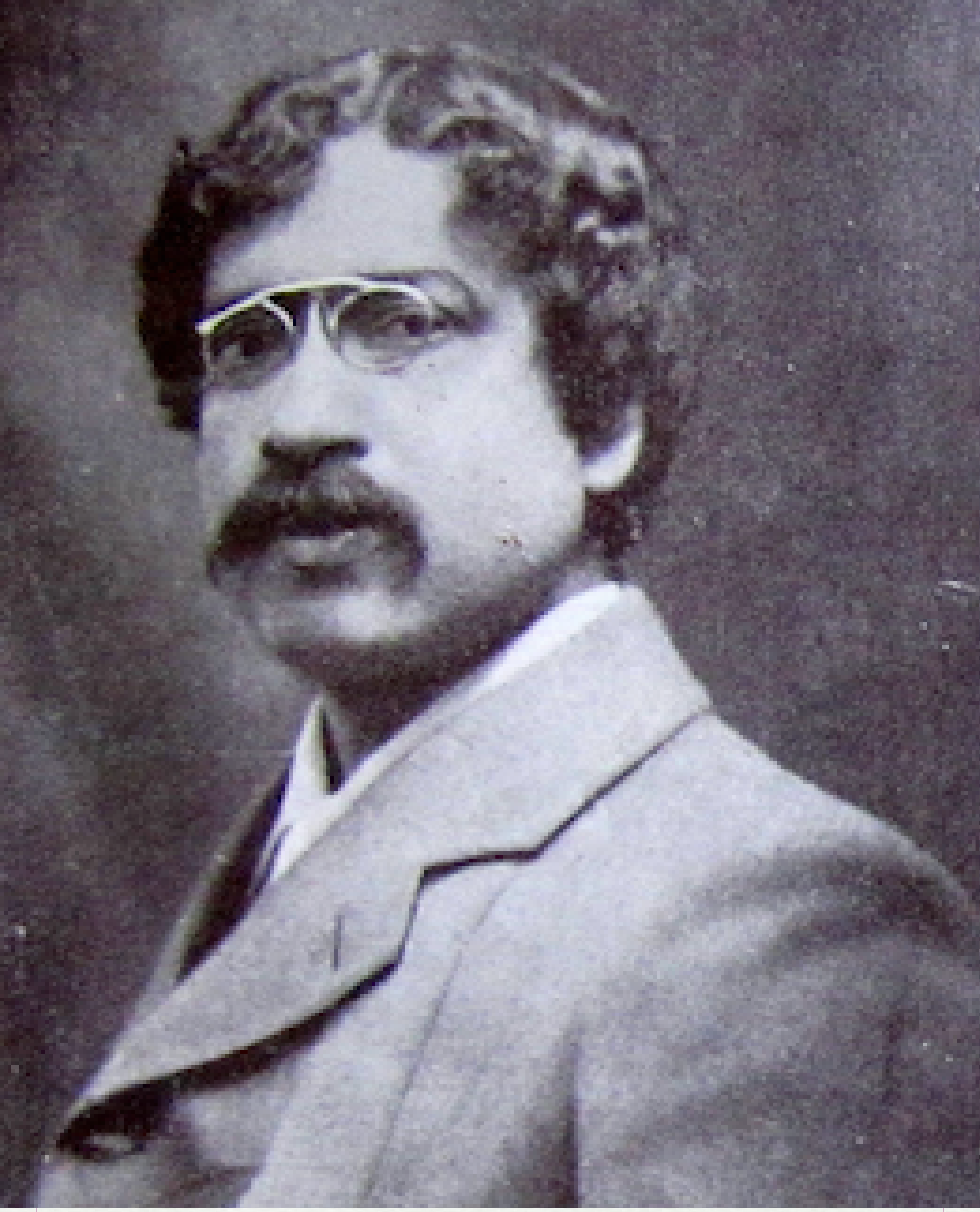
১৯৩৭ সালের ২৩ নভেম্বর অধুনা ভারতবর্ষের ঝাড়খন্ড রাজ্যের গিরিডিতে বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী আচার্য শ্রী জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনাবসান ঘটে। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বকাল পর্যন্ত তিনি বিজ্ঞান তথা জাতির সেবায় কাজ করে গিয়েছেন। মৃত্যুর সামান্য কিছুকাল আগে আজীবন সঞ্চিত ১৭ লক্ষ টাকার মধ্যে ১৩ লক্ষ টাকা তিনি নিজের

প্রতিষ্ঠিত ‘বসু বিজ্ঞান মন্দির’ -কে দান করে যান।

এখন তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু ওনার আবিষ্কারগুলির সুফল পৃথিবী এখনও ভোগ করে চলেছে। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, শ্রী জগদীশচন্দ্র বসুর মতন বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিকদের কোনদিন মৃত্যু হয় না। তারা বেঁচে থাকেন তাদের বিজ্ঞান চর্চায়, তাদের আবিষ্কারে, তাদের সৃষ্টিতে।

“মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনে ঈশ্বরের কোনও ভূমিকা নেই। মহাবিশ্ব পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হয়েছে। মহাবিশ্বের উৎপত্তি এবং অস্তিত্বের ব্যাখ্যায় ঈশ্বরের আমদানি একেবারে হাস্যকর।”

—স্টিফেন হকিং



জগদীশ চন্দ্র বসু এর জগদীশ চন্দ্র বসু হয়ে উঠা

তার আগেই বেতার যন্ত্র তৈরি করেছিলেন বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু। বাঙালি বলেই জগদীশ চন্দ্র আবিষ্কারকের মর্যাদা পাননি, পশ্চিমাদের এটা একটা চালবাজি ছিল– এ ধরনের একটা ষড়যন্ত্র তত্ত্ব চালু আছে। কিন্তু আসলেই কী তাই?...**দিব্যময়ী তনুশ্রী সরকার**

জগদীশ চন্দ্র বসু ভারতের বিজ্ঞানচর্চার জনক। তাকে ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসে একজন অমর পুরুষ বলা হয়। এই মহামানবের জন্ম আধুনা বাংলাদেশে।জগদীশ চন্দ্র বসু ১৮৫৮ সালের ৩০শে নভেম্বর ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি (বর্তমান বাংলাদেশ) অঞ্চলের মুন্সীগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন । তার ছোটোবেলার লেখাপড়া আধুনা বাংলাদেশে হয়। ইংরেজ সরকারের অধীনে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা থাকা সত্ত্বেও তার পিতা ভগবান চন্দ্র নিজের ছেলেকে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করাননি । তিনি মনে করতেন ইংরেজি শেখার আগে এদেশীয় ছেলে-মেয়েদের মাতৃভাষা আয়ত্ত্ব করা উচিত । হাস্যকর ব্যাপার হচ্ছে আজকালকার ছেলেমেয়ে ইংরেজিতে এত প্রাধান্য দেওয়ায় মাতৃভাষাই ভুলে যাচ্ছে যাইহোক সে কথা আর নাই বা তুলি। বসু সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বিএ পাশ করেই এই কলেজে ইউজিন ল্যাফন্ট নামক একজন খ্রিষ্টান যাজক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ওপর তার আগ্রহ বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

আগেই বলি ওনার অর্ধাঙ্গীনির কথা, ১৮৮৭ সালে জগদীশচন্দ্র বসুর সাথে অবলার বিয়ে হয়। অবলা ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের বিখ্যাত সংস্কারক দুর্গামোহন দাশের কন্যা। বিয়ের আগে অবলা বসু কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে চাইলেও তাকে ভর্তি হতে দেয়া হয়নি, কারণ সেখানে তখন মেয়েদের পড়ানো নিষেধ ছিল। ১৮৮২ সালে বঙ্গ সরকারের বৃত্তি নিয়ে অবলা মাদ্রাজে যান পড়াশোনার উদ্দেশ্যে। অবলা অবশেষে চিকিৎসক হয় যেটা তার স্বামী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হয়ত জগদীশ চন্দ্র বসু চিকিৎসক হননি জন্য আজ আমরা সবাই তাকে এই জগদীশ চন্দ্র বসু রূপে চিনি।

জগদীশ চন্দ্র বসু এর আবিষ্কার নিয়ে কথা বলা যাক:

১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে জগদীশ চন্দ্র লেখাপড়া শেষ করে

ভারতে ফিরে আসেন। তৎকালীন ভারতের গভর্নর-জেনারেল জর্জ রবিনসন, প্রথম মার্কুইস অব রিপনের অনুরোধে স্যার অ্যালফ্রেড ক্রফট বসুকে প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। কলেজের অধ্যক্ষ চার্লস হেনরি টনি এই নিয়োগের বিপক্ষে ছিলেন। শুধু যে তাকে গবেষণার জন্য কোন রকম সুবিধা দেওয়া হত না তাই নয়, তিনি ইউরোপীয় অধ্যাপকদের অর্ধেক বেতনেরও কম অর্থ লাভ করতেন। বেশ কিছু দিন বসু বিনা বেতনে কাজ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে গবেষণার কোন রকম উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা না থাকায় ২৪-বর্গফুট (২.২ মি২) এর একটি ছোটো ঘরে তাকে গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে হত। অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তাকে।

জগদীশচন্দ্র ক্রেসকোগ্রাফ যন্ত্র বানায়। এতে গ্রাফিক্যালি দেখান যে, প্রাণীর মত উদ্ভিদও উত্তেজনায় সাড়া দেয়। শুধু দেয় এটা দেখিয়েই ক্ষান্ত হননি তিনি। কতটা আঘাতে কতটা সাড়া দেয় (মানে মানুষ হলে চিমটি কাটা আর মারধোরের সাড়া এক হবে না) সেটাও দেখান। ভাবলেই বোঝা যাবে কী অভূতপূর্ব এই আবিষ্কার। তো জগদীশচন্দ্র এই আবিষ্কার বিজ্ঞানীরা বলেন Plant perception বা সংবেদনশীলতা।

এইবার বেতার নিয়ে কথা বলা যাক:

রেডিও বা বেতার যন্ত্রের আবিষ্কারক হিসেবে মার্কনির নাম জানে সবাই। কিন্তু তার আগেই বেতার যন্ত্র তৈরি করেছিলেন বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু। বাঙালি বলেই জগদীশ চন্দ্র আবিষ্কারকের মর্যাদা পাননি, পশ্চিমাদের এটা একটা চালবাজি ছিল-এ ধরনের একটা ষড়যন্ত্র তত্ত্ব চালু আছে।

কিন্তু আসলেই কী তাই?

জগদীশ চন্দ্র বসু গবেষণা করেছিলেন ক্ষুদ্র বিদ্যুৎচুম্বক তরঙ্গ বা মাইক্রোওয়েভ নিয়ে।

পরীক্ষাগারে তিনিই প্রথম ক্ষুদ্র বিদ্যুৎচুম্বক তরঙ্গ আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। আরও চেষ্টা করছিলেন ক্ষুদ্র তরঙ্গকে রেডিও বা বেতারযন্ত্রের সাহায্যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পাঠাতে। অবশেষে ১৮৯৪ সালে সফল হয় তাঁর সেই চেষ্টা। ১৮৯৬ সালে ইংল্যান্ডের রয়্যাল সোসাইটির এক সভায় যোগ দেন জগদীশ চন্দ্র বসু। সেই সভায় বেতারে বার্তা প্রেরণ করে তাঁর কাজের প্রমাণ দেখান।

এর এক বছর পর পর ইতালিয়ান বিজ্ঞানী মার্কোনিও একটা বেতারযন্ত্র তৈরি করেন। অনেকে মনে করেন জগদীশ চন্দ্র বসুর যন্ত্রটার নকল করেছিলেন তিনি। আসলে তা নয়। সেই সময় বেতার যন্ত্র নিয়ে অনেকেই কাজ করেছিলেন। জগদীশ চন্দ্র বসু আর মার্কোনি তাঁদের অন্যতম।

ইউরোপের এক বিখ্যাত ইলেকট্রনিক কোম্পানি জগদীশ বসুর বেতারযন্ত্রের নকশাটা কিনতে চায়। কিন্তু তিনি সেটা বিক্রি করতে রাজি হননি। এর কিছুদিন পরেই মার্কনিও তার বেতারযন্ত্র তৈরি করেন। তখন সেই ইলেকট্রনিকস কোম্পানি মার্কনির যন্ত্রের নকশাটা কিনে নেয়। ফলে মার্কনির তৈরি বেতারযন্ত্রই ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে। আবিষ্কারকের মর্যাদা তিনিই পেয়ে যান তিনি।

জগদীশ চন্দ্র বসুকে মর্যাদা দিতে গিয়ে আমরা ষড়যন্ত্রের যে কথা বলি, সেটা সত্যি নয়। এ কথা বললে, বরং মার্কনির কৃতিত্বকে ছোটো করা হয়। আবার ইউরোপিয়ানরা আমাদের বিজ্ঞানীদের খাটো করে দেখেন, সেটাও সত্যি নয়। বরং ব্রিটিশ ভারতের বিজ্ঞানী হিসেবে জগদীশচন্দ্র বসুকে নিয়ে গর্ব করে খোদ ব্রিটিশরাই। একারণেই তাঁদের পঞ্চাশ টাকার নোটে জগদীশ চন্দ্র বসুর ছবি ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়েছে।

জগদীশ চন্দ্র বসু একজন সফল বিজ্ঞানী ছাড়াও একজন

সৃজনশীল লেখকও ছিলেন। তিনি কল্পবিজ্ঞান রচনা করেছিলেন। তার রচিত দ্য ডিভাইন লাইফ উপন্যাস।

জগদীশচন্দ্র কে নিয়ে কিছু কথা:

> ‘জগদীশ চন্দ্র বসু ছিলেন একজন অসাধারণ বিজ্ঞানী। তিনি উদ্ভিদজগতের উপর তার গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন। তিনি বিজ্ঞানের ইতিহাসে একজন অমর পুরুষ।’ — আলবার্ট আইনস্টাইন
>
> ‘ভারতের কোনও বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি হে আর্য আচার্য জগদীশ।’ —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তার আজীবন সঞ্চিত ১৭ লক্ষ টাকার মধ্যে ১৩ লক্ষ টাকা বসু বিজ্ঞান মন্দিরকে দান করেন। ১৯৫৮ সালে জগদীশ চন্দ্রের শততম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ‘JBNSTS’ নামে একটি বৃত্তি প্রদান আরম্ভ করেন।

বিজ্ঞান প্রাচ্যের ও নয়, পাশ্চাত্য এর ও নয় ইহা বিশ্বজনীন।

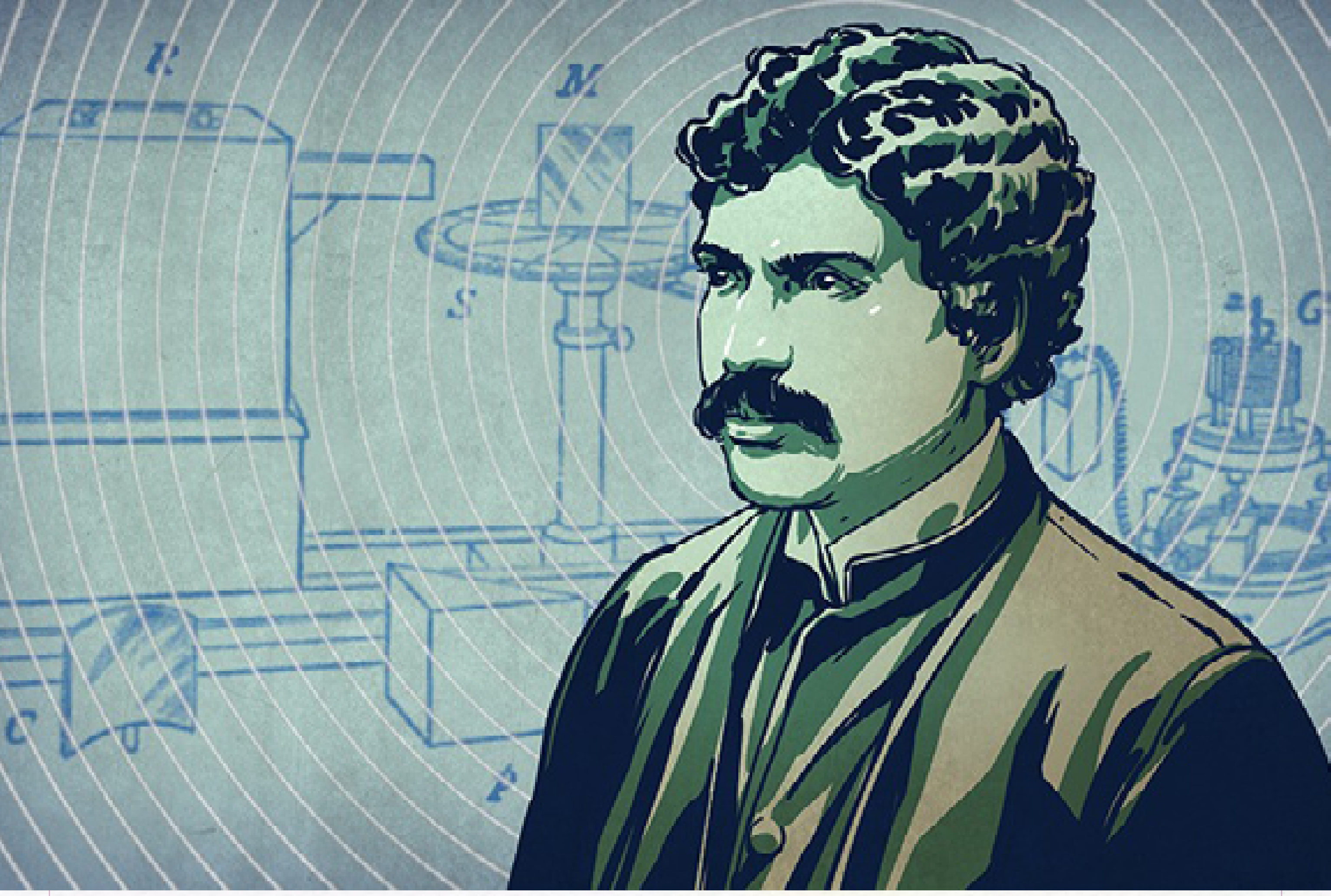
তথ্যসূত্র:

https://bn.m.wikipedia.org

https://www.banglanews24.com

https://www.kalerkantho.com

"মাদুরার মন্দিরে যখন লক্ষ লক্ষ টাকার গহনা আমাকে সগৌরবে দেখানো হল তখন লজ্জায় দুঃখে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। কত লক্ষ লক্ষ লোকের দৈন্য অজ্ঞান অস্বাস্থ্য ওই সব গহনার মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে।"
— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



জগদীশ চন্দ্র বসু - ভারতীয় উপমহাদেশে বিজ্ঞান চর্চার জনক

অদৃশ্য বিদ্যুৎ তরঙ্গ গিয়ে অন্য ঘরের ‘গ্রাহক যন্ত্রে’র মাধ্যমে একটি পিস্তলে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিল। আর তা দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। প্রফুল্লচন্দ্র জড়িয়ে ধরলেন জগদীশকে... **পার্থ সারথী চন্দ্র**

বৈজ্ঞানিক জগদীশ চন্দ্র বসুর অবদান মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। তিনি একাধারে পদার্থবিজ্ঞান এবং উদ্ভিদবিদ্যায় অসামান্য অবদান রেখে নিজের নাম শুধু বাঙালির ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেও স্বর্ণাক্ষরে লিখে গেছেন।

বিজ্ঞানের একজন অমর প্রতিভা জগদীশ চন্দ্র বসু প্রথম মাইক্রোওয়েভ প্রযুক্তির ওপর সফল গবেষণা করেন যার ফলশ্রুতিতে আবিষ্কৃত হয় রেডিও।

তাঁর উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের মধ্যে রয়েছে মাইক্রোওয়েভ রিসিভার ও ট্রান্সমিটারের উন্নয়ন, এবং ক্রেসকোগ্রাফ যন্ত্র যা দিয়ে গাছের বৃদ্ধি নিখুঁতভাবে পরিমাপ করা যায়। উদ্ভিদের জীবনচক্র তিনি প্রমাণ

করেছিলেন।

গাছের প্রাণ আছে, একথা সারা বিশ্বকে জানিয়েছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। আমাদের গ্রহের একমাত্র উপগ্রহ কোনটি? চাঁদ তো? সেই চাঁদের গায়ে একটি গর্তের নাম রাখা হয়েছে জগদীশ বোসের নামে। তাঁর স্মরণে সেই গর্তের নাম রাখা হয়েছে 'বোস'। একথা কি এতদিন জানতেন?

জগদীশ চন্দ্র বসুর জন্ম ১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর শহরে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পরিবারের আদি বাসস্থান ছিল ঢাকা থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরে বিক্রমপুরের রাঢ়িখালে। তাঁর পিতার নাম ভগবান চন্দ্র বসু মাতা বামা সুন্দরী দেবী। পিতা ভগবান চন্দ্র বসু ছিলেন তৎকালীন ব্রাহ্ম সমাজের একজন বিশিষ্ট সদস্য। চাকরি করতেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের এবং একইসাথে ছিলেন ফরিদপুর, বর্ধমানসহ কয়েকটি এলাকার সহকারী কমিশনার। পিতার চাকরির সুবাদে জগদীশ চন্দ্র বসু ছেলেবেলার বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত করেন ফরিদপুরে।

পড়াশুনার হাতেখড়িও হয় ফরিদপুরের এক জেলা স্কুলে। স্কুল বন্ধ থাকাকালীন সময় জগদীশ চন্দ্র বসু ছুটে আসতেন গ্রামের বাড়ি বিক্রমপুর শ্রীনগরের রাঢ়িখালে। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলা প্রমত্ব পদ্মার ঢেউ তার মনকে স্পর্শ করত। সময় সুযোগ পেলেই ছুটে যেতেন পদ্মার তীরে। জলরাশির ঢেউ, নদীর বিশালতা তার উপরে ভেসে থাকা নৌকা, জাহাজ তার সহজ সরল মনে প্রশ্ন তারিয়ে বেড়াত সবসময়।

এরপর ১১ বছর বয়সে তিনি কোলকাতা চলে যান। ১৮৬৯ সালে জগদীশ চন্দ্র বসু কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি হন। ১৬ বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উর্ত্তীন হন সর্বোচ্চ মেধা তালিকায় বৃত্তি নিয়ে। ১৮৭৭ সালে এফ.এ. পাশ করেন। সেখানে তখন বিজ্ঞান

নিয়ে ভারতবাসীকে জাগানোর চেষ্টা করছেন ফাদার ইউজিন ল্যাকো। বিজ্ঞানেই মুক্তি, এই ছিল তাঁর যুক্তি। জগদীশ হয়ে উঠলেন তাঁর ভক্ত।

পিতা ভগবান চন্দ্র বসুর ইচ্ছে ছিল ছেলেকে চিকিত্‌সক বানাবেন। কিন্তু বাদ সাধলেন তাঁর মা। কারণ, তার কিছুদিন আগে মাত্র ১০ বছর বয়সে জগদীশের ছোটো ভাই মারা যায়। মায়ের মন অবশিষ্ট সন্তান সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে লন্ডন যাক, এটি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। অন্যদিকে, ভগবান চন্দ্র বসু অসুস্থ হয়ে পড়ায় বলতে গেলে ঘরবসা। আধা মাইনেতে সংসার চলে। যেসব উদ্যোগ তিনি নিয়েছিলেন গ্রামের মানুষদের জন্য তার বেশির ভাগই ব্যর্থ হওয়ায় তিনি অনেক ঋণে জর্জরিত। মন খারাপ করে জগদীশ দেশেই থাকবেন বলে যখন সিদ্ধান্ত নেন তখন আবার মায়ের মন পরিবর্তন হয়। বামা সুন্দরী দেবী নিজের গয়না বিক্রি করে ও তাঁর সঞ্চিত অর্থ দিয়ে, স্বপ্ন পূরন করার লক্ষে ১৮৮০ সালে ডাক্তারি পড়ার জন্য জগদীশ চন্দ্র বসুকে বিদেশে পাঠান। ছেলেকে ডাক্তারি পড়ার জন্য বিলেতে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে জগদীশ আক্রান্ত হলেন জ্বরে, শরীর হয়ে গেল দুর্বল। বোঝা গেল ডাক্তারি পড়াটা কঠিন হয়ে যাবে।

বিজ্ঞানের স্নাতক হন তিনি ১৮৭৯ সালে। ১৮৮১ সালে শিক্ষা বৃত্তি নিয়ে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই সময় জগদীশের স্ত্রীর ভাই বাংলার প্রথম রাংলার, আনন্দ মোহন বসু জগদীশকে কেমব্রিজে ভর্তি হতে সহায়তা করেন। আনন্দ মোহন বসু ১৮৭৪ সালে প্রথম ভারতীয় হিসেবে গণিতে ট্রাইপস পান। কেমব্রিজে আর লন্ডনে জগদীশের শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন লর্ড রেইলি, মাইকেল ফস্টার, সিডনি ভাইন, ফ্রান্সিস ডারউইনের মত বিজ্ঞানীরা। ১৮৮৪ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকৃতি বিজ্ঞানে বি.এ. এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এস.সি. ডিগ্রি অর্জন করে জগদীশ চন্দ্র বসু ভারত

ফিরে আসেন।

জগদীশচন্দ্র যখন কেমব্রিজের ছাত্র, ঠিক সেই সময়ে বাংলার আরেক তরুণ প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এডিনবার্গের ছাত্র। তিনি সেখানে তখন রসায়নবিদ্যার পাঠ নিচ্ছেন। লন্ডনে থাকাকালীন তাদের দুজনের বন্ধুত্ব হয়।

কেমব্রিজ কলেজের অধ্যাপক লর্ড র‍্যালে ছাত্র জগদীশের ভিতর বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর সন্ধান পান। তার অনুপ্রেরনায় প্রকৃতি বিজ্ঞানে অনুপ্রানিত হন। ১৮৮৫ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভৌত বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে জগদীশ চন্দ্র বসু নিযুক্ত হন। ১৮৮৭ সালে ২৭শে ফেব্রয়ারি জগদীশ চন্দ্র বসু অবলা বসুকে বিয়ে করেন। অবলা বসু ছিলেন সে সময়ের হিন্দু সমাজের বিখ্যাত সংস্কারক দূর্গা মোহন দাসের কন্যা ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভাইঝি।

'ভারতীয়রা পড়াতে পারে না' – এই অজুহাতে কলেজের সেই সময়কার অধ্যক্ষ চার্লস টাউনি এবং বাংলার পাবলিক ইনস্টিটিউটের পরিচালক স্যার আলফ্রেড ক্রফট প্রবল বিরোধিতা করলে জগদীশ চন্দ্র বসু ভারতের ভাইসরয় লর্ড রিপনের শরণাপন্ন হন। শেষমেশ, ভাইসরয়ের হস্তক্ষেপে তিনি শিক্ষক হলেও চার্লস টাউনি এবং স্যার আলফ্রেড ক্রফট তাঁকে 'অস্থায়ীভাবে' নিয়োগ দেন। এমনকি তাঁর বেতন নির্ধারণ করা হয় একই পদে আসীন ব্রিটিশ অধ্যাপকদের অর্ধেক। এমনকি তাঁকে গবেষণাগারে একটা কাজ করারও সুযোগ দেওয়া হতো না। সাহসী জগদীশ অর্ধেক বেতনের নিয়োগপত্র অগ্রাহ্য করে কলেজে যোগ দেন এবং একনাগাড়ে তিন বছর বেতন নিতে অস্বীকার করেন। এই সময়কালে নিজের মেধা ও পাণ্ডিত্য দিয়ে তিনি প্রায় সবার মন জয় করেন। অন্যদিকে নিজের বাড়িতেও একটি গবেষণাগার গড়ে তোলেন। তিন বছর পরে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে সসম্মানে, পূর্ণবেতনে অধ্যাপক হিসেবে

নিয়োগ দেয়। আর এই নিয়োগ দেওয়া হয় ভূতাপেক্ষা, অর্থাৎ তিন বছর আগে থেকে। তাঁর তিন বছরের বকেয়া বেতনও পরিশোধ করা হয়। সেই টাকা দিয়ে জগদীশ চন্দ্র বসু তাঁর বাবার ঋণ শোধ করেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে তখন সেভাবে গবেষণার কোনও সুযোগ নেই। একদিন তিনি স্থানীয় একজন ঝালাই মিস্ত্রিকে ডেকে নিয়ে এলেন কলেজে আর তাকে দিয়ে কিছু প্রয়োজনীয় যন্ত্র তৈরি করিয়ে গড়ে তুললেন নিজের খরচে গবেষণাগার। আর ক্লাস শেষে সেখানেই নিভৃতে 'বিজ্ঞানচর্চা' করতে শুরু করলেন। জগদীশ একমনে নিজের মত করে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। একদিন হঠাৎ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে জগদীশের সহকর্মী হিসেবে হাজির হলেন প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। দেশে ফিরে প্রেসিডেন্সি কলেজে জগদীশচন্দ্রের পর 'দ্বিতীয় ভারতীয় বিজ্ঞানের অধ্যাপক' হিসেবে যোগ দিলেন প্রফুল্ল চন্দ্র রায়।

সেই সময়ে জগদীশ চন্দ্র বসুর গবেষণার আগ্রহের বিষয়বস্তু ছিল ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ, যা 'মাইক্রোওয়েভ' নামে পরিচিত। সে সময় তিনি 'কোহেরার' নামে একটি ধারণাকে আরেকটু এগিয়ে নিয়ে দেখেন সেটিকে মাইক্রোতরঙ্গের গ্রাহক যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

প্রফুল্লচন্দ্র জগদীশচন্দ্রের কাজে উৎসাহ ও পরামর্শ দিতেন। একদিন জগদীশচন্দ্র কলেজের ল্যাবরেটরিতে তাঁর কয়েকজন সহকর্মীকে ডেকে একটি আবিষ্কার দেখালেন। অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্রের ঘরে রাখা হল একটি 'প্রেরক যন্ত্র'। আর 'আলেকজান্ডার পেডলার' নামে কলেজের আর একজন অধ্যাপকের ঘরে রাখা হল 'গ্রাহক যন্ত্র'। দুটি ঘরের মধ্যে ব্যবধান প্রায় ৭০ ফুট আর তার মাঝখানে মোটা দেওয়াল বিদ্যমান। 'প্রেরক যন্ত্র' থেকে অদৃশ্য বিদ্যুৎ তরঙ্গ গিয়ে অন্য ঘরের 'গ্রাহক যন্ত্রে'র মাধ্যমে একটি পিস্তলে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিল। আর তা দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। প্রফুল্লচন্দ্র জড়িয়ে

ধরলেন জগদীশকে।

বৈদ্যুতিক তরঙ্গের ওপর তাঁর গবেষণার কাজ তিনি শুরু করেন ১৮৯৪ সালে। এর ফলশ্রুতিতে ১৮৯৬ সালে লণ্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে 'ডক্টর অফ সায়েন্স' উপাধি পান।



১৮৯৪ সালে তিনি কলকাতায় প্রথম বিনা তারে বার্তা প্রেরণ এবং তা গ্রহণ করার একটি কৌশল দেখিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন। বড়োলাটের হস্তক্ষেপে তাঁর এই আবিষ্কার ইংল্যান্ডে দেখানোর জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে সহায়তা করলে তিনি লন্ডনে গিয়ে সেটি প্রদর্শন করেন। ১৮৯৬ সালের ২৪ জুলাই লন্ডনে রয়্যাল সায়েন্স সোসাইটিতে তিনি তাঁর আবিষ্কার সব বিজ্ঞানীর সামনে তুলে ধরেন। এমনকি তিনি তাঁর পরীক্ষার খুঁটিনাটি এত বিশদভাবে তুলে ধরেন যে তা থেকে যে কেউ পরীক্ষাটি পুনরাবৃত্তি করতে পারবেন।

মানবসভ্যতার ইতিহাসে কলকাতার সেই বিনা তারে বার্তা প্রেরণের ঘটনাটিই প্রথম। পরে লন্ডনেও তিনি একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করেন। কিন্তু বিজ্ঞানীদের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি তাঁর উদ্ভাবনের কোনো 'পেটেন্ট' বা 'স্বত্ব' করেননি। কারণ, কর্ণ ছিল তাঁর আদর্শ। তাঁর সব কাজকর্ম

হবে মানবসভ্যতাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য, পিছিয়ে দেওয়ার জন্য নয়। বলা যায়, জগদীশ চন্দ্র বসু হচ্ছেন পৃথিবীর প্রথম মুক্ত দর্শনের অধিকারী বিজ্ঞানী।

উদ্ভিদও যে তাপ, শীত, আলো, শব্দ ও অন্যান্য অনেক বাহ্যিক উদ্দীপনায় সাড়া প্রদান করতে পারে সেই কথা জগদীশ চন্দ্র বসুই প্রমাণ করে দেখালেন। আর এই প্রমাণের জন্য নিজেই তৈরি করলেন 'ক্রেস্কোগ্রাফ' নামক একটি যন্ত্র। আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি সহ ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে বক্তৃতা দিয়ে সস্ত্রীক জগদীশ দেশে ফিরলেন, স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতায় ফেরার ঠিক দু-মাস পরে। আশ্চর্যের বিষয় বসু দম্পতিকে অভ্যর্থনা জানাতে কয়েকজন আত্মীয় ছাড়া আর কেউ রেল ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল না। তবে হ্যাঁ পরিবারের লোকজনবাদে একজন এসেছিলেন, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। ষ্টেশনেই মহেন্দ্রলাল জড়িয়ে ধরলেন জগদীশকে। তাঁর দুচোখে জল। এগিয়ে গিয়ে অবলাকে বললেন, 'তুই ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিয়েছিলি বলে তোকে আমি একদিন বকুনি দিয়েছিলুম, মনে আছে?' 'অবলা' বললেন, 'হ্যাঁ মনে আছে।' মহেন্দ্রলাল বলেলেন, 'তুই ঠিক করেছিলি সেদিন মা, ডাক্তারনী হলে কী আর এমন স্বামী পেতিস! তুই ওকে থামতে দিস না। এই তো সবে শুরু, জগদীশ আমাদের নিউটন, গ্যালিলিও হবে।'

জগদীশ চন্দ্র বসুকে বলা হয় ভারতীয় উপমহাদেশে বিজ্ঞান চর্চার জনক। বাংলাদেশের উদ্ভিদ বিজ্ঞানী দ্বিজেন শর্মা মনে করেন বেতার যন্ত্রের প্রথম উদ্ভাবক হিসাবে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। যদিও বেতারের আবিষ্কারক হিসাবে বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন মার্কনি, কারণ জগদীশ বসু এটার আবিষ্কারকে নিজের নামে পেটেন্ট করেননি। এ কারণেই এই আবিষ্কারের জন্য তাঁর দাবি স্বীকৃত হয়নি।

বেতার কাজ করে বৈদ্যুতিক চুম্বক তরঙ্গের ভিত্তিতে,

যে তরঙ্গ নিয়ে জগদীশ বসু গবেষণা করেছিলেন। যদিও তাঁর আগে এবং তাঁর সময়ে এই তরঙ্গ নিয়ে গবেষণার কাজ করছিলেন মার্কনি সহ বিভিন্ন দেশে একাধিক বিজ্ঞানী। কিন্তু কলকাতার বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান বসু বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষক ড. দিবাকর সেনের মতে, জগদীশ বসুই প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ বা মাইক্রোওয়েভ।

‘মাইক্রোওয়েভ আবিষ্কারের ব্যাপারটা ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আজকের দিনে মহাকাশ বিজ্ঞানে, চিকিৎসা বিজ্ঞানে, টেলিভিশন সম্প্রচারে এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতিতে মাইক্রোওয়েভ কাজে লাগে। কম্যুনিকেশনের (যোগাযোগ) ক্ষেত্রে আরও বিশেষ করে এই তরঙ্গ কাজে লাগে।’

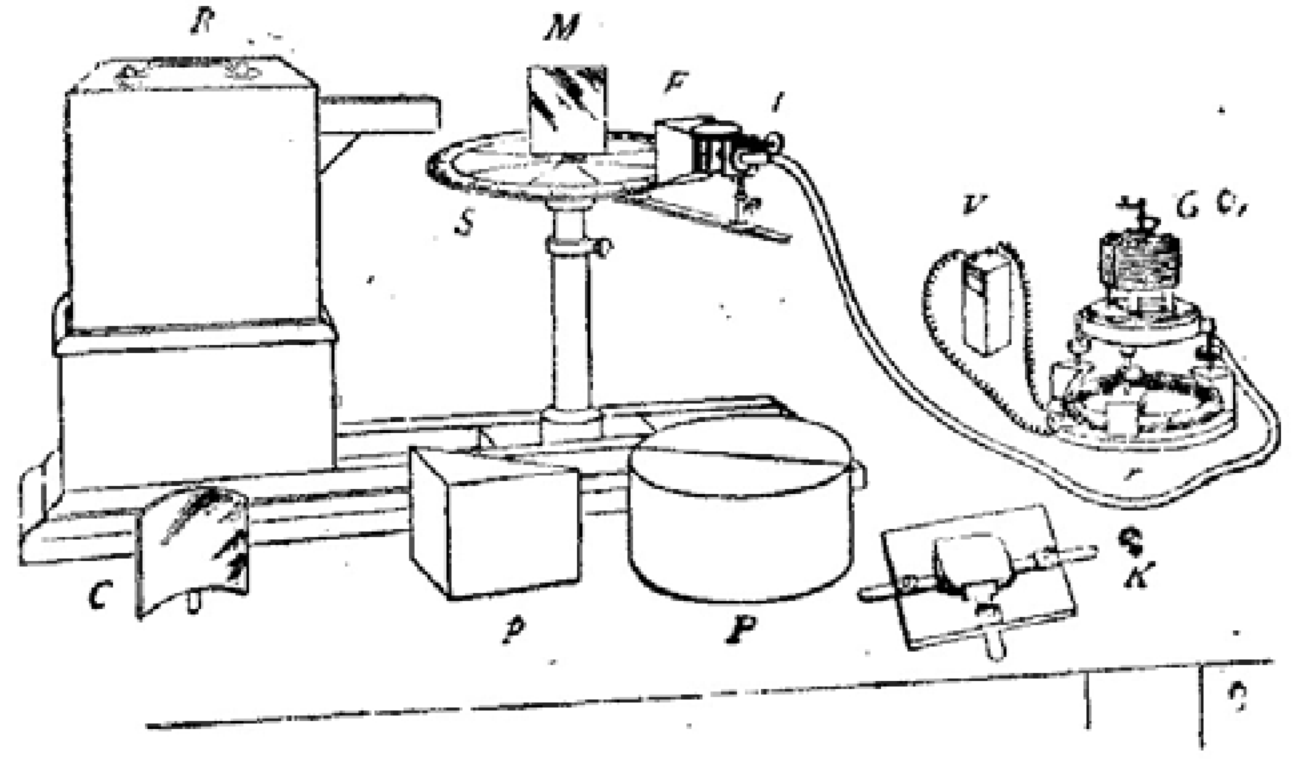
‘দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন সাবমেরিন এল, রাডার এল, তখন মানুষ বুঝতে পারল এই মাইক্রোওয়েভের গুরুত্ব কতখানি। তিনি যখন এই আবিষ্কার করেছিলেন, তখন তার কোন ব্যবহারিক প্রয়োগ ছিল না। মার্কনি এবং তদানীন্তন বিজ্ঞানীরা যোগাযোগের জন্য যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ব্যবহার করেছিলেন তা তারা করেছিলেন লঙ্গার ওয়েভ (দীর্ঘ তরঙ্গ) ব্যবহার করে – মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করে নয়।’

অর্থাৎ জগদীশ বসুর আবিষ্কার ছিল অতি ক্ষুদ্র বেতার তরঙ্গ, যার থেকে তৈরি হয়েছে আজকের মাইক্রোওয়েভ, যা পরবর্তীতে ‘সলিড স্টেট ফিজিক্স’ –এর বিকাশে সাহায্য করেছিল। পরে তিনি পদার্থ বিজ্ঞানের আরও গুরুত্বপূর্ণ নানা আবিষ্কার করেন যেমন ‘ডিটেক্টর’, ‘রিসিভার’ ইত্যাদি।

‘চৌকো মুখ ফানেল আকৃতির একটি হর্ন অ্যান্টেনা তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, যা আজ বিশ্বে যুদ্ধকালীন যোগাযোগ, বা রাডার যোগাযোগের জন্য অপরিহার্য। এছাড়াও অনেক ধরনের রিসিভার উনি তৈরি

করেছিলেন যা আজও বহুল ব্যবহৃত, ‘বলেছেন ড. দিবাকর সেন।

আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের অত্যন্ত দুরূহ বিষয়ে তাঁর আবিষ্কার নিয়ে ইংল্যাণ্ডে বক্তৃতা দিয়ে বিশ্ব-খ্যাত বহু বিজ্ঞানীকে চমকে দিয়েছিলেন জগদীশ চন্দ্র বসু। লণ্ডনের একটি দৈনিক পত্রিকা ‘ডেইলি এক্সপ্রেস’ তাঁকে গ্যালিলিও-নিউটনের সমকক্ষ বিজ্ঞানীর স্বীকৃতি দিয়েছিল।



R, radiator ; S, spectrometer-circle ; M, plane mirror ; C, cylindrical mirror ; p, totally reflecting prism ; P, semi-cylinders ; K, crystal-holder ; F, collecting funnel attached to the spiral spring receiver ; t, tangent screw, by which the receiver is rotated ; V, voltaic cell ; r, circular rheostat ; G, galvanometer.

লন্ডন থেকে দেশে ফেরার পর পদার্থবিজ্ঞানের এই অধ্যাপক মাইক্রোতরঙ্গ নিয়ে কাজ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখেন। এর অন্যতম কারণ হলো, তিনি তখন ‘ধাতব বস্তুর’ প্রাণ আছে কিনা তা ভাবতে থাকেন। তবে তাঁর এই ভাবনাটা ক্রমেই উদ্ভিদের দিকেই চলে যায়।

ফলে মাইক্রোতরঙ্গ নিয়ে বিনা তারে বার্তা প্রেরণের জগদীশের সাফল্য অনেকে ভুলে যান। অন্যদিকে উদ্ভিদের জীবনের বহিঃপ্রকাশের কারণে তিনি সেই দিকে বেশি কার্যকরী হন।

বর্তমানে, বিশ্বের তাবত বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুকেই বিনা তারে বার্তা প্রেরণের জনক হিসেবে

স্বীকৃতি দিয়েছেন। তবে জগদীশ চন্দ্র বসু কাজ করেছেন মাইক্রোতরঙ্গ নিয়ে এবং রেডিও যন্ত্রের উদ্ভাবক মার্কনি কাজ করেছেন বেতারতরঙ্গ নিয়ে।

অনেকেরই ধারণা, জগদীশ চন্দ্র যদি মাইক্রোতরঙ্গ নিয়ে তাঁর কোহেরারকে আরও এগিয়ে নিতেন, তাহলে ১৯০১ সালের প্রথম নোবেল পুরস্কারটি একজন বাঙালি পেলেও পেতে পারতেন। যে কলেজ তাঁকে নিয়োগ দিতে চায়নি, সে কলেজই তাঁকে অবসরের পরও অতিরিক্ত দুই বছর জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক হিসেবে বেতন দিয়েছে। ১৯১৫ সালে অবসরের পর তাঁকে প্রফেসর ইমেরিটাস মর্যাদা দিয়েছে। ব্রিটিশ সরকার ১৯০৩ সালে তাঁকে 'কমান্ডার অব ইন্ডিয়ান এম্পায়ার' উপাধি দেয়। ১৯২৮ সালে তিনি 'রয়্যাল সোসাইটি'র ফেলো নির্বাচিত হন।

কিন্তু পদার্থ বিজ্ঞানে এমন অসাধারণ অবদান সত্ত্বেও জগদীশ চন্দ্র বসু সারা বিশ্বে খ্যাতিলাভ করেছিলেন উদ্ভিদবিজ্ঞানী হিসাবে।

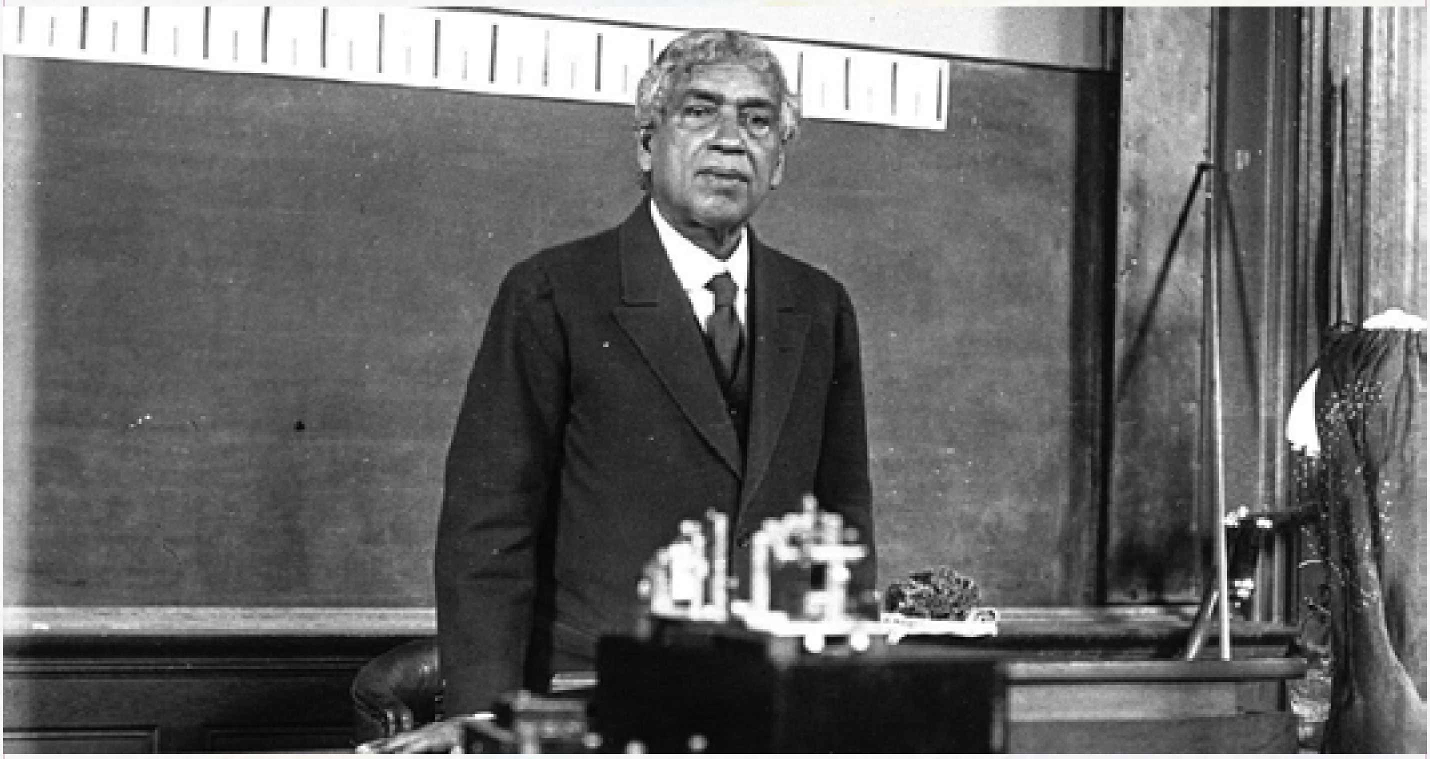
ড. দিবাকর সেন বলেন, জগদীশ বসু আদৌ উদ্ভিদবিজ্ঞানী ছিলেন না। কিন্তু ওয়্যারলেস রিসিভিং ইন্সট্রুমেন্ট (তার-বিহীন গ্রাহক যন্ত্র) নিয়ে কাজ করতে করতে তিনি একটা অদ্ভুত জিনিস দেখলেন।

'তিনি দেখলেন একটা টিনের তারকে মোচড় দিলে তার ভেতরে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মাত্রায় যেমন বিদ্যুত তরঙ্গ তৈরি হয়, তেমনই আঘাত করলে গাছের ভেতরেও একই ধরনের প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়, একই ঘটনা ঘটে প্রাণী দেহেও। উনি তখন প্রশ্ন তুললেন তাহলে জীবনের সংজ্ঞা কী হবে? এবং এখান থেকেই জন্ম নিল আধুনিক জৈব-পদার্থ বিজ্ঞান।'

জনপ্রিয় ধারণা হল তিনি সবার আগে আবিষ্কার করেছিলেন গাছপালার প্রাণ আছে। উদ্ভিদবিজ্ঞানী দ্বিজেন শর্মা বলেছেন অতি প্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষের মানুষ বিশ্বাস করত গাছ একটা জীবন্ত স্বত্বা। একই বিশ্বাস

ছিল অ্যারিস্টটলেরও। তাহলে জগদীশ বসুর আবিষ্কারে নতুনত্ব কোথায় ছিল?

‘গাছের যে প্রাণ আছে তার কিছু স্থূল লক্ষ্মণ সম্পর্কে মানুষ জানত, যেমন গাছ জন্ম নেয়, বড়ো হয়, একদিন মরেও যায়। কিন্তু বাইরের কোন উদ্দীপক বস্তু ব্যবহার করলে বা গাছকে আঘাত করলে গাছ কীভাবে সাড়া দেয়, সেটা জগদীশ বসু যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করে দেখান, যা উদ্ভিদ বিজ্ঞানের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা আবিষ্কার, ‘বলেন ড. শর্মা।



মে ১০, ১৯০১। লন্ডনের রাজকীয় বিজ্ঞান সমিতির কেন্দ্রীয় মিলনায়তন। দীর্ঘদিন এখানে এত লোকের ভিড়ে কোনো বিজ্ঞানী বক্তব্য দেননি। এই বিজ্ঞানী আবার এসেছেন সাত সাগরের ওপার অর্থাৎ ভারত থেকে। দর্শকদের মধ্যে রয়েছেন লর্ড রেইলির মত বিজ্ঞানকুল শিরোমণি। দর্শকেরা অবশ্য খুব বেশি চমৎকৃত হলেন না পরীক্ষার বন্দোবস্ত দেখে। একটি গাছের মূল একটি বোতলের জলের মধ্যে দেওয়ার ব্যবস্থা, গাছ থেকে কী সব তারটার টেনে এটা কিম্ভূতদর্শন যন্ত্রের সঙ্গে লাগানো।

দর্শকদের জ্ঞাতার্থে বিজ্ঞানী জানালেন, বোতলের ভেতরের তরল পদার্থটি জল নয়, এটি ব্রোমাইড সলিউশন। উপস্থিত বিজ্ঞানের লোকেরা বুঝলেন অচিরেই গাছটি মরবে। কারণ, হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিডের

এই লবণের দ্রবণ সহ্য করার ক্ষমতা গাছের নেই। তাতে অবশ্য তাঁদের ভ্রুক্ষেপ নেই। তাঁদের লক্ষ্য কিম্ভূত যন্ত্রটি।

বিজ্ঞানী গাছের মূলকে সলিউশনে দিয়ে দিলেন আর চালু করে দিলেন তাঁর যন্ত্র। চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটি কাগজের ওপর মানুষের হৃদযন্ত্রের ওঠা-নামার মত গ্রাফ আঁকতে শুরু করল। তবে সেটিতে তেমন কোনো চাঞ্চল্য নেই। পেন্ডুলামের মত একই নিয়মের ওঠা-নামা। কিন্তু একটু পরই যন্ত্রের গ্রাফে ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা দিল। গ্রাফ বেশ দ্রুত ওঠা-নামা শুরু করল। মনে হচ্ছে কার সঙ্গে যেন লড়ছে গাছটি। তবে একসময় সব চাঞ্চল্য থেমে গেল।

উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা দেখলেন, গাছটি মরে গেছে!

উপস্থিত বিজ্ঞানী ও দর্শকেরা সবাই চমৎকৃত হলেন ভারতীয় বাঙালি বিজ্ঞানীর এই যন্ত্রে। লর্ড রেইলি উঠে গিয়ে দর্শক সারিতে বসা বিজ্ঞানীর স্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে এলেন।

উদ্ভিদেরও প্রাণীদের মত প্রাণ আছে, এই ধারণা কিন্তু নতুন নয়। কারণ, সবাই দেখেছে বীজ থেকে চারা হয়, সেটি মহিরুহ হয় এবং একসময় মরে যায়। কিন্তু উদ্দীপনায় উদ্ভিদও প্রাণীর মত প্রতিক্রিয়া করে, জোর করে মেরে ফেলা হলে আর্তচিৎকার করে – এমনটা কেউ এর আগে ভাবেননি। ভেবেছেন ওই বাঙালি বিজ্ঞানী।

গাছ যে বাইরের আঘাতে বা তাকে উত্তেজিত করলে তাতে সাড়া দেয় সেটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করার জন্য জগদীশ বসু সূক্ষ্ম সব যন্ত্রর সাধারণ কারিগর দিয়ে তৈরি করেছিলেন যেগুলি কলকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দিরে সংরক্ষিত রয়েছে।

এমন একটি যন্ত্র তৈরি করেছিলেন তিনি যা দিয়ে দেখিয়েছিলেন একটা গাছ এক সেকেণ্ডে কতটা বাড়ে। তাঁর আবিষ্কৃত 'ক্রেসকোগ্রাফ' যন্ত্র উদ্ভিদদেহের সামান্য সাড়াকে লক্ষগুণ বৃদ্ধি করে প্রদর্শনের ক্ষমতা রাখত।

তাঁর গবেষণা জড় ও জীব জগত সম্পর্কে মানুষের ধারণা বদলে দিয়েছিল।

‘তিনি বলেছিলেন জড় এবং জীব জগতের মধ্যে পার্থক্য খুবই সামান্য। এতই সামান্য যেখানে জড় পদার্থ জীবের মত আবার জীব জড় পদার্থের মত ব্যবহার করে, ‘বলেছেন ড. দ্বিজেন শর্মা।

জগদীশ বসু ১৮৯৯ থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত জীব ও জড় বস্তুর প্রতিক্রিয়ার ওপর গবেষণার কাজ করেছিলেন।

জগদীশ চন্দ্র বসু ভারতে বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণার প্রসার ঘটাতে কলকাতায় ১৯১৭ সালে যে ‘বসু বিজ্ঞান মন্দির’ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেটি সম্ভবত ভারতের অন্যতম সবচেয়ে প্রাচীন বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এটিকে তিনি একটি ‘মন্দির’ হিসেবে উল্লেখ করেন। এই কেন্দ্র ভারতের বহু নামকরা বিজ্ঞানীকে গবেষণার কাজে অনুপ্রাণিত করেছিল যেমন সি. ভি. রমন, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বোস, প্রফুল্ল চন্দ্র রায় প্রমুখ।



ড. দ্বিজেন শর্মা বলেন, জগদীশ চন্দ্র বসু সবার আগে বিজ্ঞান বিষয়ে বাংলায় লিখেছিলেন, যা এখনও বাংলা

ভাষায় লেখা আদর্শ বিজ্ঞান বিষয়ক বই হিসাবে বিবেচিত। তাঁর 'অব্যক্ত' গ্রন্থের লেখাগুলো 'বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের একটি অপূর্ব সংশ্লেষ। আমার ধারণায় বিজ্ঞান বিষয়ে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় গ্রন্থ তাঁর এই বই।'

আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বন্ধু। রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশ চন্দ্র বসুর বন্ধুত্ব ছিল আমৃত্যু। একজনের হাতে বিকশিত হয়েছে বাংলায় সাহিত্য আর একজন করেছেন বাংলায় বিজ্ঞান রেনেসাঁর সূচনা।

স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু একটি চমৎকার কথা বলতেন। তিনি বলতেন, সে-ই প্রকৃত বিজ্ঞানী যে তার ল্যাবরেটরির সঙ্গে ঝগড়া করে না। অর্থাৎ, প্রকৃতিবিজ্ঞানী সব সময় নিজের ল্যাবরেটরি তৈরি করে নেন, অন্যকে দোষারোপ করেন না।

বিজ্ঞানও যে একটা সংস্কৃতি সেটা প্রমাণ করে গেছেন জগদীশ চন্দ্র বসু, বলেছেন ড. দ্বিজেন শর্মা, 'তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানে তাঁর অবদান সেই অর্থে একটা বিরাট মূল্যবান সাংস্কৃতিক অবদান।'

জগদীশ চন্দ্র বসু প্রয়াত হন কলকাতায়, ১৯৩৭ সালের ২৩ নভেম্বর।

অন্ধকার কুসংস্কারে আবৃত পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ধারায় এক অতুলনীয় আলোকবর্তিকা জ্বেলে গেছেন আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম মহামানব স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু। তার আবিস্কৃত ডায়োড, ট্রায়োড, ট্রানজিষ্টর থেকে যে ইলেকট্রনিক যন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল তা আজ কম্পিউটার পর্যন্ত বিস্তৃত। আজ থেকে প্রায় সোয়া-শো বছর আগে একটি পিছিয়ে পড়া দেশ থেকে জগদীশ চন্দ্র বসু মানবসভ্যতাকে একটি বড়ো ঝাঁকুনি দিয়েছেন। সেই মাত্রায় না হলেও যদি আমরা তাঁর মত বিজ্ঞানকে ভালোবেসে মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি, তাহলেই কেবল এই বিজ্ঞানীর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারব।

তথ্যঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার: বিবিসি বাংলা, আনন্দবাজার পত্রিকা, আনন্দমেলা, মুনির হাসান - কিশোর আলো, ডেইলি হান্ট, অনিরুদ্ধ সরকার - এশিয়ানেট নিউজ বাংলা, উইকিপিডিয়া ও বিভিন্ন ব্লগ।



পূর্ণধর্ম বিভ্রাট

কিন্তু নারদের কপালের শিরা ফোলা কপাল, বুকের নাচন, উত্তেজিত বদন দেখে দেবদেবী ভগবান কিছু একটা সিরিয়াস অঘটন অনুমান করলেন। তেনাদের নেশা গেল ছুটে। নাচ গেল থেমে। সংগীত বন্ধ। উল্লাস স্তব্ধ। চারিদিক নিথর নিস্তব্ধ। এক মাতাল দেবতা তাঁর কম্পিত হাতে একটা টুল এগিয়ে দিলেন নারদের দিকে… **অশোক দাস চার্বাক**

(অশোকদাস চার্বাক কল্পিত নতুন পুরাণ)

শেষ পর্যন্ত হঠাৎ করে সব মানুষ সম্পূর্ণ কায়মনোবাক্যে ভালো হয়ে গেল। সব্বাই – সারা পৃথিবীর সাতশ পঞ্চাশ কোটি মানুষ। একটাও বাদ থাকল না। দলে দলে সব পাপীরা গঙ্গাসাগরে টুপটুপ

করে ডুব দিল, আর তাদের গা থেকে সব পাপ ধুয়ে মুছে সাফ। মন-আত্মা থেকেও। কেউ আর পাপী রইল না। কেউ আর মানুষ রইল না। প্রতিটি মানুষ ব্রহ্মজ্ঞানী ধার্মিক সাধু-দেবতার রূপ নিল। সব্বাই - আর পুরোপুরি। কেউ যীশু, কেউ রামকৃষ্ণ, কেউ রামচন্দ্র, কেউ হনুমান, লোকনাথবাবা, ত্রৈলঙ্গস্বামী, বালকব্রহ্মচারী, সাঁই, 'ধর্ষক রাম রহিম', 'বামা খ্যাপা', কেউ কবিগুরু কল্পিত 'গোরা বোষ্টম বাবা', কেউ সত্যজিৎ কল্পিত 'মছলিবাবা', কেউ আবার নবচার্বাককল্পিত 'মেরুবাবা' - এমনি সব। কারও মনে কোনো পাপ নাই। ছিটে ফোঁটাও না। একজনেরও না। কেউ সর্বক্ষণ গীতাপাঠ করছে, কেউ গায়ে মুখে তিলক এঁকে গায়ে চন্দন মেখে, তুলসী কাঠের মালা গলায় ঝুলিয়ে শুধু হরিনাম আউড়ে চলেছে চোখ বুজে। কেউ অষ্টপ্রহর নামাজ পড়ে চলেছে মাইকে, কেউ আবার ঢুলুঢুলু আধ্যাত্মিক আধবোজা নেত্রে গড়গড়া এডিক্ট অনুকূলবাবার বাণী পাঠ করছে বা গ্রন্থসাহেব পড়ছে। অষ্ট প্রহর, বাৎসরিক, বা মাসিক নয় - তিনশ পঁয়ষট্টিদিন - দিবারাত্র। কেউ সোনার ক্রশ গলায় ডিসপ্লে করে পবিত্র বাইবেল মুখস্ত করছে অবিরাম। ডাকাত খুনিরা হয়ে গেছে বাল্মীকি। সারাদিন গাছের তলায় বসে রামনাম করছে -একমনে। পু-উরো একমনে। দিনের পর দিন। গায়ে যে উইঢিপি হয়ে গ্যাছে বুঝতেই পারছে না। কেউ আবার সর্বসমক্ষে উলঙ্গ হয়ে বসে আছে হাটের মাঝে বটের তলায়। মহিলারাও আদি মোহিনীমোহন কাঞ্জিলালের স্বপ্নাদ্য শাড়ী বিসর্জন দিয়ে হয়েছে নাঙ্গা সন্ন্যাসিনী। আহা কী স্বর্গীয় দৃশ্য! যেন পাথরের দেবদেবীরা জ্যান্ত হয়ে বরাভয়ের ভঙ্গি করছে হাতের চেটো দেখিয়ে। কেউবা হয়েছে মাচানবাবা।

সারাদিন রাত মাচায় বসে। কেউ কেউ আকাশের দিকে হাত দুটো তুলে রেখেছে চব্বিশ ঘন্টা। অনেকে আবার সারা গায়ে ছাই মেখে রাত দিন বাবার প্রসাদ

টেনেই চলেছে-টেনেই চলেছে। কেউবা আবার লাল ন্যাকড়ার থলিতে হাত লুকিয়ে ভগবানের কোনো একটা ট্রেডনেম বা গোপন দীক্ষানাম আউড়েই চলেছে। শুধু ঠোঁট দুটো তার কাঁপছে থর থর করে। আধবোজা চক্ষুদুটি স্থির, ভাবলেশহীন গঞ্জিকাসিদ্ধ। মালা জপার ফাঁকে শেয়ারবাজারের হিসাব, প্রতিবেশীর সাথে মামলার চক্রান্ত – কিচ্ছু ভাবছে না গোপন মনে। একমনে রাধাকেষ্টর কীর্তন করতে করতে নামাবলী পরা কীর্তনীয়ারা গাঁজার কল্কীর দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। আড়চোখে টিভির হাফউলঙ্গ নৃত্যও দেখছে না এক পলক। ক্ষুধা তৃষ্ণা, কাম ক্রোধ, লোভ লালসা মোহ-মাৎসর্য্য ভুলে সবাই একমনে ধর্মচর্চা করছে। শুধু ধর্মচর্চা, শুধু ধর্মচর্চা। ধর্ম অনুযায়ী সবার গায়ে টিকি, দাড়ি, নামাবলি, টুপি টিপ ইত্যাদি সম্প্রদায় আলাদাকরণ চিহ্নিতকরণের পবিত্র ইউনিফর্ম। কারও কালো, কারও সবুজ, কারও সাদা, কারও গেরুয়া সাজপোশাক। সারা পৃথিবীর আকাশে বাতাসে ভাটিয়ালি, আধুনিক, রামপ্রসাদী, বাউলী, পপ, বিটলে, রক, ফিল্মী নানান সুরে ধর্মসংগীত ভক্তিগীতি, 'দম মারো দম, হ্যারে কৃষ্ণা হ্যারে রাম', মধুমাখা কৃষ্ণনাম, ইত্যাদি ভেসে আসছে দিগ্‌দিগন্ত থেকে। ধর্মময় ধরাধাম। পথঘাট ফুটপাথ আলো করে বসা দেবদেবীরা, পোর্টেবল হকার শনিদেবেরা সেসব দেব বন্দনাসংগীত শুনে মোহিত হচ্ছেন। এমনকি ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, সুক সারি, ইঁদুর প্যাঁচা, সাপ শেয়াল ইত্যাদি পশুপাখীদেবরাও শুধু ভগবানদের চাটুকারি গুনগান গাইছে। মন মগজ চিত্ত আত্মা তাদের ফুল ধার্মিক সুলভ নিরেট নিস্ফলা।

সবাই ঈশ্বরভক্তিতে, ঈশ্বরভীতিতে, ঈশ্বরপ্রেমে বিভোর। পৃথিবীর সর্বপ্রান্তে, সর্বস্থানে, সর্বমনে ধর্মস্থাপন সুসম্পন্ন হয়েছে। এবং পুরোপুরি। কেউ আর ব্যবসা বাণিজ্য, চুরিজোচ্চুরি, বিদ্যাচর্চা, জীবনচর্চার ফাঁকে পার্টটাইম ধর্মচর্চা করছে না। সবাই ফুলটাইমার ধার্মিক।

তারা সারাদিন দুস্কর্ম করার ফাঁকে দু-একবার ভগবানকে সেলাম ঠুকে, বা কাক কুকুরকে বাসি মুড়ি রুটি, বা রাস্তাকালী, ফুটপাথ শনি অথবা কুষ্ঠরোগীর দিকে দু-একটা পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে, অথবা রাতে শোবার আগে ঘুম ঘুম চোখে 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল পার করো আমারে' বা ভোরে উঠে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে 'হরি হে পার কর' বলেই ধর্মরক্ষা, স্বর্গবাগানোর ধান্দা করছে না। এমনকি পাপার্জিত সম্পত্তির সামান্য বখরা কাটমানি বিনিময়ে যাজক পুরুত দিয়ে কনট্রাক্টেও ধর্মচর্চা করিয়ে পুণ্য কিনছেন না। তারা জাগতিক মানবসুলভ কাজকর্ম ছেড়ে মুনি ঋষি মোল্লা বাবাজী-মাতাজী অবতার পীরপয়গম্বরদের মত হোলটাইমার ধার্মিক হয়ে ভগবানদের পাদপদ্মে প্রাণ-আত্মা দেহ-মন পুরোপুরি-একেবারে পুরোপুরি সমর্পন করেছে। সবার মন সর্বকলুষমুক্ত নিষ্পাপ-ঈশ্বরময়। মনের প্রাণের কোনায় কোনায়, কানায় কানায় ঠেসে সম্পৃক্ত হয়ে আছে শুধু ঈশ্বর-শুধুই ঈশ্বর। ঈশ্বর ছাড়া আর কোন কিছুর স্থান নেই মনের অন্দরে। মস্তিস্ক প্রশ্নহীন, চিন্তাভাবনাহীন নিরেট সীসা-ঈশ্বরে ঠাসা। তাতে মানুষ সুলভ কোন পাপ চিন্তার ভেজাল নেই। সবাই তাদের পাপার্জিত সম্পদ মাদার টেরিজা, রামকৃষ্ণ মিশন, ভেটিকান ইত্যাদিতে নিঃশেষে দান-দেবত্তর করে হাত ধুয়ে ফেলেছে। তারা পুরোপুরি পাপমুক্ত হয়েছে। সবাই মোক্ষলাভ করেছে। একজনও আর বাকি নেই। পোলিও মুক্তির মত সারা পৃথিবীর মানুষ একসাথে পাপ জীবাণুমুক্ত-মুক্তচিন্তামুক্ত, ধর্মশৃঙ্খলে বন্দি। যুক্তিবাদী সমিতিগুলো কাজ হারিয়ে তালা দিয়েছে দরজায়। কেউ কোন যুক্তিতক্কের ধার ধরছে না। সনাতন সত্যযুগ ফিরে এসেছে ধরাধামে।

শ্রমিকেরা আর বৃথা কাজে সময় নষ্ট না করে কাস্তে হাতুড়ি, 'ব্যাদে সব থাকায়' লেখকরা কালি কলম, বই খাতা সব নদীতে নিক্ষেপ করেছে। তারা আক্ষেপ

করে গাইছে –'দিন গেল মিছে কাজে ... না ভজিনু রাধাকৃষ্ণ...' ইত্যাদি ভক্তিভাবের চাটুকারি কীর্তন। চাষীরা তাদের গোরু বলদ মাঠে ছেড়ে দিয়ে ঈশ্বর ধ্যানে বুঁদ। চাষের কথা বললে জিভ কেটে বলে 'জিভ দিয়েছেন যিনি–আহার দেবেন তিনি।' এবং তাদের নিরেট মগজ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে ফেলেছে গুরুবাক্যটিকে। কোন চিন্তন মনন নেই, যুক্তি–তক্ক নেই। বলে, 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ – তক্কে বহুদূর'। পবিত্র গ্রন্থে বর্ণিত গুলগাপ্পা, গালগপ্পো, ঠাকুর দেবতাদের লীলাকাহিনি, শাস্ত্রবাক্যকে শিক্ষিত ডিগ্রিধারীরাও সত্যি বলে মেনে নিয়েছেন। নামি দামী বিজ্ঞানীরাও বাদ যাচ্ছেন না। তাঁরা বলছেন সাধু–সন্ত, ঠাকুরদেবতা বাবাজী মাতাজীরা যদি কোনো পার্থিব কাজ না করেই বেঁচেবর্তে থাকতে পারে, তবে তারাইবা পারবে না কেন? তারা অনর্থক চাষবাস, শিল্প বাণিজ্য করবেইবা কোন দুক্ষে?

ব্যবসায়ীরা টাকা রোজকারের ধান্ধা ছেড়ে দিয়ে সবাই রামকৃষ্ণ হয়েছে। মা কালীর সামনে বসে শুধু 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' গাইছে। ওরা আজ কামিনী কাঞ্চনের মায়ামোহ থেকে মুক্তি পেয়েছে। বিদ্যাচর্চা ধর্মের অন্তরায়। 'যত বেশি জানে, তত কম মানে'। তাই শিবপুর, যাদবপুর পলিটেকনিক মেডিকেল সব ছাত্রশূন্য মরুভুমি। সক্রেটিস, গ্যালিলিও, কোপার্নিকাসদের আবার নতুন করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে। ঈশ্বরশত্রু ডারউইনও সিলেবাস থেকে বাতিল। চিকিৎসাশাস্ত্র, ইতিহাস, দর্শনের অপবিত্র বইগুলি পথের ধুলায় গড়াগড়ি। মঠ মন্দির, গির্জা মসজিদে ছাত্ররা সব শুধু গীতা, কোরান, বাইবেল কেতাবগুলি দুলে–দুলে সুর করে মুখস্ত করছে। শনি–মনসা, বাবাজি মাতাজীদের ঠেক থেকে কেবল নানা পাঁচালীর পুণ্যসংগীত ভেসে আসছে। টিভির সিরিয়ালে, সিনেমার পর্দায়, থিয়েটারের মঞ্চে গুরুবাবা–ঠাকুরদেবতারা অলৌকিক ম্যাজিক, অলৌকিক গালগপ্পো

দেখাচ্ছে। এমনকি শিক্ষিত ভদ্রালোকেরাও বই পড়া ছেড়ে দিয়ে সেসব পবিত্র গুজবকাহিনি গিলছেন সকাল সন্ধ্যা।

একথা সবার জানা যে, গোরু-ছাগলদের যেমন জন্ম হয়েছে মানুষের খাবার টেবিল আলো করবার জন্য, তেমনি মানুষের সৃষ্টি হয়েছে শুধুমাত্র মোক্ষলাভ করে ঈশ্বরের শরীরে বিলীন হয়ে যাবার জন্য। মানুষরূপে বেঁচে থাকার জন্যও নয়। মানবজীবন ঈশ্বরের স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়। বিজ্ঞানীদের ভাষায় 'unimportant byproduct of the nature'. ধানের যেমন ফলন হয় সিদ্ধ ভাত হয়ে মানুষের উদরপূর্তির জন্য, তেমনি মানুষের সৃষ্ট হয়েছে সিদ্ধিলাভের / মোক্ষলাভের পর ঈশ্বরের দেহপুষ্টির নিমিত্য। অনেক সাধুসন্ত বাবাজী মাতাজী আবার প্রি-বয়েল্ড রাইসের মত জন্মসিদ্ধ। জন্ম থেকেই ভগবানদের ডাইনিং টেবিলে সরাসরি পরিবেশিত হবার উপযোগী। অন্য সাধারণ মানুষেরা পুষ্পাঞ্জলি, আরতি, ঘর্মাক্ত দেবতাদের গায়ে চামরের বাতাস দেওয়া ইত্যাদি নানা ধর্মীয় নাটক করে ধর্মসিদ্ধ হয়ে ঈশ্বরের দেহে প্রবেশের ভিসা পায়। যারা তা করে না, সেই সব জ্যান্ত মরণোত্তর পাপীরা বীজধানের মত আবার জন্মায় পৃথিবীর মাঠে। সেই হতভাগারা ধান জীবন, মানবজীবনকে জীবনের সার মনে করে মানুষের জীবন উপভোগ করে পাপবৃদ্ধি করে। মানুষ যেমন ছাগল-ভেড়াকে ঘাসপাতা খাইয়ে মাংসাল করে ডাইনিং টেবিলের উপযোগী করে, নানা ধর্মের নানা ভগবানেরা তেমনি মানুষের চাষ করেন। ওদের এটা দিয়ে, ওটা কেড়ে নিয়ে, আনন্দ দিয়ে, কষ্ট দিয়ে, আদর করে, হত্যা করে, জবাই- বলি দিয়ে ভগবৎলালসা চরিতার্থ করে লীলাখেলা করেন। অত্যাচারী মানব বিদ্বেষী ঈশ্বরের মার খেয়ে মনোবিকারগ্রস্থ অভিমানী অসহায় মানুষ 'প্রভু, এমনি করে আমায় মারো' গেয়ে মানসিক শান্তিলাভ করে।

নানা জাত ধর্মের নানা ভগবানদের এই মহিমা, জীবনধারণের এই সার কথাটা মানুষ এতদিন বোঝেনি। তারা গাছ জীবন, ছাগল জীবন, মানব জীবনকে জীবনের উদ্দেশ্য বলে ভাবত। মোহগ্রস্থ নির্বোধ মানুষ বেঁচে থাকার জন্য, আরও ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য নানা ধরনের মানবসুলভ কাজকর্মে ব্যস্ত থাকত। উন্নততর জীবন উপভোগের জন্য নানা নতুন নতুন উপকরণ বানিয়ে অযথা সময় নষ্ট করত। রোগব্যাধি থেকে রক্ষা পাবার আশায় ওষুধ, প্রকৃতির প্রতিকূলতা থেকে বাঁচবার জন্য ঘরবাড়ি, বন্যা থেকে বাঁচবার জন্য বাঁধ নালা বানাত। এমনকী ভবিষ্যৎ বংশধরদের মঙ্গলের জন্য নানা পেশার অধার্মিক মানুষ বোকার মত নানা ধরণের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরিক্ষা অনুসন্ধান আলোচনা করত। কিন্তু এখন তারা মানব জীবনের আসল উদ্যেশ্য বুঝে ফেলেছে। তারা সবাই দিব্যজ্ঞানী, আত্মাজ্ঞানী আত্মজ্ঞানী হয়ে গেছে। অহেতুক জীবনচর্চা না করে সবাই এখন ঈশ্বরের পেটে ঢুকে তার দেহের সাথে লীন হয়ে মোক্ষলাভের ধর্মীয় প্রচেষ্টা করছে।

ধর্মের আসল উদ্দেশ্যটা বুঝছিলেন সামান্য জনা কয়েক মুনি ঋষি, বাবাজী মাতাজী, রামকৃষ্ণ, নিমাই, বালক, নাবালক, লোকনাথের মত গোনাগুন্তি সাধক। সেই পরজীবীরাই মানবসুলভ কাজকাম না করে, জীবন ও জীবিকার ধান্দা না করে পরোপুরি ঈশ্বরসেবা করে মোক্ষলাভ করতেন। বাকি সব হাফ-কোয়ার্টার দু-আনি এক-আনি পার্টটাইম ধার্মিকরা তাদের পার্থিব ভোগলালসা মিটিয়ে অবসর সময়ে মাঝে মাঝে ভগবানকে ডেকে ধর্মপালন করতেন। তাও আবার সৌভাগ্য স্বর্গের লোভে আর নরকবাসের ভয়ে। চার্বাকেরা বলতেন, ‘ধর্মভীরু ভয়েই মরে, যমের পাইক পা-ছে ধরে’। এমনকি তাঁরা জীবসেবা ভোটারসেবার বকলমে শিবসেবা করতেন

নিছক পাটোয়ারী কায়দায়।

আজ আর সেইদিন নেই। চারিদিকে শুধু ফুলটাইমার সাধুসন্ত বাবাজী মাতাজীরা জোঁকের মত কিলবিল করছে ঘোলা জলে। তবে এই ঐতিহাসিক পবিত্র মুহূর্ত সহজে আসেনি। বহু ঝক্কিঝামেলা, যুদ্ধবিগ্রহ, ধর্মীয় দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বসনিয়া আলজিরিয়া, ক্রুসেড-কুচক্র, বিদ্রোহী হজম, নাস্তিক খতম করতে হয়েছে ভগবান, আর তাঁর সহযোগী পার্থিব এজেন্ট-প্রতিনিধিদের। হতভাগ্য ভগবান স্বয়ং মাঝে মাঝে, যুগে যুগে এ পৃথিবীতে সম্ভভামী করেও বিশেষ কিছু সুবিধা করতে পারেননি। বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ কেউ তাঁদের নিজ নিজ শীষ্যদের মানুষ করতে পারেননি। গৌরাঙ্গদেব সামান্য কজন কীর্তনীয়াকে হাত তুলিয়ে নাচিয়েছেন মাত্র। কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর মায়াপুরী আসল শিষ্যরাই ‘তাই বলে কী প্রেম দেব না’ না গেয়ে তাদের মাঠে ঘাস কাটতে আসা গো-পালকদের গুলি করে মারছেন।

কিন্তু আজ? আজ চাকা সম্পূর্ণ ঘুরে গেছে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে গোয়েবলীয় প্রচার কৌশলকে বলিহারি। সমগ্র মানবজাতির মনকে একেবারে ওলটপালট করে দিয়েছে। মগজদূষনে কলুষিত পুণ্যবান মানুষ শুধু ভগবানদের নাম করছে, রাস্তায় কারও সাথে দেখা হলে ‘সুপ্রভাত’, ‘গুড মর্নিং’ না বলে ‘হরে কৃষ্ণ’, ‘জয় শ্রী রাম’, ‘গড ব্লেস ইউ’ ইত্যাদি বলে ফাঁকতালে বাড়তি পুণ্য করছেন। রাস্তা ঘাটে, বাজারে হাটে, কোর্টের গেটে, শ্মশান মাঠে দেব-দেবীরা যে যেখানে পারে বসে যাচ্ছে প্রণামী থালা পেতে। মানুষ শুধু যাগযজ্ঞ করছে, হোম করছে, নামাজ পড়ছে, গায়ত্রী জপছে। না, না শুধু ত্রিসন্ধ্যা নয়, সারা দিন রাত ধরে তারা ঘন্টা বাজিয়ে আমেন আমেন, ওং বোম করছে, মালা জপছে, হাতলাটু ঘুরিয়ে মণিপদ্মে হুম করছে, গাঞ্জা টানছে, চোলাই গিলছে। পুরুত যাজক মোল্লা রিয়াল এস্টেটের দালালদের

কাটমানি দিয়ে স্বর্গের এপার্টমেন্টগুলিতে দক্ষিণ খোলা ফ্লাট বাংলো বুক করে রাখছে পুরুত যাজক মোল্লা ইত্যাদি রিয়াল ইষ্টেটের দালালদের প্রণামী আর নেতামন্ত্রীদের কাটমানি দিয়ে। মরার আগে। মানে বিপ্লব সম্পূর্ণ সফল হয়ে ভগবানের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে যা হয় আর কি।

আদি ভগবানের মনে আজ তাই প্রবল পুলক। সার্থক তাঁর ভগবান জনম। পৃথিবীর সুবিশাল জমিতে তাঁর মানুষ চাষ সফল। সবাই পূর্ণ সাক্ষর হবার পর পূর্ণ দিব্যজ্ঞানী হয়েছে। মানুষ বুঝেছে, এবং সত্যি সত্যি বুঝেছে- মানে হৃদয়ঙ্গম করেছে যে জগতের সব কিছু মিথ্যা মায়া। কামিনী কাঞ্চন, যশ-নোবেল পুরস্কার সবই পাপীদের মোহ মাত্র। ধর্মই সত্য। পরম করুনাময় ভগবানই সত্য। তারা বুঝেছে যে ভগবান নিছক কল্পনাবাদীদের স্বপ্নের ফসল নয়। রামচন্দ্রের জন্ম 'কবির মনোভূমিতে' হয়নি। ঈশ্বর শব্দটি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন নয়, সম্পূর্ণ নিরেট কংক্রিটের মত কংক্রিট নাউন।

তাই আজ ভগবান আনন্দে আত্মহারা। আজন্ম পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করে অবশেষে সুদিন এসেছে। যুক্তিবাদীদের মুখে ছাই দিয়ে, চার্বাকদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে তিনি আজ সমগ্র মানবহৃদয় সম্পূর্ণরূপে জয় করেছেন। একটি হৃদয়ও বাকি নেই। কারও মনে তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতি এতটুকু সন্দেহ, অনাস্থা, অবিশ্বাস নেই। এতদিনের নিরলস প্রচেষ্টা স্বার্থক, মনোবাসনা পূর্ণ। ধন্য সাধুদের প্রচার, ধন্য টিভির লাগাতার বিজ্ঞাপন, ধন্য পুরুত যাজকদের সেলসম্যানশিপ, ধন্য নেতামন্ত্রীদের ভাষণের মহিমা।

আজ ভগবানের কোন বিরোধীপক্ষ নেই। তিনি আজ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একছত্র অধিপতি। প্রবীর ঘোষ-কভুর, চার্বাক- সার্ত্রে, ব্রুনেই-গ্যালিলিও, নাস্তিক-যুক্তিবাদী, প্রগতিবাদী-মানবতাবাদী, কম্যুনিস্ট-সোশ্যালিস্ট, মার্ক্স-

লেনিন-সব কুপোকাৎ। আজ ভগবানের বড়ো আনন্দের দিন।

সে আনন্দের ভাগ দেবার জন্য ভগবান মহাশয় ছোটো বড়ো বাবাজি মাতাজী সাধু সন্ত স্বর্গবাসী দেবদেবী, স্বর্গে ডোমিসাইল্ড প্রাক্তন পৃথিবীবাসীদের নেমতন্ন করে বিজয় উৎসব উপলক্ষে এক বিশাল পার্টি দিচ্ছেন। হাজার হাজার বছরের ঝগড়া বিবাদ শত্রুতা ভুলে তিনি তাঁর সহকর্মী- কলিগ ম্লেচ্ছ ভগবানদেরও আমন্ত্রণ করেছেন তাঁর থ্রো করা পার্টিতে। স্বর্গধামের নাচঘরে মেনকা রম্ভাদি স্বর্গবেশ্যামাতারা নৃত্য পরিবেশন করছেন। সমস্ত আমন্ত্রিত ভগবান ও দেবদেবীগণ পবিত্র কারণবারি পান করছেন। ফুল চন্দন আতরের সাথে চোলাই হুইস্কিগন্ধের ককটেলে হলঘর ম ম। যুক্তিবাদীদের মুখে ছাই দিয়ে ভগবান তাঁর ক্ষমতার দম্ভ উপভোগ করছেন সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে। মনে মনে বলছেন, ‘দ্যাখ, আমার এলেম দ্যাখ অবিশ্বাসীরা।’

পার্টি বেশ জমে উঠেছে। সনাতনী প্রাচ্য থেকে সিন্নী, মধ্যপ্রাচ্য থেকে কুরবানি করা উট শুয়োর গোরু, আফ্রিকাতে বলি দেওয়া মাংসের রাজা সুস্বাদু নরমাংস, ইউরোপ থেকে ভেট পাঠানো স্কচ, সানফ্রান্সিসকোর কুড়ি লক্ষ টাকার মহার্ঘ শ্যাম্পেন—সব কিছুর ছড়াছড়ি। পচাকলা-বাতাসা-অনুব্রত মন্ডলমার্কা বাতাস নকুলদানাদি দেবতাভুলানো অখাদ্য নয়, কালিয়া কোপ্তা, ফিশরোল, বিফরোলাদি মনুষ্যভোগ। ছাগলের শুধু গরম রক্তটুকু নয়, পুরো আস্ত পাঁঠা, চন্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত্বে উৎসর্গ করা শুকনো বিধবা নয়—পুরী থেকে পাঠানো টাটকা দেবদাসী। মানুষ এখন সব কিছু নিঃশেষে দান করেছে ভগবানের আকাউন্টে। তাই স্বর্গে আজ পাঁচতারার বিলাস, হাজার তারার নাচ, লক্ষতারার ফুর্তি, কোটি তারার বৈভব প্রদর্শন। আম্বাদিনের জন্মদিনের অনুষ্ঠানের মত।

সবার চোখে রং। পার্টি চরম পর্যায়ে জমে উঠেছে। স্বর্গবাসী তানসেন, আলাউদ্দীন খাঁ এদের শেষ পর্যায়ের ঝালার গলা কাঁপুনি, মুখে ফেনা, তবলচির আঙ্গুল অদৃশ্য, নৃত্যরতা উর্বশী মেনকা রম্ভা মাতাদের পা নুপুর আর দেখা যাচ্ছে না। তাঁরা ভানু বন্দোপাধ্যায়ের কাছ থেকে সদ্য শেখা পার্থিব 'হাম হাম গুড় গুড়' ঘরানার ইমপোর্টেড নাচ নাচছেন। ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্যশিল্পী মহাদেবও প্রলয় নাচন নাচতে শুরু করেছেন ডমরুর তালে তালে। উত্তেজিত নিমন্ত্রিত ও উপস্থিত দেবতারা চুমুক না দিয়ে ঢক ঢক করে গিলছেন স্বর্গীয় কারণবারি। এমনকী মাদকবিরোধী লিঙ্কনসাহেবও উত্তেজিত হয়ে একটা রঙিন গ্লাস তুলে নিলেন ক্যাটারারের ট্রে থেকে।

এমন সময় রসভঙ্গ। ঝগড়া বাগড়ার দেবতা মহামতি নারদ ঢেঁকিটা পোর্টিকোতে পার্ক করিয়ে ছুটতে ছুটতে ঢুকলেন হাঁপাতে হাঁপাতে। ভগবান তাঁকে মর্ত্যে পাঠিয়েছিলেন তাঁর সম্প্রতি বিজিত পৃথিবীর অবস্থার সরেজমিন তদন্তে। প্রধানমন্ত্রীর মত অন্তর্যামী ভগবানও তাঁর নিজস্ব দৈব চ্যানেলে অবশ্য সব কিছু দেখতে পারতেন। কিন্তু হরিকীর্তন বিলাসী চাটুকারপ্রেমী ভগবানের ইচ্ছা ছিল নারদকণ্ঠে তাঁর সুকণ্ঠী রিপোর্টগীতি তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করার। তাঁর পৃথিবীবিজয়ের উপাখ্যান প্রাণভরে অন্যের মুখ থেকে শ্রবণ করা। তাঁর মহিমার কথা তৃতীয়পক্ষ মারফৎ অতিথিদের শোনানো। যেমন করে রাজসভায় অহংকারী রাজ-রাজারা তাঁদের সত্যিমিথ্যে বীরত্ব কাহিনি শোনাতেন রাজকবিদের মুখ মারফত। ডাহা মিথ্যা বুঝেও অপরের মুখে নিজ গুনগান শুনতে কার না ভালো লাগে। ভগবানেরও সে দুর্বলতা আছে বৈকি। তা না হলে তিনি মহালয়ার ভোরে বীরেন ভদ্র শোনেন কেন।

কিন্তু নারদের কপালের শিরা ফোলা কপাল, বুকের

নাচন, উত্তেজিত বদন দেখে দেবদেবী ভগবান কিছু একটা সিরিয়াস অঘটন অনুমান করলেন। তেনাদের নেশা গেল ছুটে। নাচ গেল থেমে। সংগীত বন্ধ। উল্লাস স্তব্ধ। চারিদিক নিথর নিস্তব্ধ।

এক মাতাল দেবতা তাঁর কম্পিত হাতে একটা টুল এগিয়ে দিলেন নারদের দিকে। টুলাসনে বসে তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁর শিরাফোলা কপালের ঘাম মুছতে লাগলেন একটা কাগজের ওয়াইপার বক্স থেকে টেনে নিয়ে। ভগবান সহ উপস্থিত আমন্ত্রিতগণ খারাপ সংবাদ শোনার আশঙ্কায় রুদ্ধশ্বাসে বসে আছেন নিঃশব্দে। ওনার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন উপস্থিত সবাই। ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে নারদকে কোন প্রশ্ন করার সাহস পেল না কেউ। তাঁর চোখের দিকে তাকাতেও পারছেন না কেউ। চিফ হোস্ট স্বয়ং ভগবানও নয়।

খানিক জিরিয়ে নেবার পর বুক ধরপড়ানি বন্ধ হলে নারদমুনি কোন ভনিতা না করে হড় হড় করে বলে উঠলেন, 'ঠাকুর দেবতা, বাবাজী মাতাজীদের আজ ঘোর দুর্দিন। তাদের আয়ু শেষ। স্বয়ং ভগবানও মৃত্যুপথযাত্রী।' বলেই একটু দম নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন, 'কেন? কেন? কোন অসুর দানব কিংবা মহাপাপী যুক্তিবাদীরা স্বর্গরাজ্যে হানা দিচ্ছে নাকি?'

নারদের সে সুকণ্ঠ আর নেই। এক গ্লাস পানীয় গলায় ঢেলে খসখসে ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন, 'আমরা স্বীকার না করলেও এ কথা সত্য যে, মানুষই হল আমাদের জন্মদাতা, আমাদের রক্ষাকর্তা। যেখানে যে গ্রহে মানুষ নেই সেখানে আমরাও নেই। সাড়ে চার কোটি বছর আগে পৃথিবীর, আর ত্রিশ লক্ষ বছর আগে মানুষ, আর মাত্র বড়োজোর দশ পনের হাজার বছর আগে মানুষের মস্তিস্কের কল্পনা করার ক্ষমতা জন্মানোর পর মানুষের সেই পরিপক্ক মগজ থেকেই আমাদের জন্ম। তারআগে এই স্বর্গে কেন,

সারা পৃথিবীতেও দেবতাদের অস্তিত্ব ছিল না।আমাদের ঘরবাড়ী, মঠমন্দির মসজিদ চার্চ কিচ্ছু ছিল না। অন্যান্য কোন গ্রহে তাই কোনো মানুষও নেই, সেহেতু আমরাও নেই। আবার মানুষ না থাকার কারণে মঠমন্দিরও নেই। রামমন্দিরও নেই, বাবরি মসজিদও নেই। মানুষের মগজেই আমাদের জন্ম, মানুষের মগজেই আমাদের মৃত্যু। তাদের মগজেই স্বর্গের প্রতিষ্ঠা। সেই মানুষ আজ অবলুপ্তির পথে। ডাইনোসোরাসদের মত। তাদেরই মত মানুষও থাকবে না এই ধরাধামে। আর এই মানুষ না থাকলে ভুত ভগবান দেবদেবীরাও থাকবে না।

‘ভিখারী আছে বলে যেমন লঙ্গরখানার মালিকেরা করে খাচ্ছেন, অনাথ আছে বলে মাতা টেরিজা সন্ত হচ্ছেন, নোবেল পাচ্ছেন। গরিব আছে বলে যেমন নেতামন্ত্রীরা আর তাদের ফোর্ডেরা সমাজসেবা, মা মাটি মানুষের সেবা করে কাটমানি কামাচ্ছেন, তেমনি মানুষ, বিশেষ করে পাপী মানুষরা আছে বলেই আমরা ভগবানগিরি, সাধুগিরি, বাবাজীগিরি করে প্রণামী কামাচ্ছি। কোনো কাজকর্ম না করেই বিলাসী জীবন উপভোগ করছি। কী, ঠিক বলছি কিনা?

‘অনাথ তৈরির উৎস বন্দনা করে মাদার অনাথ বৃদ্ধির চেষ্টা করছেন। অনাথ কমে যাবার আশঙ্কায় জন্মনিয়ন্ত্রণ টনের বিরুদ্ধে লড়ছেন। ভোট বক্তৃতায় চেঁচালেও চতুর নেতা-মন্ত্রীরা গরীব হটিয়ে নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারেননি। কিন্তু স্বর্গবাসীরা নির্বুদ্ধি আহাম্মক। ভগবান দেবদেবীরা নিজের মঙ্গল বোঝেন না। তাঁরা পৃথিবীর পূর্ণস্বাক্ষরতার খবর শুনে উৎসাহিত হয়ে সবাইকে পূর্ণধার্মিক বানিয়ে দিলেন। ফলস্বরূপ আমাদের জন্মদাতা, আমাদের অন্নদাতা, সিন্নী বাতাসা দাতা, আমাদের রক্ষাকর্তা, আমাদের পিতা শ্রী শ্রী মানব প্রজাতি আজ অবলুপ্তির পথে। পরবর্তী প্রজন্মে আর কোনো মানুষ থাকবে না। বর্তমানেরটাই মানুষের শেষ প্রজন্ম, শেষ স্টক। যমদূতেরা স্টক ক্লিয়ারিং শুরু করে দিয়েছে। নতুন

মানুষের প্রোডাকশন বন্ধ। এখনকার স্টকের মানুষগুলো মরার, থুড়ি দেহত্যাগের পর স্বর্গে এসে নরক গুলজার করবে। সবাই ধার্মিক হবার কারণে কেউ নরকেও যাবে না। যমরাজ দেবতাকে স্বেচ্ছাবসর নিতে হবে। নতুন মানুষ আর পৃথিবীতে জন্মাবে না। ভোগবিলাসের লোভে মানুষ যেমন বৈজ্ঞানিকদের কথা না মেনে একসময় জঙ্গল কেটে, কয়লা পুড়িয়ে মানুষ সহ প্রকৃতিকে বিনাশ করতে যাচ্ছিল স্বর্গবাসীরা তেমনি আরও চালকলা, আরও তেল-পূজা-চাটুকারিতা পাবার লোভে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এনেছেন। দেবতাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। প্রকৃতির ভারসাম্যের দফারফা। (ভগবান একটু নড়ে চড়ে বসলেন)

'এ কাজে সহায় হয়েছেন বাবাজী মাতাজী সাধু সন্ত ইত্যাদি, আর ভগবানের ক্যাডার কুনকি ইত্যাদি পার্থিব এজেন্টরা। ওরা ক্রমাগত প্রচার চালিয়ে, নরকের ভয় দেখিয়ে সৌভাগ্য-স্বর্গের লোভ দেখিয়ে পৃথিবীতে সর্বনেশে ধর্ম সম্পূর্ণরূপে স্থাপন করেছে। মানুষদের মনুষ্যসুলভ মনুষ্যত্ব বোধবুদ্ধি, বিচারবুদ্ধি বিবেচনাশক্তি লোপ পেয়েছে। তারা ধার্মিক হয়ে গেছে। সংক্রামক ধর্মরোগ মহামারীর রূপ ধারণ করেছে। তারা মনুষ্যত্ব হারিয়ে দেবত্ব অর্জন করেছে। এমনকী বাতেলাসর্বস্ব মার্ক্সবাদী ছুপা আস্তিক কম্যুনিস্টদেরও দশ আঙ্গুলে বারোটা পাথর। তারা মার্ক্স লেনিন, জ্যোতি বোসের ছবির পাশে সাজানো লোকনাথ কালী মনসাকে ফুল বেলপাতা নকুলদানা বাতাসা দিয়ে তেলবাজী-চাটুকারী করছে। বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিকরাও লাজলজ্জার মাথা খেয়ে প্রকাশ্যে মা-দুলি বাবা-দুলি দোলাচ্ছেন। তাঁরা নারকোল ফাটিয়ে শুভদিনে রকেট ছাড়ছেন, রথ টানছেন, গণেশকে দুধ খাওয়াচ্ছেন, ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে শনিকে তেল মারছেন শনিবার এলে। শিক্ষিত ভদ্রলোকেরাও অসভ্য লোকেদের মত বেআইনীভাবে জাত-ধর্মের উল্লেখ করে পাত্রপাত্রীর

বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। ধার্মিক সমাজবিরোধীরা বিধর্মী খুন করে পুণ্য করছে। দেশের রাষ্ট্রপতি, জজ-সাহেবরা পর্যন্ত জনগণের পয়সা পেট্রল খরচ করে মন্দিরে মন্দিরে হত্যে দিচ্ছেন। মানে সর্বনেশে ধর্ম পৃথিবীর সর্বমনে সর্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।'

প্রবল অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন ভগবান। একনাগাড়ে মিনিট পাঁচেক দমকা হাসির পর একটু শান্ত হয়ে উবাচ করলেন, 'অরে ইয়ার, এতো আনন্দ সংবাদ। এতে ঘাবড়ানোর কী হলো? আমি তো এটাই চেয়েছিলাম। পৃথিবীতে ধর্ম স্থাপন করাই তো আমাদের টার্গেট। তাই কিনা?'

উপস্থিত ভগবৎ অতিথিরা শিস হাততালি দিয়ে ভগবানকে সমর্থন করলেন হিটলারের চাটুকারদের মত। বিচক্ষণ নারদদেব বজ্রগম্ভীর গলায় বললেন, 'ধীরে গুরু, ধীরে। আপনার নেশাটা বড্ড বেশি হয়ে গিয়েছে মনে হচ্ছে। শিক্ষিত মানুষের মত একটু তলিয়ে দেখুন। আপনার পৃথিবী পলিসি, বিশেষত: পূর্ণ-দিব্যজ্ঞান কর্মসূচী সম্পূর্ণ অদূরদর্শীতার পরিচয়। সৃষ্টি রক্ষার উদ্দ্যেশ্যেই কুকুরকে কুকুর, গোরুকে গোরু ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়েছিল সেকথা আপনি বিস্মৃত হয়েছেন। গাধার শরীর-মনে-জীনে গাধাত্ব, বাঘের মনে বাঘাত্ব, মানুষের মনে মনুষ্যত্ব ইন্স্টল করা হয়েছিল। টিকা দেবার মত মাত্রা অনুযায়ী স্বল্প পাওয়ারের অল্প অল্প পাপ ও কাম ক্রোধ ইত্যাদি ছয়টা রিপু মানুষের জীনের মালায় আপনি যে গেঁথেছিলেন সেকথা কী মনে পড়ে মহামান্য সর্বশক্তিমানের? মানবিকধর্ম অনুযায়ী মানুষকে দেওয়া হয়েছিল বুদ্ধি বিবেচনা করে ছয় রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করবার অধিকার, যা মানুষ ছাড়া অন্য কোনো পশুকে দেওয়া হয়নি। মানুষের অন্তরে যৌন কাম ছিল বলে তারা ছেলেমেয়েদের জন্ম দিত, আবার অন্য দিকে লোকসংখ্যার ব্যালেন্স রাখার জন্য জন্মনিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থাও করত। প্রেম ভালোবাসা, মায়া-মমতা ছিল বলে তারা

সন্তানদের প্রতিপালন করত। লোভ ছিল বলে তারা অর্থনৈতিক কাজকর্ম করত, সম্পত্তি বাড়ানোর চেষ্টা করত, মোহ ছিল বলে সম্পত্তির অপচয় করত না, নিজের জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা করত শেষ সময় পর্যন্ত। তারা মাঠে চাষ করত, কারখানায় হাতুড়ী পেটাত, স্কুল কলেজে পড়াশুনা করত – সুখে আনন্দ, দুঃখে শোক করত। আপনার সৃষ্টি সুরক্ষিত হত। আজ তারা সব রিপু জয় করে দিব্যজ্ঞানপ্রাপ্ত প্রেম মায়া মমতা বাবাজী মাতাজী সাধু সন্ন্যাসীদের মত হীন শুকনো কঠিন অমানুষ হয়ে গেছে। তারা প্রাকৃতিক মানবধর্ম পরিত্যাগ করেছে। চাষীরা চাষ করছে না, ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করছে না, মেয়েরা শাড়ী গয়না পরে পুরুষদের মন জয় করবার জন্য নারীসুলভ চেষ্টা করছে না। অবচেতন মনের লালসা তার রূপসজ্জা নেই। মানুষের অন্তরে কোন রোমান্স নেই। নিজ স্ত্রী/প্রেমিকাদের 'ম্যা ম্যা' ডেকে পুজো করছে। বংশবৃদ্ধি সম্পূর্ণ বন্ধ। সবাই 'কা তব কান্তা' গাইছে। ছেলেমেয়েগুলো অনাথদের মত পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুত্র-কন্যা, পার্থিব আনন্দ উপকরণ, মজা ফুর্তির প্রতি কারও কোন মোহ নেই। সব বিষয়ে তারা উদাস – নিস্পৃহ নির্বিকার। সবাই হয়েছে নিস্কর্মা নিস্ফলা সাধুসন্ত বাবাজী মাতাজী দেবতা ভগবান। তারা বিকারগ্রস্থ ফুল বিশ্বাসী। তারা সবাই হয়েছে রামকৃষ্ণ, বামাখ্যাপা, লোকনাথ, প্রহ্লাদ। তারা গণেশকে দুধ খাওয়াচ্ছে, বাঘমাতার গলায় মালা পরিয়ে বাঘের পেটে নির্বাণ লাভ করছে, হাতিকে পুজো দিয়ে তার পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে স্বর্গে যাচ্ছে। এবং এর ফলে হচ্ছে মানব প্রজাতির অবলুপ্তি। নিউক্লিয়ার বোমার মত ধর্মবোমা মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে।'

সব শুনে ভগবানের মাথা গেল গুলিয়ে। কপাল উঠল ঘেমে। মাথার পেছনের আলোর চক্র হোল আবছা। চরম বিপদের কালো মেঘের ছায়া তাঁর মনে জাগ্রত

হল। অস্তিত্ব তাঁর বিপন্ন। ভয়ে হতাশায় কাতর হয়ে মহাপন্ডিত বিচক্ষণ নারদের কাছেই পরামর্শ চাইলেন সর্বনাশ থেকে বাঁচবার জন্য। একটা ছোট্ট ব্রেক নিয়ে তিনি বাথরুম থেকে ফিরে এলে নারদ বললেন, 'এ বিপদ থেকে বাঁচবার একটিমাত্র উপায় আছে। মানুষকে ধার্মিক না করে প্রকৃতির নিয়ম মেনে ওদের মানুষ থাকতে দিন। তাদের কাম ক্রোধাদি রিপু ফিরিয়ে দিন। তাদের হৃদয় মস্তিস্ক আবার সচল করুন। তারা প্রকৃতির নিয়ম মেনে মানবতাবাদী যুক্তিবাদীই থাক। মানবধর্ম বিরোধী ঢপবাজ পুরুত গুরুবাবা জ্যোতিষদের অপপ্রচার বন্ধ করুন। ধর্মীয় পিনাল কড অনুযায়ী তাদের নরকে পাঠান। মানুষ আবার যুক্তিবাদী হয়ে উঠুক। তারা কল্পনাবাদী না হয়ে বাস্তববাদী হয়ে উঠুক। পৃথিবী প্রাকৃতিক হোক, পৃথিবী স্বাভাবিক হোক।' ভগবান তাঁর পবিত্র হাতের চেটো দেখিয়ে বললেন 'তথাস্তু'।

অতঃপর কী হলো? সাধু হয়ে যাওয়া সব নিরেট মানুষেরা আবার তাদের মনুষ্যত্ব ফিরে পেল। তাদের যুক্তিবোধ ফিরে এল। তারা বোকা বোকা পুণ্যকর্ম ছেড়ে সৎকর্ম করতে লাগল। কল্পিত অবাস্তব ভগবানকে জানবার জন্য স্তব না করে প্রকৃতিকে, তার নিয়মকে জানার জন্য আবার গবেষণা করতে লাগল স্কুলে কলেজে লাইব্রেরিতে গবেষণাগারে। তারা নিজ নিজ জীবনে মোক্ষ লাভের স্বার্থপর সাধু -সান্যাসীসুলভ উদ্দেশ্য ছেড়ে মানবমঙ্গল, প্রকৃতিমঙ্গলের জন্য আত্মনিয়োগ করল। প্রকৃতি নির্দিষ্ট প্রাচীন সনাতন মানবধর্ম পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হল। অবলুপ্তির অভিশাপ থেকে প্রকৃতির সেরা প্রজাতি বেঁচে গেল। আমেন।

প্রথম প্রকাশ
বেরসিক পরশুরাম জুন ১৯৯৬ সংখ্যা। সমালোচনা
asokdas.godless@gmail.com



শিক্ষা ও মনখারাপের একটি দিন

সত্যিই আজকের দিনে দাঁড়িয়ে শিক্ষা কে যতই ফ্রি বলা হোক না কেন একটি দিন এনে দিন খাওয়া পরিবারের জন্য শিক্ষা এখনও দামী, এ তো গেল শুধু স্কুলের কথা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে দিনের পর দিন খরচের পরিমাণ বেড়েই চলেছে... **সত্যজিৎ ভান্ডারী**

অযোধ্যা পাহাড় পুরুলিয়া অঞ্চলের সাধারণত মানুষের একটি খুবই প্রিয় একটি জায়গা। সেখানে গেলে আর কিছু হোক না হোক প্রকৃতিক সৌন্দর্য দেখে সকল ক্লান্তি এবং মন খারাপের বিনাশ নিশ্চিত।

তবুও আমার কেনো জানি না মন খারাপের অবসান ওই মনোরম সৌন্দর্য করতে করতে পারল না! মন খারাপের আরম্ভটা কিন্তু বহু বছর, মাস অথবা বহুদিনের নয়, মন খারাপটা এই তো কয়েকঘন্টা আগের ঘড়ির কাঁটায় মাপতে গেলে প্রায় চারঘণ্টা বলা যেতে পারে।

মন খারাপের শুরুটা হয়েছিল বার্নপুর স্টেশনে!

মোটামুটি ট্রেনে যাতায়াত করা প্রত্যেক মানুষেরই অভিজ্ঞতা আছে ট্রেনের যে সময়ে আসার কথা তার থেকে একটু দেরী করে আসা। আমরাও সেইদিনটাই বেরিয়েছিলাম অযোধ্যার উদ্দেশ্যে। রীতিমত আমরা দেওয়া সময় থেকে ওই কুড়িমিনিট আগেই পৌঁছেছি, তাই এবার আমাদের করণীয় হচ্ছে অপেক্ষা! তাই স্টেশনের একটি বেঞ্চের পাশে ব্যাগগুলি রেখে বসে পড়লাম। তারপর অপেক্ষা করতে করতে ২৫ মিনিট হয়ে গেল তাও ট্রেনের দেখা নেই। কিন্তু এটা সেই মন খারাপের কারণ না। আসল ঘটনা তো এবার ঘটলো যখন সেই স্টেশনে ভিক্ষা করা একটি বাচ্চা আমার কাছে এসে যথারীতি ভিক্ষে চাইলো, পরনে একটি নোংরা নিচে দিক থেকে ছিঁড়ে যাওয়া বাদামি রোগের গেঞ্জি একটি কালো রঙের হাফ প্যান্ট, যায় হোক সে এসে হাত পাতলো, তাকে ৫টাকা দিলাম! দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম 'পড়াশুনা করিস না? এইভাবে ভিক্ষে কে করতে বলেছে তোকে?'

উত্তরে জবাব এল 'পড়াশুনা তো আগে করতাম এখন করি না' আরেকটা প্রশ্ন সে এড়িয়ে গেল।

তখন জিজ্ঞেস করলাম – 'কেনো পড়াশুনা করতে ভালো লাগে না?' বলছে 'ভালই তো লাগতো স্কুলের যেতাম বন্ধু হয়েছিল অনেক, সৌরভ এবং ইরফান আমার খুব ভালো বন্ধু, কিন্তু এখন তো আর স্কুল যাই না তাই দেখাও হয় না'

মোটামুটি ৬-৭ মিনিট কথোপকথনের পর যা বুঝলাম ছেলেটি – স্কুলে পড়ত ঠিকই তখন তার পরিবার পরিবার বলতে শুধু তার মা তার বাবার সম্পর্কে কিছু বলল না। তার এই বার্নপুর স্টেশনের ভেতরে এবং বাইরে কাজু বিস্কুট, চকলেট ইত্যাদি বিক্রি করত সেই টাকার থেকে সে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে কারণ করোনার সময় লকডাউনের কারণের তাদের সেই অতিক্ষুদ্র দিন

এনে দিন খাওয়া ব্যাবসা বন্ধ হয়ে যায়। এবং হটাৎ তার মায়ের শারীরিক দুর্বলতার কারণে লকডাউনের পরে আর সেই ব্যাবসা উঠে দাড়াতে পারে না। তাই স্কুলের যে নূন্যতম ৭০০টাকা ফি তা না দিতে পারায় তাকে আর স্কুলের ঢুকতে দেওয়া হয় না এবং তার মায়ের অসুস্থতা কারণ তাকে মাত্র ১১ বছর বয়সে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে ভিক্ষে করতে বাধ্য করে। এটা শোনার পর এক গভীর ভাবনায় চলে গেছি সেই সময় দেখি সারা স্টেশন ভিড় ট্রেন এসে পড়েছে ছেলেটিও ভিড়ে হারিয়ে গেছে ওর আর দেখা পেলাম না। ট্রেনে সংরক্ষিত কামরায় উঠে পড়লাম। কিন্তু সেই ছেলেটির কথা আমার পিছু ছাড়লো না।

সত্যিই আজকের দিনে দাঁড়িয়ে শিক্ষা কে যতই ফ্রি বলা হোক না কেন একটি দিন এনে দিন খাওয়া পরিবারের জন্য শিক্ষা এখনও দামী, এ তো গেল শুধু স্কুলের কথা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে দিনের পর দিন খরচের পরিমাণ বেড়েই চলেছে, তারপর সরকারের নতুন শিক্ষানীতির প্রস্তুতিকে ঘিরে সাধারণ মধ্যবিত্ত ছাত্রছাত্রী দের মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি হচ্ছে NEP থেকে শুরু করে PPP কে কেন্দ্র করে। এখনকার শিক্ষানীতিই যখন গরীব মানুষের সামর্থের বাইরে তখন NEP কিংবা PPP শুধু মাত্র সমাজের একটি অংশকে পিছিয়ে দিতে সাহায্য করবে বলে আমার মনে হয়। শিক্ষা বড়োলোককেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে যেটার বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাড়ানোর প্রয়োজন আছে।

এই যে ছেলেটি পরনির্ভরশীল হয়ে যাচ্ছে তাকে তার অধিকার সম্পর্কে কে অবগত করবে? তাকে তার মৌলিক অধিকারের খাদ্য, বাসস্থান, পোশাক সম্পর্কে কে জানবে? তাকে মার্ক্স কে বোঝাবে?

তাকে ভিক্ষার পথ বেছে না নিয়ে খেটে খাওয়ায় পথ অবলম্বন করতে কে বলবে? সকল খেটে খাওয়া মানুষের

অধিকার নিয়ে দাবি করার উৎসাহ প্রদান করে যে লেনিন, তার জীবনে এই লেনিন কে হবে?

তার জীবনের লেনিন হবে শিক্ষার আলো, একটি দাম LED আলোর থেকে সঠিক ভাবে রাস্তা চিনতে সাহায্য করে এই শিক্ষার আলো! শিক্ষা শুধু পরীক্ষায় পাওয়া নম্বর তথা গ্রেড এই সীমাবন্ধ নয়, শিক্ষা তার থেকেও বড়ো কিছু। শিক্ষাই আমাদের মধ্যে চেতনার বিকাশ ঘটায়, শিক্ষাই আমাদের চোরকে চোর বলতে শেখায় এবং সৎ কে সৎ, শিক্ষাই আমাদের আন্দোলন করতে শেখায়, এই শিক্ষাই আমাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শেখায়।

এইসব কথা দ্বারা মাথা পরিবেষ্ঠিত থাকার কারণ হয় সেই 'মন খারাপ' যেটা অযোধ্যার মনোরম পরিবেশ ও আমায় ভোলাতে পারেনি।

কিন্তু সেই ছেলেটার কী হবে? ও শিক্ষা কীভাবে পাবে? নাকি ওকে সারাটা জীবন পরনির্ভশীলতায় বাঁচতে হবে?...



লাট্টু

লাট্টু কিছুতেই মনসাকে ছেড়ে যাবে না। লালিকে দু-বার গুঁতোতে গেল। মনসা আদর করে বলল, 'যা যা। ভয় খাচ্ছিস কেনে। আমি আছি ত। কিছু হবেক না তুর।'... **চম্পা রায়**

ক্যানেলের জলে টুপটুপ শব্দে কাঁকড়ের ডেলা পড়ছে। টুপ শব্দে সবুজ রঙের জল ছোটো ছোটো ঢেউ হয়ে গোলাকারে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যাচ্ছে। ক্যানেলের লকগেট বন্ধ তাই জল ধীর-স্থির শান্ত। বাগদি পাড়া থেকে ভেসে আসছে ঢাকের আওয়াজ। অনেকক্ষণ ধরে ক্যানেলের পাড়ে বসে জলে কাঁকড়ের ডেলা ছুঁড়ছে মনসা। অনেকগুলো কাঁকড়ের ডেলা জড়ো করে বসেছে

সে। শেষ কাঁকড়ের ডেলাটা ছুঁড়তে ছুঁড়তে, লাট্টু—উ, লাট্টু—উ, কুথায় গেলিরে—এ বলে ডাকতে লাগল। পাশের বনকুল ঝোপের আড়াল থেকে ব্যা-ব্যা করে সাড়া দিল লাট্টু। মনসা উঠে বলল, 'আর খেতে হবেনি ঘর চ'।

মনসা এবার ক্লাস টুয়ে উঠেছে। লকডাউনের কারণে স্কুল বন্ধ। ভর্তি হয়ে একদিনও স্কুলে যায়নি। সকালে মা-বাবা কাজে গেলে ছাগলগুলো নিয়ে ক্যানেল পাড়ে চলে আসে। কুকুরের উপদ্রব হয়েছে খুব। বাঁধা অবস্থায় ছাগল দেখলেই কামড়ে জখম করে দেয়। মনসাকে তাই সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ছাগল চরাতে হয়। বিকেলে মনসার ঠাকুমা ঘাসপাতা কেটে আনে। মনসার ঠাকুমা লালির বয়স হয়েছে। এখন মাঠের কাজে নিতে চায় না কেউ। লালি কাজে যায় না, বাড়িতে বসেও থাকে না। সারাদিন টুক-টুক করে কাজ করে। সকালে মনসার মা রেবার রান্নার সময় থাকে না। লালি দুপুরে ভাত ফুটিয়ে নেয়। মাঠঘাট থেকে শাক তোলে। কাদা ঘেঁটে গুগলি ধরে আনে। দুপুরের পর সময় করে পাশের গ্রামে জ্বালানির জন্য কাঠ কুড়োতে যায়। এইসময় গৃহস্থের বাড়ির লোকজন বাড়িতেই থাকে। সেই ফাঁকে চুপিচুপি লালি লোকের বাগান থেকে শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে আনে। মাঝে মাঝে ঠাকুমার সাথে মনসাও কাঠ কুড়োতে, গুগলি ধরতে যায়।

আজ অবশ্য মনসার বাবা মা কেউ কাজে যায়নি। গ্রামে মনসা পুজো। বছরের এই একদিন মনসাদের গ্রামের কেউ বাড়ির বাইরে থাকে না। যারা দূরে কাজ করে তারাও বাড়ি চলে আসে। ঢাকের শব্দে, হাসির কলরবে এই একটা দিন গ্রামটাও যেন হেসে ওঠে। গ্রামের প্রায় সব মেয়ে বৌয়েরা উপোস করে সারাদিন ঠাকুরের থানে থাকে। মাঠেঘাটে জল-কাদায় গ্রামের সবার কাজ। মাঠে ঘাটেই 'মা মনসা'-র বাস। গ্রামের সবাই তাদের দেবীকে সন্তুষ্ট করার কোনো ত্রুটি রাখে না। লালি আগেরদিন

থেকেই ঠাকুরের থানে থাকে। এই দুদিন তার বাড়ির কথা যেনো মনেই পড়ে না।

গ্রামের ঝানু বাগদির উপর ঠাকুর ভর করে। পুজোর সব দায়িত্ব ঝানুর। পুজোর দিন দুপুরের দিকে ঝানু মাথা দোলাতে শুরু করলেই সবাই 'ভর' পড়া দেখতে ভীড় করে। বিকেলের পর পুজো শেষ হয়। সন্ধ্যার দিকে হয় বলি। মানতের পাঁঠাবলি।

মনসা এই দিনে কিছুতেই ছাগল চরাতে যেতে চায়নি। মনসার মা রেবা জোর করে পাঠিয়েছে।

'ছাগলগুলো কী সারাদিন না খেয়ে থাকবেক রে বাপ? তুর ঠাকমাও ঘাস কুড়োতে যাবেনি। ঢাক বাজদে শুরু করলেই ঘর পালিয়ে আসবি। লাট্টুকে আজ লিয়ে যাস না।'

কেনে! লাট্টুর কী খিদা পায় নাই? ছাগলঘরের দরজা খুলতে খুলতে মনসা জিজ্ঞেস করল। মনসাদের থাকার ঘরের পাশেই মাটির দেওয়ালের উপর টালি দেওয়া ছোটো খোপে ছাগলঘর। দু-হাত চওড়া কাঠ দিয়ে দরজা বন্ধ করা হয়।

—লাট্টুর আজ বলি হবেক। চরাতে গেলে কুকুরে কামড়ে দিলে খুঁতে হয়ে যাবেক যে।

—খুঁতে হলে কী হবেক মা?

—ঠাকুর লিবেক নাই উয়াকে।

—ঠাকুর লাট্টুকে লিয়ে কী করবেক?

মনসার মা হেসে বলল, কথা শুনো মেয়ের। ঠাকুর মুক্তি দিবেরে তুর লাট্টুকে।

—মা। ঠাকুর কুথায় থাকে?

—সগ্গে থাকে।

—আমাদের ছাগল ঠাকুরকে কেনে দিব? ঠাকুর সগ্গে নিজে ছাগল পুষে মুক্তি দিক কেনে।

মনসা এখনও পর্যন্ত বলি দেখেনি। দু-বছর লকডাউনের কারণে বড়ো করে পুজো হয়নি। ফুল

বেলপাতা দিয়ে সারা হয়েছে কেবল। তার আগের বছর বলির সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল। এবার সে বলি দেখবে। তার লাট্টুর বলি।

ঝোপের আড়ালে ঘাস চেবানোর মুচ্ মুচ্ শব্দটা এখনও একইভাবে হচ্ছে। মনসা আবার ডাকল 'লাট্টু–উ, লাট্টু–উ। এখনও খাচ্ছিস? মা তুকে আনতেই বারণ করল। তু ঘরে চিঁচাবি বলেই আইনলম। হাঁ দ্যাখ; ঢাক বাজদে শুরু কইরল আবার।'

ঝোপের আড়াল থেকে দুবার ব্যা ব্যা করে পুনরায় মুচ্ মুচ্ করে ঘাস খেতে লাগল লাট্টু।

লাট্টু কখনও অন্যান্য ছাগলদের সাথে ছাগল ঘরে থাকেনি। মনসার সাথেই থাকে। রাতে মনসা আর লালির পায়ের তলায় কোনোরকমে নিজের জায়গা করে নেয়। মনসা ঠাকুমার সাথে বারান্দায় চাটাই পেতে ঘুমায়। লালি বিরক্ত হয় মাঝে মাঝে। মনসার জন্য কিছু বলতে পারেনা লাট্টুকে। লাট্টুকে মারলেই মনসা কাঁদে।

বাড়ির সামনের চওড়া আল রাস্তায় বাঁধা ছিল লাট্টুর মা। নরম মাটিতে খুঁটি পোতা। কয়েকবার টানাটানি করতেই খুঁটি উপড়ে আসে। দড়ি খুঁটি সমেত ছুটে মণ্ডলদের ধানখেতে। গোগ্রাসে ধানগাছ খেয়েছে। জমির জল খেয়েছে। কিছু আগেই সে জমিতে থাইমেট ছড়ানো হয়েছে। সন্ধ্যায় মুখ থেকে গেজলা ঝরেছে। মাঝ রাতে মারা গেছে। লাট্টুর পনেরো দিন বয়স তখন। মায়ের দুধ ছাড়া বাঁচবে কী করে! বার্লি, ভাতের ফ্যানে নুন জল মিশিয়ে খাওয়ানো হতো। ছোটো বাচ্চা নিজে খেতে পারে না। বোতলে ভরে মায়পোস দিয়ে খাওয়াতে হয়। লাট্টুর সাথের বাচ্চাটা বাঁচেনি। ছাগল ঘরে রাখলে অন্য ছাগলরা গুঁতোবে। মনসার সাথেই থাকে সারাক্ষণ। দিনে বেশিরভাগ সময় বাড়িতে কেউই থাকে না। লাট্টুকে খাওয়ানোর দায়িত্ব মনসার উপরে। লাট্টুটাও মনসার

পেছন ছাড়বে না। মনসার সাথে সব জায়গায় তারও যাওয়া চাই। ছাগলছানাটা মনসার সাথে লাট্টুর মত ঘোরে বলে সবাই মনসার লাট্টু বলে হাসে। মনসারও লাট্টু নামটা পছন্দ হয়েছে খুব।

অন্য ছাগলদের তাড়িয়ে এনে বনকুলের ঝোপের পেছনে লাট্টুর কাছে দাঁড়ালো মনসা। লাট্টু দৌড়ে এসে মনসার পায়ে গা ঘেঁষতে ঘেঁষতে পা চাটতে লাগল।

'হাঁ দ্যাখ, ঢাকের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঘর চ। আর খেতে হবেনি। আবার কালকে আসব।'

লাট্টুর কোনো তাড়া নেই। একই রকম ভাবে গা ঘেঁষে যাচ্ছে।

মনসা লাট্টুর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'তুকে চান করাইতে হবে। ঠাকমা বইলল আজ তু মালা পরবি সিন্দুর পরবি। কী মজা বলতো! তুর বলি হবার পর স্বপ্ন থেকে তু মুক্তি আনলেই আমরা ঘর পালিয়ে আসব।'

মনসা ক্যানেলের পার থেকে আলের রাস্তা ধরেছে। লাট্টু 'ব্যা ব্যা' করে পেছন থেকে মনসার প্যান্ট কামড়ে মনসাকে টানছে। এখান থেকে সে যেন কিছুতেই যেতে চাইছে না।

মনসা পেছন ফিরে 'ঘর যাবি না? তবে তু একা থাক। কুকুরে কামড়ালে খুঁতে হয়ে যাবি। কেউ খেলতেও লিবে না তুকে। ঠাকুরও মুক্তি দিবে না। বুঝবি তখন।' বলে সামনের দিকে হাঁটতে লাগল।

লাট্টু 'ব্যা ব্যা' করে জিভ দিয়ে কয়েকবার পেট চুলকে মনসার পেছন পেছন চলল।

২

ছাগল একদম জল পছন্দ করে না। গায়ে এক ফোঁটা জল পড়লেই পাগলের মত ছোটে। লাট্টু এমনিতেই বড়ো মোটাসোটা। শক্তিও খুব। সারাদিন ছাড়া থেকে মনসার সাথে ঘুরে ঘুরে বেশ বড়সড় হয়েছে। বাঁধা ছাগলদের

তুলনায় অনেকটাই বড়ো এবং শক্তিশালী। মনসার বাবা মা লাট্টুকে স্নান করাতে পারছিল না। মনসা সামনে দাঁড়াতেই শান্ত হয়ে গেল।

লাট্টুকে স্নান করানোর পর গলায় গাঁদা ফুলের মালা কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়ে গড় করে প্রণাম করে লালি বলল, 'তুমি আমার লাতিটাকে দেখো বাবা। মা মনসাকে বোলো আমার লাতিটার যেন কুনু বেপদ আপদ না হয়।'

মনসা হেসে বলল, 'হাঁ দ্যাখ লাট্টু। আজ ঠাকমা তুকে পণাম কইরছে।'

লাট্টুকে আদর করতে করতে বলল, 'মা। ঠাকুর শুধু ছাগলদের কেনে মুক্তি দেয়?'

পুজোর জিনিসপত্র জোগাড় করতে করতে রেবা বলল, 'জানি না কেনে। সবাই ঠাকুর থানে ছাগলকেই মানে।'

'মুক্তি দিয়ে ঠাকুরের কী লাভ হয়?'

'ওসব বলিসনি বাবা। ঠাকুর কী আর লাভ ক্ষতি মেনে চলেরে?'

মনসা লাট্টুর গলায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'তু মুক্তি পেলে একাই সবটা লিয়ে লিস না। আমাকেও একটু দিসরে লাট্টু।'

পাশ থেকে রেবা ধমকে বলল, 'ছেলেটা মেলা বকবকাইছে। তুর ঠাকমা তুর ভালোর জন্য ঠাকুর থানে লাট্টুকে মানত করেছে।'

বছর দেড়েক আগে মনসা লালির সাথে গুগলি কুড়োচ্ছিল ক্যানেলের পাশে জলা জায়গাটায়। কলমি শাকের ঝাড়ে ভর্তি জায়গাটা। ঝুপ-ঝুপ শব্দে জলের মধ্যে পা ফেলে এগোচ্ছিল দু-জনে। লালির হাতে চুপড়ি। কয়েক পা এগোলেই জমির আল। বাঁ পায়ের মধ্যে ঠান্ডা নরম কী একটা লেগেছে। পা সরাতেই ব্যাথা পেল। কিছু একটা জোরে ফুঁটেছে যেন। পা তুলেই 'ঠাকমা সাপে খেয়ে নিল গো—ও' চেঁচিয়ে উঠল মনসা। মেটে

রঙের উপর সাদা ছোপ ছোপ জল ঢোঁড়া সাপটা তখনও কামড়ে আছে। মনসার উপর যেন তার ভীষণ রাগ। লালি তাড়াতাড়ি সাপের লেজ টেনে দুরে ছুঁড়ে ফেলল। রক্তে ভিজে গেল মনসার গোটা পা। সেদিন ঠাকুরের থানে এসে মাথা ঠুকে ঠুকে লালি কেঁদে ভাসিয়েছে। নাতির মঙ্গলের জন্য একটা পাঁঠাও মানত করেছে।

৩

ঠাকুর থানে ভীড় হয়েছে খুব। পুজোর প্রসাদ নিয়ে সবাই থানের সামনে জড়ো হয়েছে। বলি হবে একটু পর। প্রসাদ নিয়ে মনসা নিজে একটু খেয়েছে লাট্টুকে একটু দিয়েছে। মনসা যা খায়, লাট্টু ভাগ পায়। এত ভীড়ে লাট্টু কিছুতেই থাকতে চাইছে না। বারবার মনসার প্যান্ট কামড়ে টানছে।

পিঠে হাত বুলিয়ে মনসা বলল, ‘তুর বলি হলেই ঘর যাবোরে লাট্টু। তু স্বগ্গে গিয়ে মুক্তিটা লিয়ে এলেই চলে যাব। হাঁ দ্যাখ; আরও দুটি ছাগল রয়েছে।’ ঠাকুরের থানে আরও দুটি পাঁঠা বাঁধা আছে। মানতের পাঁঠা। সবার আগে লাট্টুর বলি হবে।

লালি লাট্টুকে নেওয়ার জন্য টানতে লাগল। লাট্টু কিছুতেই মনসাকে ছেড়ে যাবে না। লালিকে দু-বার গুঁতোতে গেল। মনসা আদর করে বলল, ‘যা যা। ভয় খাচ্ছিস কেনে। আমি আছি ত। কিছু হবেক না তুর।’

তবু আজ লাট্টু মনসারও অবাধ্য। কিছুতেই যাবে না।

দেরি হচ্ছে দেখে কপালে সিঁদুর মাখা ঝানু এসে টেনে নিয়ে গেল লাট্টুকে।

হাঁড়িকাঠে লাট্টুর গলা আটকে। মাথা দুলিয়ে নাচছে ঝানু। ঝানুর নাচের তাল বাড়ছে ঢাকের আওয়াজ বাড়ছে। জায়গাটা ঘিরে ভীড় করেছে গ্রামের মানুষ। মাঝখানে হাঁড়িকাঠে গলা আটকানো লাট্টু। দু-দিকে দুজন ঢাকি। মাটির ধুনুচিতে নারকেল ছিবড়ে দিয়ে ধোঁয়া করছে একজন। হাত জোড় করে সবাই দেখছে। লাট্টুর হাঁ

করা মুখ থেকে জীভ বেরিয়ে আসছে বার বার। ব্যা-ব্যা করে চেঁচাচ্ছে বোধহয়। পেছনের পা দিয়ে প্রাণপণে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করছে লাট্টু। মনসা ভীড় থেকে চেঁচিয়ে বলছে, 'ভয় পাস না লাট্টু—উ। আরেকটু পর তু স্বগ্গে যাবি। ঠাকুরের থেকে মুক্তি পেলেই ঘর পালাব আমরা।' ঢাকের শব্দ আরও জোরে বেজে উঠল। মনসার কথা মনসা নিজেও যেন শুনতে পেল না। ধূপের ধোঁয়া ছড়িয়ে গেল চারিদিকে। ঝানু রামদা নিয়ে নাচতে নাচতে হাঁড়ি কাঠের কাছে আসছে। সামনে হাঁড়িকাঠ। ঝানু নাচছে। পাগলের মত নাচছে। হাঁড়িকাঠে লাট্টুর মাথা আটকানো। 'জয় মা মনসা' লাট্টুর মাথা হাঁড়িকাঠের একপাশে। দেহ একপাশে। মুক্তির জন্য ছটফট করছে। মাঝখানে শুধু লাল রক্ত। হাঁড়িকাঠ রক্তে ভেজা। একদিকে লাট্টুর মাথা। একদিকে লাট্টুর শরীর। চারিদিকে লাল রক্ত। মনসার সামনে গাঢ় অন্ধকার নেমে এল।

জ্ঞান ফিরলে মনসা লালিকে জিজ্ঞেস করল, 'ঠাকমা স্বগ্গের রাস্তা কি রক্তমাখা?'



পুরোনো মা, নতুন আমি

তাই পাড়াপড়শিদের কানাঘুষো আমায় নিয়ে, যে আমি বাড়িতে এত কেন থাকি এখন। এসব সত্ত্বেও মা ওদেরকে বলে, ‘আসলে মেয়ে এখন ওয়ার্ক ফ্রম হোম করে’...**বিদিশা কর্মকার**

স্মৃতিকণা অনেকদিন বাদে আবার গল্প লিখতে বসল। ছোটোবেলা থেকেই তার এটা একটা সখ। তবে এখন আগের মত নিয়মিত লেখালেখিটা আর হয় না। আজ কেমন একটা ইচ্ছা হচ্ছে। স্মৃতিকণা তার হলুদ পৃষ্ঠার লাল রঙের ডায়েরি বার করল। প্রতি বছর নববর্ষতে একটা করে ডায়েরি মামার কাছ থেকে পাওনা হয়। ও ভেবেছিল এত গল্প কবিতা লিখবে যে কয়েক

মাসের মধ্যেই ডায়েরি ভর্তি হয়ে যাবে। বলাই বাহুল্য, একটা ডায়েরিও শেষ করে ওঠা হয়নি এখনও।

যাইহোক, নাওয়া-খাওয়া সেরে সে বসল খাটের উপর। সুন্দর গোটা গোটা হাতের লেখায় নীল কালিতে লিখল।

তারিখ: ০৪ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

ছোটোবেলা থেকে মা কে ঘিরেই গড়ে উঠেছিল আমার বিশ্ব। মা ছাড়া আমার চলত না। কখনোই বিশেষ বন্ধু বান্ধব ছিল না। তা সে পুতুল খেলাই হোক আর লুকোচুরি হোক, সব খেলাই মার সাথেই খেলতাম। এখনও মনে পড়ে যখন আমি খুব ছোট্ট, লোডশেডিং হলে ভূতের ভয়ে ছুটে মা এর কোলে ঢুকে যেতাম অথবা খাটের উপর বসে পড়তাম। ভাবতাম এই বুঝি ভূতে খাটের তলা থেকে হাত বাড়িয়ে পা-গুলো টেনে নিল। মা অনেকসময় লোডশেডিংয়ের রাতে বারান্দায় চাঁদের আলোতে আমায় কোলে করে নিয়ে বসত। মায়ের গলায় শুনতাম রবীন্দ্র সংগীত ‘আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে …’। তখন উজ্জ্বল গোল চাঁদের দিকে তাকিয়ে ভাবতাম যে একদিন বড়ো হয়ে মায়ের মত গাইব। ছোটোবেলা থেকে মা-ই আমার বাবা-মা, সব। এখন ভেবে হাসি পায় যে মাকে কত জ্বালিয়েছি।

‘আচ্ছা মা, রাতের আকাশে টর্চ মারলে আলোটা হারিয়ে যায় কেন?’

‘গাছগুলো বড়ো হলে ওদের মাঝের অংশ সবুজ থেকে বাদামি কেনো হয়?’ ইত্যাদি নানাবিধ প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতাম। মা কিন্তু ধৈর্য্য ধরে সব কিছুর বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে জবাব দিত।

আমি চাইতাম সবসময় মা আমার পাশেই থাকুক। তাই মা লুকিয়ে অফিস বেরোত। আমি কান্নাকাটি করতাম

প্রতিদিন, যাতে মা কোথাও না যায়। আর কান্নাকাটি করে যখন ঘুমিয়ে পড়তাম, মা তখন আমায় সন্তর্পণে শুইয়ে রেখে বার হত খুব সাবধানে। পাছে কোনও আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙে যায়। দরজায় বাইরে থেকে তালা দিয়ে অফিস চলে যেত মা। আমি যখন ঘুম থেকে উঠে মাকে খুঁজতাম, আলো আঁধারিতে কোথাও কাউকে দেখতাম না। ভাড়া বাড়ির গ্রিলগুলো দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতাম কখন মা আসবে।

প্রথমদিকে দুঃখ পেতাম এটা ভেবে 'আমার মা তিশার মার মত বাড়িতে কেনো থাকে না?'

তবে পরের দিকে মা চলে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকতাম। কখন মা যাবে আর আমি রান্নাঘরে লুকিয়ে রাখা কমপ্ল্যান-এর শিশি খুলব। তখন শুকনো কমপ্ল্যান এক মুখ ভর্তি করে খেতে বেশ ভালো লাগত।

তবে ছোটো থেকে বড়ো হয়ে ওঠাটা যেন একটু তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। মায়ের সাথে ঠিক মায়ের মত নয় বরঞ্চ বন্ধুত্বের সম্পর্কই গড়ে উঠল। মা এমন ছিল যেখানে সব কথা আমি বলতে পারতাম নিঃসংকোচে। আমি জানতাম এই মানুষটি আর পাঁচ জনের মত আমায় জাজ্ করবে না। আমার হাজার ত্রুটি সত্ত্বেও বলবে 'তুই চেষ্টাটা কর, দেখবি ঠিক সফল হবি'।

আমার মা এর কিছু স্বতস্ফূর্ত গুণ আছে যেগুলি ছোটোবেলা থেকেই দেখে এসেছি।

অন্যকে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করা হোক, বা গরীব দুঃখীদের সামর্থ অনুযায়ী খাওয়ার জিনিস দেওয়া হোক, মাকে হামেশাই করতে দেখেছি। অদম্য সাহস, ধৈর্য্যশক্তি, হার না মানার গুণগুলো মায়ের কাছে হয়ত শিখেছিলাম। তারপর স্কুলের গণ্ডি পার হয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করলাম। শুধুমাত্র মায়ের অদম্য চেষ্টার জন্য। আমাদের কাছে টাকা ছিল না ওত বড়ো বড়ো কলেজে পড়ার। অনেক

আবেদনের পরে ফুল স্কলারশিপ নিয়ে কলেজ শেষ করলাম। চাকরিও সাথে সাথে পেয়ে গেলাম। মা হয়তো ভাবল আর কোনো কষ্ট নেই তার। ধীরে ধীরে সব ছোটো খাটো আশা, স্বপ্নগুলো পূরণ হতে থাকল। কিন্তু এরসাথে বদলে যেতে থাকল মা আর আমার সম্পর্কের সমীকরণ। আমি ছোট্ট মেয়ে থেকে মা-এর অভিভাবক হয়ে উঠছিলাম। এতদিন যার উপর সব কিছুর জন্য নির্ভর করতাম, সে এবার নির্ভরশীল হয়ে উঠছিল আমার উপর।

মা কে জিজ্ঞেস করলে সে মেলোড্রামাটিক টিপিক্যাল ডায়ালগ দিত।

'আর কতদিন, এবার তো আমার বয়স বাড়ছে!'

কিন্তু তখন হেসে উড়িয়ে দিলেও এটা বুঝতাম বয়সের থেকে বেশি বাড়ছে মায়ের মনে মেয়েকে নিয়ে অনিশ্চয়তা।

তার মেয়ে আজ বছরখানেক হল চাকরি ছেড়েছে সরকারি পরীক্ষা পাশের আশায়।

মা ডিসিশনটাকে তখন সাপোর্ট করে বলেছিল, 'ঠিকাছে, তোর যদি মনে হয় তুই পারবি, তাহলে এগিয়ে যা'।

এখন অনুভব হয় যে মা হয়তো মন থেকে ঠিক মেনে নিতে পারেনি। আসলে মায়ের একদিকে আছে মেয়ের পাশে দাঁড়ানোর দায়িত্ব, আর অন্যদিকে এত বছর ধরে সাজানো ভবিষ্যৎ একনিমেষে চুরমার হতে দেখা। মাকে এতে দোষ দেব না। মা-র হয়ত কত আরোও স্বপ্ন ছিল যেগুলো হয়তো আজ অপূর্ণ থেকে গেল।

তার উপর মেয়ের বয়স হচ্ছে বলে পাড়াপড়শি জিজ্ঞেস করে,

'কি গো মিনাক্ষী, মেয়েকে কী বিয়ে দেবে না বলে ঠিক করেছ?'

'বয়স তো কম হল না, ভালো ছেলে পাওয়া কিন্তু মুশকিল হবে এবার'।

এসব কথা হয়ত সবসময় শুনতে হয় তাকে। আমি বুঝি মায়ের কষ্টটা। আসলে এটা একটা চারাগাছ পোঁতার মতো। যে গাছ একদিন মা অতি যত্নে পুতে ছিল। দেখাশোনা করেছিল। এতদিনের পরিশ্রম ফল দিল, গাছটি বড়ো হল শেষমেশ। ঠিক যে সময় গাছে ফুলের কুঁড়ি ধরা শুরু করল, হঠাৎ কোন এক অদৃশ্য ঝড়ে সে গাছ ভেঙে পড়ল। চোখের সামনে এতদিনের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এখন সেই অবশিষ্ট গাছের আবার নতুন করে পরিচর্যা করার ধৈর্য্য আর আশা হয়তো মায়ের আজ কমে এসেছে। তার নিজস্ব জীবনের বার্ধক্য সন্নিকটে আর তার সাথে মাথা বোঝাই চিন্তা।

'কে দেখবে তাকে বুড়ো বয়সে?'

'তাকে কী আবার সেই পুরানো দিনের দারিদ্রতা কষ্টের দিনগুলোতে ফিরে যেতে হবে?'

তার এই স্বল্প আয় দিয়ে তো আর চলছে না। উপরন্তু দিন-দিন মেয়ের দায়িত্ব কমার জায়গায় বেড়ে চলেছে। সবার কাছে সে মন খুলে বলতে পারে না সত্যিটা। একদিন তার মেয়ের ওই চাকরিটাই সমাজে হারিয়ে যাওয়া সম্মানটা ফিরিয়ে দিয়েছিল তাকে। তাই কোন মুখেই বা সকল কে বলবে আজ সে যে আমার মেয়ে আর চাকরি করে না। এখন পরীক্ষার প্রস্তুতি বাড়ি থেকেই নিই। তাই পাড়াপড়শিদের কানা ঘুষো আমায় নিয়ে, যে আমি বাড়িতে এত কেন থাকি এখন। এসব সত্ত্বেও মা ওদেরকে বলে, 'আসলে মেয়ে এখন ওয়ার্ক ফ্রম হোম করে'।

আমি বুঝতে পারি মার মনের অবস্থা। কী জানি, ভালো করে আগের মত আমাদের মধ্যে আর কথা হয় না। খুব একটা ঘনিষ্ঠ আলোচনা হয় না। একে অপরকে শুধু দরকারের কথা বলা, ব্যাস ওইটুকু। সেই পুরোনো মাকে খুব মিস করি আমি। যে সব কিছুতে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে। আমার সাইকোলজিস্টের কাজ করেছে।

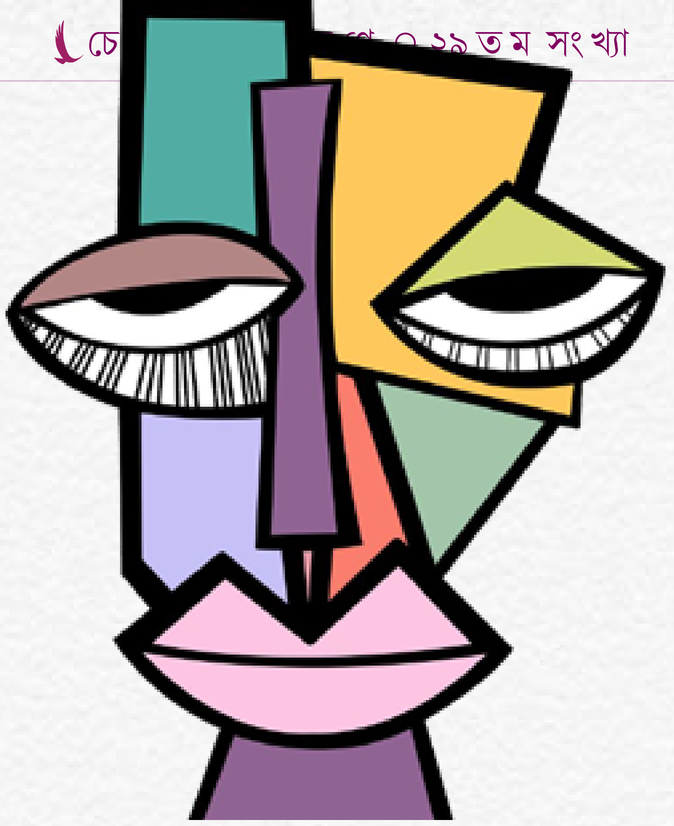
আজ বয়সের সাথে অনেক ছোটো বড়ো ঘটনা ঘটেছে। সম্পর্কগুলো নাম একই থাকলেও অন্য মানে পেয়েছে। কিন্তু তাও খুব ইচ্ছা করে আবার সেই মায়ের সাথে হাসি ঠাট্টার গল্প করতে। মার গলায় আবার গান শুনতে, মার হাসি মুখটি দেখতে। ইচ্ছা করে আবার পুরোনো মাকে ফিরে পেতে।

লেখা শেষ করে স্মৃতিকণা ডায়েরি বন্ধ করল। আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকল, 'একদিন হয়ত যখন নীলবাতির গাড়িতে উঠবো অফিস যাব বলে, মা তখন হয়ত খুশিই হবে'।

"যদি পূজা-পাঠ, যাগযজ্ঞ, দান- দক্ষিণায় দেব দেবী খুশি হয় তাহলে ভগবানের থেকে বড়ো ঘুষখোর আর কেউ নেই।"

—জ্যোতিবাও ফুলে

|কবিতা



অশোক দাস চার্বাক

ধর্মবিষ

বার্বি সাথে বললে কথা
খুকুর খেলায় ফান কর,
তোমরা যে সব বুড়ী খুকী
দেবতা পূজার ভান কর
তার বেলা?
খুকুর খেলাঘরে যখন
তাহার পুতুল গান ধরে,
ঠাকুরঘরে ঠাকমা তখন
কেষ্ট খেলেন প্রাণ ভরে।

বাঘ নখাদি পরলে ওদের
জংলী বলে গাল পাড়,
তোমরা যে সব সভ্য মানুষ
জ্যোতিষ ঠেকে ভিড় কর
তার বেলা?

রাহু কেতুর স্বপন দেখে
রতন গলাও আংগুলে
ভুত ডাইনীর গুঁতোর ভয়ে
মাদলী ঝোলাও ন্যায় ভুলে
তার বেলা?



শিকড় বেঁধে অশিক্ষিত
রুখতে থাকে গ্রহের গতি,
তোমরা যে সব নীলা পরে
শনি ভাগাও দিবারাতি
তার বেলা?

পূজা বলি করতে থাক
ঝড় বন্যার ভয় পেলে
দেবদেবীদের ডাকতে থাক
অশিক্ষিতের আ-দলে
তার বেলা?

কালীঘাটে পাঁঠা কেটে
আইন সবাই ভাঙছে হাটে
জজ-প্রশাসন দেখে বলেন
ধম্মো কম্মো চলছে বটে।

ছাগল ভেড়ার ব্যা ব্যা ধ্বনি
ভক্ত ভীরুর ম্যাগো মা ...
একই যে সুর একই যে তাল
আর্তনাদের ঘ্যাঁঘোর ঘ্যাঁ।

বিজ্ঞানী আর মূর্খজনে
কোন ফারাক নাই যে দেখি,
দুজন ভজে সমান জ্ঞানে
শিক্ষা বড়াই হয় ফাঁকি।

প্রাণের ভয়ে ব্যা ব্যা করে
বলির ছাগল ভেড়া,
তিলক পরে ভক্তজনে
নরক ভয়ে মেড়া।

ছোটোলোক আর উঁচুলোকে
পন্ডিত কী মূর্খ,
সবাই চলে একই চালে
নেইকো মনে তর্ক।

আদীম যুগের অনুসরণ
করছে নব্য সভ্যরে,
রাষ্ট্রপতি শপথ পড়ে
ইতর জনের পোঁ ধরে।

পুরুত গুরু কাটছে পকেট
বুজরুকদের হাত ধরে,
বিজ্ঞানীরা ছাড়ছে রকেট
দেবপুতুলে ফুল ছুঁড়ে।

আনপড়েরা ডা'ন পোড়ালে
নিন্দা কর ইতরজনে
তোমরা যে সব বিদ্বজনা
সতী পোড়াও শাস্ত্র মেনে
তার বেলা?

জংলী বাঘে মানুষ খেলে
পশুর ওপর রাগ কর
তোমরা যে সব ভক্তজনা
স্কুল শিশুদের খুন কর
তার বেলা?

শম্বুক খুন হলে পরে
রামের মাথায় ফুল ঝরে
খুনিরা সব পায় যে বেহস্ত
ছাত্র মেরে পেশোবারে।

ডাকাতরা খুন করলে পরে
ঝোলাও ফাঁসে জুৎ করে
দেবতা যখন ম্লেচ্ছ মারেন
হাটে স্কুলে দেশ জুড়ে
তার বেলা?

বেহস্তেরের সুন্দরী সব
জড়িয়ে ধরে সোহাগভরে
ভগবানেরা বর দিয়ে দেয়
খুন করবার পুরস্কারে।

ভেড়া যেমন হাঁটতে থাকে
গড্ডারিকার পিছে
গুরুর বাণীর ফাঁদের জালে
ভক্তরা সব নাচে।

নাইকো মনে প্রশ্ন
হৃদে নাইকো দুঃখ
মনন চেতন ভাবনা বিহীন
গাধার মনে সুখ।

কপট ধরম করতে গিয়ে
মানব ধরম হয় ফাঁকি
কাফের পোড়ে, ম্লেচ্ছ মরে
ধর্ম কোথাও নাই দেখি।

ধর্মবিষে মানুষ মরে
বিশ্বজুড়ে বিশ্বজুড়ে,
ভাবতে থাকো সুধীজনে
বাঁচবে ছেলে কী করে।



অশোক দাস চার্বাক

গজানন না, দেবানন?

একথা সবার জানা লেখা আছে পুরাণে
পার্বতী বানালো ছেলে অতিশয় যতনে,
বড়ো ভাল ছেলেটা
সতীমার ন্যাওটা
হেসেখেলে খুশী রাখে বিরহীর মনটা।

দেবীমাতা ঢুকে গেল স্নানকেলি করতে
ছেলেটাকে বলে গেল দুয়ারটা দেখতে।
শিব বলে ‘যাব আমি’
গণেশকে শাসানি
কেটে দিল নারাজীর মুন্ডুটা তখুনি।

উড়ে গেল গণেশের কাটা সেই মুন্ড
শিবানীর ছেলেখেলা হল তাই পন্ড,
কেঁদে কেটে একসা
দেবী চোখে বরষা,
হাতিমাথা জুড়ে দিয়ে হল নব গণশা।

সবে মিলি পশুমাথা গণেশকে পুজলো
খুঁজলোনা দেবমাথা কোথা গিয়ে পড়লো।
ধড় হারা সেই মাথা
ঘুরছিল আকাশে
অবশেষে পড়ে গেল চার্বাক সকাশে।

মাথাহারা হাতিটা পড়েছিল পাহাড়ে
গণেশের মুন্ডুটা জোড়া হল সে ধড়ে।
সে গণেশ বলে ‘আমি

খাঁটি ছেলে শিবানীর’
গজানন দেবানন দু’দেবের চেঁচানি।

কে আসল কে নকল হয়ে দুই পক্ষ
দেবাত্মা কোথা আছে এই নিয়ে তক্ক।
পশুমাথার ঘিলুতে
না, দেবতার মগজে,
এই নিয়ে চেঁচামেচি টিভি আর কাগজে।

রচয়ে চার্বাক নব ‘গণপতি মঙ্গল’
দু’গণেশ পাবে সেথা ছাড় এবে কোলাহল।
ঠিক কর সবে মিলি
কি গণেশ ভজিবে,
বেছে নাও সুধীগণ কোন দেবে মজিবে।

প্রদীপ চক্রবর্তী

লড়াই

জন্ম নিলে মরতে হবে,
এটাই বিজ্ঞানের নিয়ম।
মৃত্যুর পরে দেহ দানটাই কাম্য,
আসবে না কোনো যম।

ধর্ম নিয়ে লড়াই কেন?
চিন্তার আছে প্রয়োজন।
যুক্তিবাদী হতে গেলে,
চাইনা কোনো আয়োজন।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে চাই সংগ্রাম,
যুক্তির অস্ত্র শানাও।
ধর্মের মোড়ক সরিয়ে দিয়ে,
বিজ্ঞানমনস্ক বানাও।



বিপুল মাহাতো

অন্য হাওয়া

বড়রা যুদ্ধ যুদ্ধ খেলে, শিশুরা তা বোঝে না ...
তারা ক্ষুধা জানে শুধু, খোদা ঠিক জানে না।
বিকট শব্দে তন্দ্রা কাটিল।
যুদ্ধ শেষেও নতুন যুদ্ধ, যুদ্ধক্ষতের যন্ত্রণা।

শিশুরা মিলিত, মিলিয়া খেলিত সন্ধ্যা নামার আগে
এখন তারা আর মেলে না, উর্দির ভয়ে ভাগে।
দিনের বেলাও তমসা আসিল।
ভাঙা ছাদ, মেঝেতে শুয়ে মায়ের আদর জাগে।
দুঃখ যাদের বাঁচার সাথী, তীব্র বারুদ ধোঁয়া,
মরণসম জীবন তাদের, জীবন গিয়াছে খোয়া।
কারা যেন বলি দিল মানবতা!
রাজনীতি পচা গন্ধ আসিল আনিল ব্রাত্য হাওয়া।

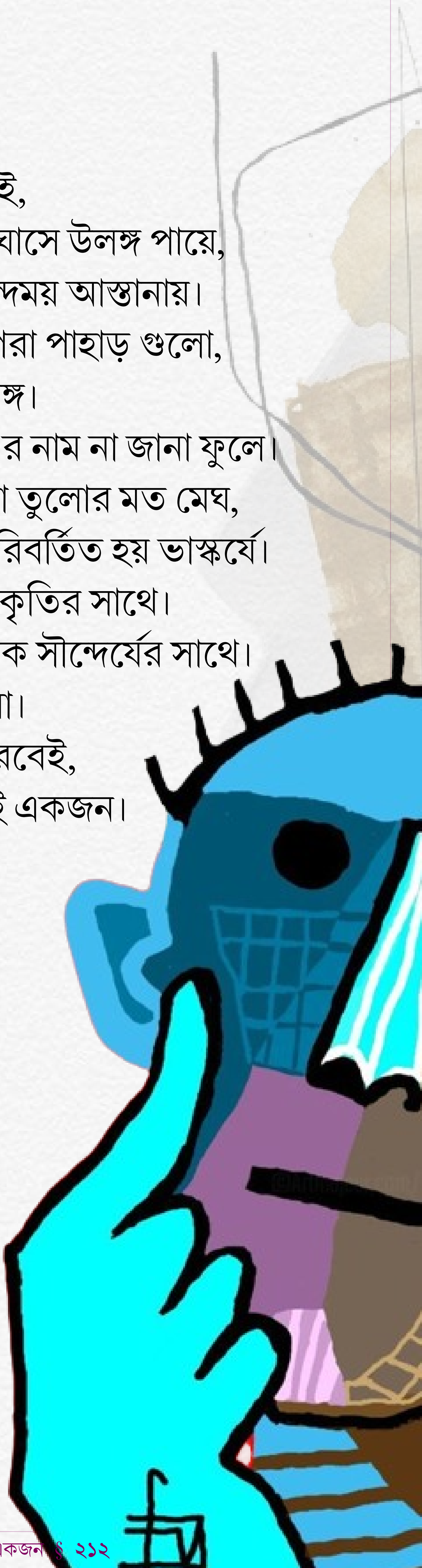
মেলিয়া অঙ্গ মুক্ত বিহঙ্গ, দেশ-সীমানা ছাই
সাম্য বোঝে? নাকি কিছু তার বোঝে নাই!
একটা স্বপ্ন, কাম্য শান্তি।
মানুষের আজ তাদের যতোই পাখি হওয়া চায়।



ইজাজুল হোসেন

আমি প্রকৃতির একজন

ঐ জায়গায় আমি যেতে চাই,
যেখানে নদীর ধারে সবুজ ঘাসে উলঙ্গ পায়ে,
হেটে পার হওয়া যায় আনন্দময় আস্তানায়।
সামনে থাকবে সাদা টুপি পরা পাহাড় গুলো,
নিজেকে মনে হবেনা নিঃসঙ্গ।
হাত ছুঁয়ে যাবে নানান রঙের নাম না জানা ফুলে।
দেখবো নীল আকাশ পেঁজা তুলোর মত মেঘ,
ঝুলে থেকেও কি ভাবে পরিবর্তিত হয় ভাস্কর্যে।
কথা হবে পরিচিত হবো প্রকৃতির সাথে।
মিশে যাব অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দের্যের সাথে।
আমি অসুন্দর হই না কেনো।
প্রকৃতি আমাকে আপন করবেই,
কারন আমি তো প্রকৃতিরই একজন।





বিপুল মাহাতো

কাষ্ঠ বিলাস

একটিই গাছ,
শহুরে অট্টালিকা মাঝে একা –
উঁচু হয় ক্রম হরষে, পাশে সবুজ-ফাঁকা।
চার দেওয়ালি জীবন তাহার,
রোদ্রে হাঁসফাঁস আজীবন কারাবাস!

শিকড় তাহার বহু নীচে ধায়,
সংগ্রামী মন অভিযানে চায়---
বন্ধু-স্পর্শ মেলেনি তবু, নিরাশ করেছে ইট।
রাতের তারা দিনের তারা-
নিরুপায় মিটমিট!

এখন সেথায় ফুল ফোটে না, ফল জোটে না
কাঠবেড়ালি ছানা।
একটা মাত্র কাকের বাসা
ডিম দু-চার খানা।
আমরা মানুষ, বুদ্ধি ব্যাপক
পোক্ত-কাষ্ঠ-বিলাস।
এই গাছটা ভীষণ দামী
নিধন অভিলাষ।।

অশোক দাস চার্বাক

বনবন – শনশন

চারিদিক নিঝ্‌ঝুম
পৃথিবীটা দেয় ঘুম,
কেউ নেই রাস্তায়
চুপচাপ, নেই ধুম।

শুনশান নদীপাড়
গাছপালা নিশ্চল,
নড়েনাকো পাতা কোন
নেই কোন কোলাহল।

ঐ শোন, দাও কান
নদীতে যে ওঠে বান
ঝড় সাথে আসছে,
বান ঝড় আসছে।

মা-র পেটে দুই বোন
এক সাথে বাড়ছে
শনশন বনবন
ঝড় বান সাজছে।



শনশন বনবন
দুই বোনে খেলছে,
নদী ফোলে, ওঠে বান
ঝড় তারে ডাকছে।

ছুটছে তারা, উড়ছে ওরা
সৃষ্টিসুখে আত্মহারা,
ঐ ঝড় উঠছে

দেখে গাং ফুঁসছে,
ওরা সব আসছে
ঐ তারা আসছে।

ভাঙবে ওরা
গড়বে ওরা,
গুঁড়িয়ে দিয়ে মনের কারা
পাল্টে দেবে চিন্তাধারা।
ঐ ওরা আসছে
আসছে আসছে।

চিন্তার মুক্তি
জয় হবে যুক্তি,
ঐ ঝড় ছুটছে
ঐ নদী ফুলছে,
শনশন বনবন
ঝড়-বান আসছে।

উদ্দাম উচ্ছল
বাঁধবেড়া ভাঙবে,
চঞ্চল উজ্জ্বল
অচলকে চুরবে।

ঝড় ধায় বনবন
বান ছোটে শনশন,
এসে গেল এসে গেল
বনবন শনশন।

সমাজটা পাল্টাবে
হবে পরিবর্তন,
সনাতন অবসান

যুক্তির আগমন।

চারিদিকে হৈ হৈ
গেল কৈ গেল কৈ
ঐ তো, ঐ তো
ছুটে চলা বাইতো!

শনশন বনবন
ওরা সব ছুটছে।
আকাশেতে ওঠে ঝড়
মরা গাছ ভাসছে।

চঞ্চল উদ্দাম
লাফ দেয় দুম-দাম
কোন বাধা মানে নাকো
বেড়া ভেঙে খান খান।

ঝড় ওরা, বান ওরা
পুরানোকে ভাঙবে
নতুনকে গড়বে,
ঐ ঝড় উঠছে
ঐ বান ছুটছে,
শনশন বনবন
ছুটছে উড়ছে।

শাস্ত্রের শৃঙ্খল
হবে এবে চুরমার,
জাতপাত ধর্মের
নেই আর দরকার,
ধুয়ে মুছে যাবে সব
বিভেদের হাতিয়ার।

চিন্তার মুক্তি
জয় হবে যুক্তির,
ঝড় ঐ উড়ছে
বান ধেয়ে আসছে,
বনবন শনশন
দল বেঁধে আসছে।

মরাপাতা উড়ে যায়
কচিপাতা জাগবে,
নতুনেরা আলো দেবে
আঁধার যে সরবে,
শনশন বনবন
আলো নিয়ে আসছে,
ঐ ওরা ছুটছে
ঐ ওরা আসছে।

ওরা সব নিয়ে আসে
চিন্তার অধিকার,
তাই ওরা পার হবে
অচলের পারাবার।

শনশন বনবন
ঐ ঝড় আসছে
শনশন বনবন
ঐ বান ছুটছে।

ওরা সব আসছে
ঝড় বান আসছে,
শনশন বনবন
দুটি বোন আসছে।

রনা তালুকদার

গেরুয়া-সাদা-সবুজ
আমরা কেনো অবুঝ!

মন্দির-গির্জা-মসজিদের
নিষ্প্রাণ-দোস্তিটা তিন কাপড়ে অটুট!
‘গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা’ নিয়ে -
আমাদের তেরঙা জাতীয় পতাকা,
অতি ‘উজ্জ্বল-মোহময়-গৌরবান্বিত’ ..
তাইতো বিশ্বদ্বারে স্বাধীন স্বতঃস্ফুর্ত!

‘গীতা-বাইবেল-কোরান’ নানান রসদ নিয়ে,
তাতে কোথাও বলানেই, দাঙ্গা করো গিয়ে!
মানুষ-মানুষে বিভেদ বাঁধানো-বাড়ি জ্বালানো
‘শয়তান-সাম্প্রদায়িক’ রাষ্ট্রনায়কদের কাজ,
তাইতো ওরা সঠিক শিক্ষা দিয়ে -
চায়না হোক সমাজের বিকাশ!

একই গাছের ফসল-আমরা সব বাড়িতেই খাই
একই সুতোয় বানানো কাপড়, রাঙিয়ে পরাই!
একই বিমানের যাত্রী হয়ে-দেশ বিদেশে যাই
একই ঝর্নার জলে ‘স্নান ও পিপাসা’ মেটাই,
মানুষের সাথে-মানুষ মিলে ‘সন্তান জন্ম দেয়’
‘হিন্দু-খিস্টান-মুসলিমের’ চিহ্ন দেওয়া নয়!

পোশাক-আশাকের ব্যবহার-মোদের আপন নয়,
ওই শয়তানেরা, শয়তানির বিভেদ রাখতে-
নানান ঢঙের নকশা, বানিয়ে দিয়েছে ভাই,
ওরা কিন্তু পোশাক পড়ে ‘ওদের সুবিধা মতন’

যখন যেমন-সেথায় তেমন, পড়তে ওরা জানে
বহুরূপী সেজে 'মিথ্যে আর মিষ্টি বোলে'
আমাদের, ওরা সুবিধায় নিয়ন্ত্রণ করে!

একই শিল্পে-একই যন্ত্রে কত কিছুই হয়,
থালা বানাই-বাটি বানাই-বানাই যাতাকাল
গাড়ি বানাই-রকেট বানাই-বানাই বহুতল..
পিস্তল বানাই-বন্দুক বানাই......
বানাই বহু ত্রিশূল-তলোয়ার......
তবে, আমরা যখন লোরে মরি
সেটা নেতাদের যাতাকল....!

আমাদের হাতে ফলানো ফসল,
ভালোটা ওদের পাতে............!
আমাদের হাতের তৈরি গাড়ি সেটাও ওদের সাথে!
শ্রমের সঠিক হিসেব চাইলে পরে,
ত্রিশূল-তলোয়ার-বন্দুক-কার্তুজ
ব্যবহার করে আমাদের উপরে!

আমাদের আজ বুঝতে হবে, কোনটা সঠিক পথ-
'শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কৃষি-শিল্প' ছাড়া দেশ-দুনিয়া অচল

'মন্দির-গির্জা-মসজিদের-গেরুয়া-সাদা-সবুজ'
'কাপড় তিনটে জুড়েই পতাকা'
তবে আমরা কেনো অবুঝ!

'সাম্প্রদায়িক-সন্ত্রাসবাদীদের' করতে হবে খোঁড়া
'কাপড়ের মত আমাদের-হতে হবে জোড়া'
'দেশের পতাকা হবেনা ভাগ'
'মন্দির-গির্জা-মসজিদ' ....থাক বা না' থাক!

বিপ্লব সেন

দূষণে প্রকৃতির সর্বনাশ



সুসভ্য নগর সভ্যতায় গড়া
সুউচ্চ অট্টালিকা,
হৃদয়ের শব্দ যায় না শোনা
চেতনা হয়েছে ফাঁকা।

লক্ষ কোটি বৃক্ষের ওই
মৃত্যুর ঠিকানা লেখা,
ভেবে দেখুন চলেছি কোথায়
প্রয়োজন কী শুধুই টাকা?

টাকার বিনিময় যায় না
ফেরানো প্রকৃতির চরম ক্ষতি,
ভেবে দেখুন উষ্ণতার পারা কোথায় যায়
এটা মূর্খামির বেসাতি।

প্রচুর শক্তি প্রচুর মারণাস্ত্র দারুন উন্নত,
ভোরের বেলা পাখির ডাক
সেটা আজ পরাভূত।

উদার আকাশে মুক্ত খেচর মেলে দিত তার ডানা,
দূষণের ভারে হারিয়ে গেছে
তার মুক্তির ঠিকানা।

কত জঙ্গল তার মধ্যে
ছিল পশুর বিচরণ,
আজকে তারা বিলুপ্ত প্রায় আছে অনেক উদাহরণ।

কল কারখানার কালো ধোঁয়া
বিষাক্ত আকাশ বাতাস,
তারই মাঝে শুনতে পাওয়া
সভ্যতার হা হুতাশ।

এই কী সেই উন্নত সভ্যতা
এটাই কী আগামীর পৃথিবী?
বর্তমানের কাছে ভবিষ্যতের শিশুর
আছে কিন্তু দাবি।

রবি ঠাকুরের উদাত্ত আহ্বান আজও মনেতে বাজে,
‘দাও ফিরে সে অরণ্য লহ এই নগর’,
সভ্যতা মুখ লুকিয়ে ফেলে ‘লাজে।’

বিকৃত বিকাশ সভ্যতার সংকট দারুন ঘনীভূত,
ওহে উন্নত মানব সভ্যতা
শেষের সে দিন দ্রুত আগত।

কান পেতে শোনো বিনাশের ঘণ্টা, এখনও আছে সময়,
বদলে ফেলো নচেৎ প্রকৃতি
প্রতিশোধ নেবে নিশ্চয়।

রাজু দত্ত

আমরা লাশের বাড়ির লোক

মর্গে শোয়ানো ছিন্নভিন্ন
তিনশো লাশের ভিড়ে,
আমাদের প্রিয় মানুষের লাশ
পচে গেছে ধীরে ধীরে।
আমাদের কারও স্বামী মরে গেছে
কারও স্ত্রী সন্তান,
তিনশো লাশের ভিড়েই তাদের
করে গেছি সন্ধান।
কেউ বা গেছিল বেড়াতে সে রাতে
কেউ বা পেটের দায়,
কেউ বা সুস্থ হতে গিয়েছিল
সঠিক চিকিৎসায়,
তারা কেউ আর ফেরেনি বাড়িতে,
সকলে গেছে মরে,
তারা চলে গেছে আমাদের ছেড়ে
শবের গাড়িতে চড়ে।
চীৎকার করে কেঁদেছি আমরা
জলে ভিজে গেছে চোখ,
তোমাদের কাছে আমরা কেবল
লাশের বাড়ির লোক।

তোমরা বাবুরা লাশের বদলে
কয়েক লক্ষ দেবে,
মৃত্যুর ক্ষতি হয়না পূরণ
দেখেছো কী সেটা ভেবে?
তোমরা বাবুরা করবে বিচার
কারা দোষী এর জন্য,

তোমাদের রায় শুনে গোটা দেশ
করবে ধন্য ধন্য।
সময় ছুটবে আপন নিয়মে
সব্বাই ভুলে যাবে,
তিনশো মানুষ সেইরাতে
লাশ হয়েছিল কীভাবে।
আবার আসবে ভয়ানক রাত,
আবার গুনবো লাশ,
সান্ত্বনা দেবো নিজেদের
এ যে নিয়তির পরিহাস!
পলিটিক্সের দাবায় আমরা
অসহায় ক্রীড়ানক,
আমাদের পরিচয়, আমরা
লাশের বাড়ির লোক।

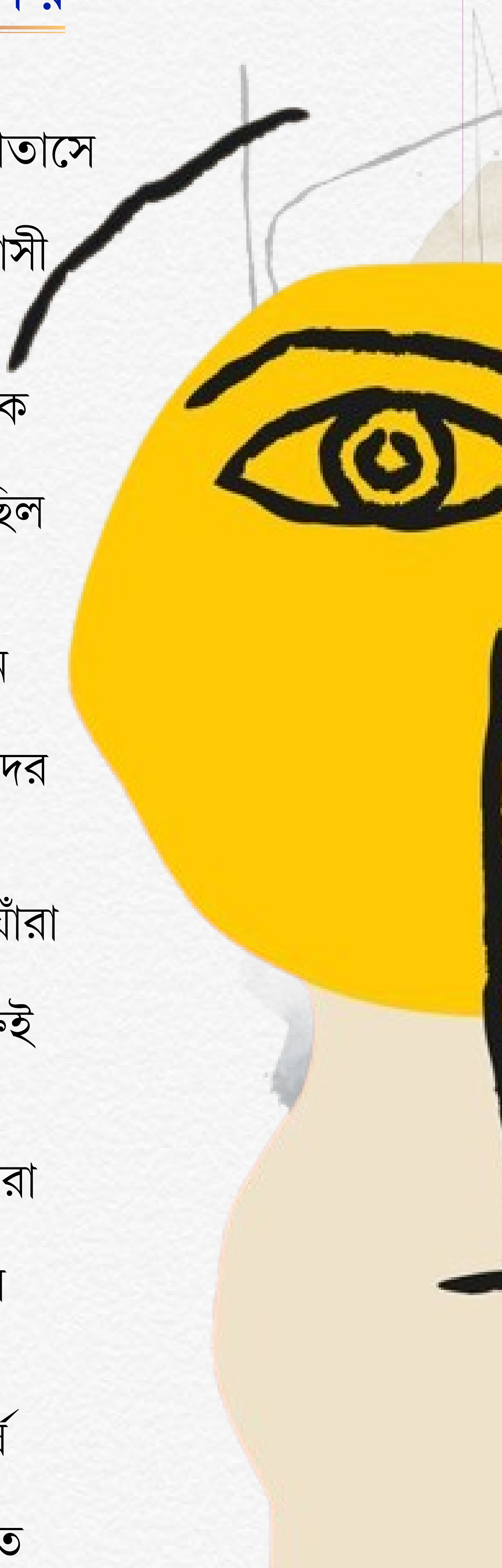
তাপস কুমার সরকার

নগ্নতা

আমরা কী দেখছি এসব সভ্য সমাজের বুকে
লজ্জায় যেন মাথা কাটা ভীতি হয় চোখে মুখে!
মায়ের বুকে, মায়ের শাড়ি আর টানিস নারে
মায়ের মত আর এক মা যে আছে তোদের ঘরে।
মানুষ যদি মানুষ হয় তবে হিংস্র কেন এত?
মায়ের বস্ত্র খুলে এমন নোংরামিটা কী হত?
আধুনিকতায় মোড়া দেখো এমন আমার দেশ
চারিদিকে এসব হচ্ছে কি? সমাজটা হচ্ছে শেষ।
সমাজের বুকে বাড়ছে শুধু হিংসা আর বিদ্বেষ
এমন ভাবেই সভ্য সমাজ আজ হচ্ছে দেখো শেষ।
নারীরা নয়কো সুরক্ষিত সভ্য সমাজের বুকে
মুখোশধারী ভদ্রবেশীরা ঘুরছে দিকে দিকে।
সাবধান থেকো তাদের থেকে ওই মিষ্টিভাষী যারা
নানান রকমের কুকর্মে দেখো লিপ্ত থাকে তারা।
সারাটা দেশ লজ্জিত আজ এই নগ্ন দৃশ্য দেখে
পরের প্রজন্ম কী শিখবে মনিপুর, মালদা থেকে?
শিক্ষিত এ সমাজের বুকে কলঙ্কটা বড়ো বোঝা
নারীর কলঙ্ক মুছে ফেলা নয়কো এতটা সোজা!
নগ্নতা আজ দেখতে হবে ভেবেছে কখনো কেউ?
মায়ের কোলেই বেড়ে উঠে মাকেই করছো হেয়!
আর কত কী দেখতে হবে এই সমাজের বুকে
ফুটে উঠছে আসল চিত্র দেখছে সবাই চোখে।

তাপস কুমার সরকার

স্বাধীনতা



স্বাধীন ভারতের আকাশে বাতাসে
রঞ্জিত হয়েছে তেরঙ্গা,
আজ গর্বিত আমরা ভারতবাসী
নিপাত গেছে লাঞ্ছনা।

ইংরেজদের ওই অপশাসনকে
দূর হটিয়েছিল যাঁরা,
এই মায়ের বুকে জন্ম নিয়েছিল
সেই বীর সন্তান তাঁরা।

সহস্র শহীদের আত্মবলিদানে
স্বাধীনতা পেয়েছি আমরা,
ভুলবনা কখনো বীর যোদ্ধাদের
প্রতিজ্ঞা বদ্ধ আমরা।

শ্রদ্ধা জানাই বীর শহীদদের যাঁরা
বুক ভাসিয়েছিল রক্তে,
পথ দেখিয়েছিল তাঁদের রক্তই
স্বাধীন ভারত গড়তে।

পরাধীন ভারতের মা-বোনেরা
দেখেছিল সেই দুর্দিন,
তারা যে স্বপ্নে বুক বেঁধেছিল
আসবে তাদের সু' দিন।

রক্তে রাঙা আমার ভারতবর্ষ
গর্জে উঠেছিল সেদিন
ব্রিটিশের হাতে আমার ভারত
থাকবে নাকো পরাধীন।

বিনয়, বাদল, দিনেশের প্রত্যাশার
ভারত আমরা গড়েছি,
বীর নেতাজির সেই স্বপ্নের ভারতে
পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছি।

শিবম ব্যানার্জী

ভারতমাতা এখন

পরাধীনতার ক্ষত জেগেছে পুনরায়
রক্তমাখা মায়ের শরীর চরম বেদনার শিকার
মায়ের আঁচল ভিজে গেছে সন্তানের রক্তে
মায়ের চোখে ভেসে উঠেছে দৃশ্য নগ্নতার।

মানুষ দুমড়ে মুচড়ে মরছে মায়ের কোলে
মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, ঘৃণা মায়েরই সম্মুখে
মানুষের শান্তি গেছে ঝরে হলুদ পাতার মতো
নেমেছে শতাব্দীর জ্বালা মায়ের বুকে।

মায়ের কোলের কু-সন্তানগুলি আজ
বুক ফুলিয়ে সমাজের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে
মায়ের কোলের সু-সন্তানগুলি সব
মা-কে রেখেছে গুছিয়ে তাদের হৃদয়ে।

মা তুমি নিধন করো পাষানদের রাজত্ব
জাগ্রত হয়ে ফিরে এসো শান্তির আলয়ে।

মনোরঞ্জন ঘোষাল

লড়াই চলছে চলবে

এখনো সব স্বাধীনতা আসেনি
আর সব স্বাধীনতা পাওয়া ঠিক না।
কিছু বাঁধন কিছু স্বাধীনতা থাকবে
অফুরান আকাশ তুমি পাবে না
তাহলে হারিয়ে যাবে ভূবন মাঝারে।
তাই বলে সমগ্র আকাশ কেড়ে নেওয়া যাবে না।
এখনও রয়েছে সেই দ্বন্দ
তাই এখনও লড়াই চলছে চলবে
এ লড়াই শেষ হবে না জানি
আমাদের সীমাহীন চাহিদার কাছে।
আমরা একটু একটু করে ছিনিয়ে নেব স্বাধীনতা
আনন্দে ভরিয়ে নেব নিজেদের যতটুকু পাই
তা বলে সংগ্রাম যাবে না থেমে
শেষ পরিণতি এইটাই।

প্রণব নাইয়া

চন্দ্রজয়ী আমরা



রাহু কেতুর গল্প মিছে
মিছে যে অমৃত।
চরকা কাটা বুড়ি মিছে
দেব দানো অনৃত।
'হও' বললে হয়না কিছুই
নেই কোনো 'কর্তা'।
কার্য কারণ সূত্র মেনে
বিজ্ঞানের যাত্রা
চলছে সারা কসমো-জুড়ে;
বিজ্ঞানই ত্রাতা।
আছে মিথ্যা কল্পনারা,
ভীরুতা অজ্ঞতা।
তবু তারা সব নয়
কিছুতো বিদ্বান
আছে বলে পৌঁছে গেছে
চাঁদেতে 'প্রজ্ঞান'।
এদেশের প্রযুক্তিতে
মেধা শ্রমে গড়া
চন্দ্রজয়ে বিশ্বজয়ী
ভারতীয় মোরা।

রাজু দত্ত

দেশ

আসলে কী জানো,
তোমার, আমার, আমাদের কোনো দেশ নেই।
আমরা যাকে ‘দেশ’ বলে জানি,
সেটা আসলে কিছু মানুষের হাতে গড়া,
বিশাল একটা খাঁচা।
প্রহরীর প্রহরায় সদা সুরক্ষিত।

বন্দি পাখি তার সৌন্দর্য্য আর কণ্ঠের বিনিময়
হারিয়ে ফেলে তার স্বাধীনতা।
ওড়বার স্বাধীনতা।
মুক্ত আকাশ তাকে ডাকে,
কেঁপে ওঠে তার ডানা দুটো,
কেঁপে ওঠে তার ঠোঁট।

সে উড়তে থাকে খাঁচার এপাশ থেকে ওপাশ।
সে গাইতে থাকে
গানে সুর থাকে, প্রাণ থাকে না।
নিষ্প্রাণ কাকলিতে মেতে বন্দি পাখিটি ভাবে
এইটাই তার পৃথিবী, এই তার আকাশ।
একসময় এই ভাবনায় সে হয়ে যায় অভ্যস্ত।

কখনো খাঁচার ভেতর হাতের স্পর্শে
সে চমকে ওঠে।
আসন্ন মুক্তির আশায়
সে গেয়ে ওঠে গান।
হয়ে যায় খাঁচা বদল।
কালকের খাঁচা আজ আর তার নয়।

আমরাও এই পাখিটির মত,
তোমার আমার আমাদের কোনো দেশ নেই।
আমরা যাকে ‘দেশ’ বলে জানি
সেটা আসলে কিছু মানুষের হাতে গড়া
বিশাল একটা খাঁচা।

রামকৃষ্ণ সাহা

খাবার

ছেলেটা আবদার করেছিল,
‘বাবা, মাংস খাব।’
তরুণ কাঁচুমাচু করে মাথা নিচু করে
বৌ এর দিকে তাকাল।
দু’ মাস হল চাকরিটা গেছে,
পকেট গড়ের মাঠ।
স্মিতা বুঝতে পারে ব্যাপারটা।
তোশকের তলা থেকে কুড়িয়ে কাছিয়ে
কিছু টাকা এনে তরুণের হাতে গুঁজে দেয়।

বাইরে বৃষ্টিটা একটু কমেছে।
রাস্তায় জল জমে আছে।
তরুণ হাফ প্যান্ট পরেই বেড়িয়ে পড়ে।
একহাতে বাজারের ব্যাগ, অন্যহাতে ছাতা।
বাড়ির সামনের জমা জল ডিঙিয়ে
উঠে আসে একটু উঁচু রাস্তায়।
ঐ তো সামনেই বাজার।
আবার এখানেও জল জমে আছে,
কটু গন্ধ, অনেকদিনের জমা জল।

পা দিতেই ছিটকে গিয়ে পড়ল তরুণ।
কিছুক্ষণ ওখানেই ছটফট করে,
তারপর স্থির হয়ে যায়।

প্রায় দু’ তিন ঘন্টা পর বাড়িতে খবর আসে
জমা জলে শর্ট সার্কিট হয়ে ...।
বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ছুটে আসে স্মিতা,

স্বামীর কাছে যেতে বাঁধা দেয় পাড়ার ছেলেরা।
থম মেরে ওখানেই বসে পড়ে।
হাউমাউ করে বলতে থাকে–
'ছেলেটা অপয়া, ও যদি মাংস খেতে না চাইত..
ওকেই বা দোষ দেই কেন?
আমি কেন যে টাকাটা দিলাম?'

বিদ্যুত দফতরের দিকে আঙুল কেউ তুলল না,
নিকাশি ব্যবস্থা কেন ব্যর্থ সে প্রশ্নও উঠল না।
তবে আঙুল উঠল,
কিন্তু কার দিকে? ঐ কপাল।
রাষ্ট্রযন্ত্রও মুচকি হাসে।
বলে ওঠে, আরও, আরও বেশি ধর্ম খাওয়াও।

শীতলপ্রসাদ

এটা হওয়ার কথা ছিল না

এখন সরীসৃপ হয়ে গর্তে ঢুকছি, বিষদাঁতহীন শীতল
রক্ত!
এটা হওয়ার কথা ছিল না, কথা ছিল মেরুদন্ড
ঋজু করে এগিয়ে যাব মানুষ হয়ে।
গান্ধীজির মত সত্য বলব, সুভাষের দেশে লড়াই করব।
তবে হিংস্রদের হুঙ্কারে নদী, গাছ, গ্রাম, শহর থেমে
যাচ্ছে,
সাথে আমিও।
লাল চোখ, পেশীবলে, আপাদমস্তক ভীতু
স্বার্থপর স্তাবক, হেলে পড়ার মাথার আড়ালে হৃদয়
বাঁচতে দাও বলতে পারি না, আকাশের
চাঁদ হাসে না এখন- আকাশ
থেকে উড়ে আসছে মাংসভুক চিল, শকুন।
কথা দিয়ে ছিল ভাত, কাপড় দেবে।
ভাত দিয়েছে রক্তমাখা, কাপড় দিয়েছে শতছিদ্র
ইজ্জত দেখা যাচ্ছে!
ওদের কাছে নতজানু কাঠপুতুল।
অস্ত্রাঘাতে প্রগতির তেজী ঘোড়াকে খোঁড়া করেছে।
আমি পরাজিত, দু হাত উপরে তুলেছি- আর তুমি,
রুখে দাঁড়িয়েছো?
এটা হওয়ার কথা ছিল না।

রাজু দত্ত

ওরা উড়ছে এখনো

শখ করে দুটো পায়রা পুষেছিল ছেলেটি,
আদর করে ওদের নাম রেখেছিল
সাম্য আর শান্তি।
ওরা সারাদিন উড়ে বেড়ায় পূব থেকে পশ্চিমে,
দক্ষিণ থেকে উত্তরে,
ওরা উড়ে বেড়ায় ঈশান থেকে নৈঋত
বায়ু থেকে অগ্নিকোন পর্যন্ত।
উপর নিচে ডাইনে বাঁয়ে চলে ওদের দৌরাত্ম্য।
দিনের শেষে ওরা ফিরে আসে
ওদের ছোট্ট কাঠের বাসাটিতে।

হঠাৎ সেদিন ব্যস্ত দুপুরে,
পাখিদের গান থেমে গেল ভীষণ আর্তনাদে।
শহরে লেগেছে আগুন, , , , যুদ্ধের
পুড়ছে শহর, পুড়ছে প্রেম,
নবজাতক স্বপ্নেরাও পুড়ে ছারখার।
বাতাস ঢেকেছে ধোঁয়ায়,
কাঁচা আর পোড়া মাংসের গন্ধে
ঢেকেছে ফুলের সুবাস।
রক্তস্নাত মাটিতে ছড়িয়ে আছে প্রজাপতিদের শব
আর ফুলেদের মৃতদেহ।

শোনিতের নদীতে এসেছে জোয়ার,
সাঁতরে বাঁচতে চায় জীবন্ত লাশেরা এখনো।
আর যারা মরে গেছে,
ওদের শবের পাহাড়ে ঢেকেছে সূর্যালোক।
ওদের ছিন্ন ভিন্ন শরীরে

সভ্যতার নিষ্ঠুর পদচিহ্ন সুস্পষ্ট অন্ধকারেও।
মানুষের হাতে গড়া সভ্য অরণ্যে দাপিয়ে বেড়ায়
হুবহু মানুষের মত দেখতে হিংস্র জানোয়ারের দল।
ওরা ব্যাকুল রক্ত পিপাসায়,
ওরা নরমাংসলোলুপ এক সুসভ্য জানোয়ার।

কিন্তু ও কী?
লাশের পাহাড়ের পাশে রক্তের নদীতে
ও কার মৃতদেহ? সেই ছেলেটির না!
যে দুটো পায়রা পুষেছিল,
আদর করে ওদের নাম রেখেছিল
সাম্য আর শান্তি।
আকাশ ঢেকেছে ধোঁয়ায় তবুও
ছেলেটির লাশের উপর ওরা উড়ছে এখনো
ব্যাথিত ডানায় ধোঁয়ার চাদর সরিয়ে।
ওরা উড়ছে এখনো রক্তের নদীর উপর।

মনোরঞ্জন ঘোষাল

পাল্টে ফেলছে সংবিধান



হেথা রক্তবীজের বংশে অসুর
একা দুর্গা করবে কী?
চক্রবূহ্য রচে অসুর
দুর্গা লড়ে পারবে কি?
যতই থাকুক ত্রিদেব নয়ন
যতই থাকুক হস্তী বল
যদি ঘিরে ধরে অসুর পাল ঐ
একা দুর্গা কী করবে বল?
কলির ছায়ে অসুর বলী
রামের মরণ রাবণ জয়
অসুর পূজে ধন ঐশ্বর্য
দুর্গা পূজে মরণ ভয়!
দৈব শক্তি ক্ষয়িষ্ণু প্রায়
অসুর দেবাই মুর্তিমান
খাঁড়ার মুখে সকলে তাই
পাল্টে ফেলছে সংবিধান।

বিপ্লব সেন

চেতনার অন্বেষণে

'চেতনার অন্বেষণ' করে চলি
মাধ্যম এই 'পত্রিকা',
যেথায় প্রশ্ন করতে শেখা
যেথায় মুক্তির পরিচয় রাখা।

আবদ্ধ নয় চলে অনুসন্ধান
ঘটনার কার্য কারণ,
ব্যাখ্যা করা বাস্তবের মধ্যে
নয় 'কল্পনার' নিয়ন্ত্রণ।

শুধুই সত্য খুঁজে চলা
আপেক্ষিক স্থান কাল পাত্র ধারণায়,
সেই সত্য বাস্তবতা
জ্ঞানের পরিপক্কতায়।

এভাবেই চেতনা মুক্ত করা
আকাশে যেমন বলাকার বিচরণ,
চেতনার আঁধার কাটিয়ে যেথায়
আলোর বিচ্ছুরণ।

পরিবর্তনশীল জীবনের চলার আবহে
বিকাশের ফরমান,
বিশ্বাস আনুগত্য আর গোলামীর বিরোধিতায়
চলমান আপেক্ষিক জ্ঞান।

আরও বিকশিত হোক 'চেতনার অন্বেষণ'
আরও গভীর হোক অভিব্যক্তি,
চারিদিকে গহীন আঁধারে এক চিলতে আলো
সেটাই দেখায় মুক্তি।

বুধন দাস

নৈরাজ্যের কবি..

আমি এক নৈরাজ্যের কবি,
যা দেখি তাই আঁকি ছবি,
কলমে আমার রক্তে রাঙা
চেতনার বানী বিপ্লব হানা।

বুদ্ধ হেথা যুদ্ধ করে,
হিটলার চায় শান্তি,
রাজতন্ত্রকামী গনতন্ত্র
সর্বত্র ভুলভ্রান্তি।

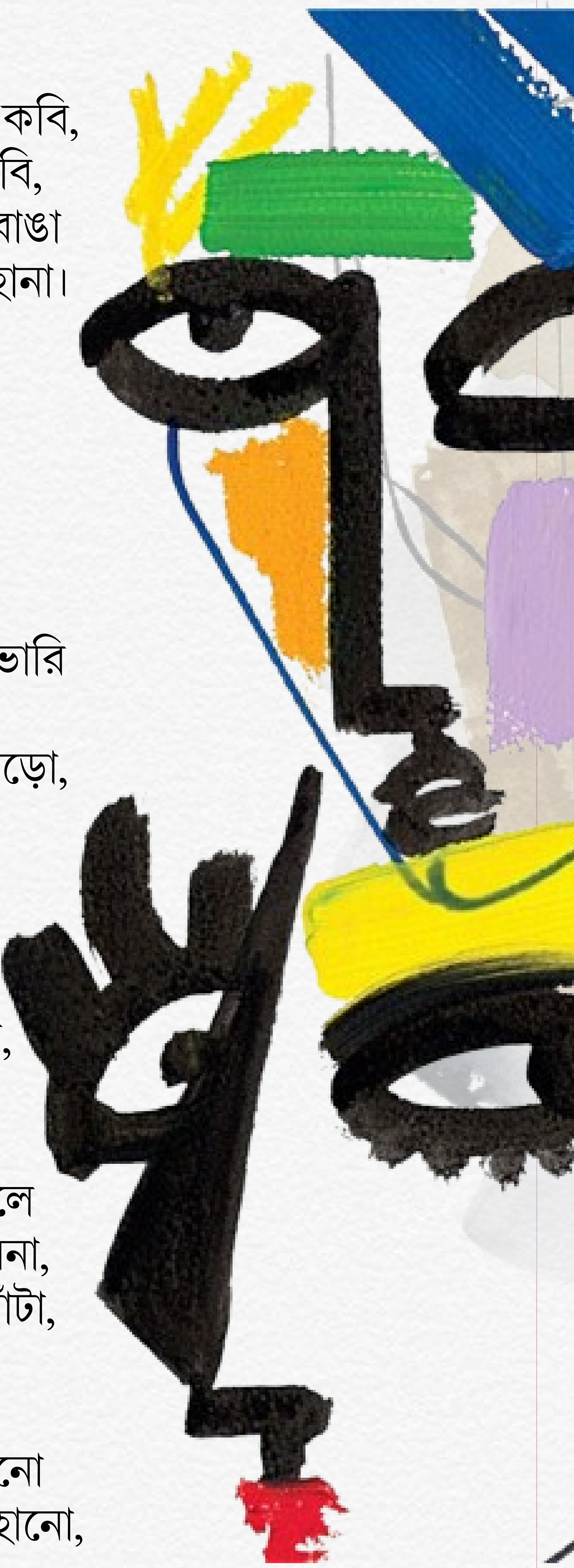
মুখের থেকে মুখোশ ভারি
মূর্খেরা মহাদদম্ভী,
নীতির থেকে নেতা বড়ো,
জয়ঢাক গগনচুম্বী।

ধর্মের নামে বিধর্মীরা
ছড়াচ্ছে বিষবাষ্প,
ভেদাভেদ হীন মনুষত্ব,
রুগ্ন নিস্পন্দ।

উলটো পথে সবাই চলে
সোজা পথে কেউ যায়না,
সত্যের মুখে কুলুপ আঁটা,
মিথ্যার নাম সেয়ানা।

শত দধিচীর অস্থি আনো
জীর্ন সমাজে আঘাত হানো,
ভেঙে করো চুরমার।

আমি এক নৈরাজ্যের কবি
যাদেখি তাই আঁকি ছবি।



বুধন দাস

প্রাকৃতিক...

শেয়াল রাজার সভাঘরে,
বাঘেরা আজ বিপন্ন।
প্রকৃতি তুমি রুখে দাঁড়াও,
শিরদাঁড়া সোজা রেখে।

ফুল ফোটার দিন শেষ,
আজ হুল ফোটার দিন।
বাজাতে হবে রনবাদ্য
তবে যদি বন বাঁচে।

মুখোশধারী চোরাশিকারী
নৈরাজ্যের মুগ্ধতায় মগ্ন।
প্রকৃতি তুমি রুখে দাঁড়াও,
চোখে চোখ রেখে।

আগামীর নূতন সূর্য
সভ্যতার নূতন গানে,
আবার ফোটাবে কুঁড়ি,
সৃষ্টির ধ্যানমন্ত্রে।



অনির্বাণ সাহা

কার লক্ষী?



দুষ্টু হাতে বিরাজ মা তোর
কষ্ট দেয় যে মনে
আর ক্ষুধার্ত পেট হাহাকার করে
কে বা তার কথা শোনে।

ভরা সিন্ধুকে শুধু ভরে দিস
শত শত কোটি টাকা
আর শূন্য ভাঁড়ার শূন্যই থাকে
অছিলার মরীচিকা।

প্রাসাদে যেথায় ঝোলে ঝাড়বাতি
শুনি অর্থের হুঙ্কার
আর ছিটে বেড়ার ছোট্ট কুটির
কালো মেঘে ঢাকা অন্ধকার।

স্বাচ্ছন্দ্যটা এক দুঃস্বপ্ন
বাসনা নেই যে মনে
দুবেলা দুমুঠো জুটবে আহার
এটুকু সুখ ও নেই জীবনে।

এ কেমন দৃষ্টি মা তোর
অল্প বুঝি আমি
নিশ্চই কোনো থাকবে কারণ
এটুকুই শুধু মানি।

হয়তো কখনো বদলাবে মা
এমন বিচার তোর
কান্না মুছে ফুটবে হাসি
প্রতীক্ষায় সেই ভোর।



কাজী নজরুল ইসলাম

কুলি মজুর

দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি ব'লে এক বাবু সা'ব তারে ঠেলে দিলে নীচে ফেলে!
চোখ ফেটে এল জল,
এমনি ক'রে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?
যে দধীচিদের হাড় দিয়ে ঐ বাষ্প-শকট চলে,
বাবু সা'ব এসে চড়িল তাহাতে, কুলিরা পড়িল তলে।
বেতন দিয়াছ?-চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল!
কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই কত ক্রোর পেলি বল্?
রাজপথে তব চলিছে মোটর, সাগরে জাহাজ চলে,
রেলপথে চলে বাষ্প-শকট, দেশ ছেয়ে গেল কলে,
বল ত এসব কাহাদের দান! তোমার অট্টালিকা
কার খুনে রাঙা?-ঠুলি খুলে দেখ, প্রতি ইটে আছে লিখা।
তুমি জান না ক', কিন্তু পথের প্রতি ধূলিকণা জানে,
ঐ পথ, ঐ জাহাজ, শকট, অট্টালিকার মানে!
আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা শুধিতে হইবে ঋণ!
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সে পথের দু' পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি;
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান,

তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান!
তুমি শুয়ে র' বে তেতালার পরে আমরা রহিব নীচে,
অথচ তোমারে দেবতা বলিব, সে ভরসা আজ মিছে!
সিক্ত যাদের সারা দেহ-মন মাটির মমতা-রসে
এই ধরণীর তরণীর হাল রবে তাহাদেরি বশে!
তারি পদরজ অঞ্জলি করি 'মাথায় লইব তুলি',
সকলের সাথে পথে চলি 'যার পায়ে লাগিয়াছে ধূলি!
আজ নিখিলের বেদনা -আর্ত পীড়িতের মাখি' খুন,
লালে লাল হ' য়ে উদিছে নবীন প্রভাতের নবারুণ!
আজ হৃদয়ের জমা-ধরা যত কবাট ভাঙিয়া দাও,
রং-করা ঐ চামড়ার যত আবরণ খুলে নাও!
আকাশের আজ যত বায়ু আছে হইয়া জমাট নীল,
মাতামাতি ক' রে ঢুকুক্ এ বুকে, খুলে দাও যত খিল!
সকল আকাশ ভাঙিয়া পড়ুক আমাদের এই ঘরে,
মোদের মাথায় চন্দ্র সূর্য তারারা পড়ুক ঝ' রে।
সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষ আসি'
এক মোহনায় দাঁড়াইয়া শোনো এক মিলনের বাঁশী।
একজনে দিলে ব্যথা-
সমান হইয়া বাজে সে বেদনা সকলের বুকে হেথা।
একের অসম্মান
নিখিল মানব-জাতির লজ্জা-সকলের অপমান!
মহা-মানবের মহা-বেদনার আজি মহা-উত্থান,
উর্ধ্বে হাসিছে ভগবান, নীচে কাঁপিতেছে শয়তান!

সজলকান্তি টিকাদার

বিবেক

যারা চোখ বুজে
ধর্ম পালন করে
তাদের সামনে দিয়ে
মনুষ্যত্ব হেঁটে গেলেও
খেয়াল করে না।
শুনতে পায়না মানুষের ডাক
তারা টিকি রাখে
আর
দাঁড়ি রাখে
তারা ঘন্টা বাজায়
কিংবা
নামাজ পড়ে।

তারা চোখ বুজে
অদৃশ্যকে কল্পনা করে

কিন্তু –
কান খুলে কান্না শুনতে
ভয় পায়।

মানুষের সঙ্গে তাদের
চিরকালীন বিরোধ।





মিশরে বিজ্ঞানী

বিশেষ সংযোজন

আহত উদ্ভিদ

আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু

পশ্চিমে কয় বৎসর যাবৎ আকাশ ধূমে আচ্ছন্ন ছিল। সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া দৃষ্টি পৌঁছিত না। অপরিস্ফুট আর্তনাদ কামানের গর্জনে পরাহত। কিন্তু

যেদিন হইতে শিখ ও পাঠান, গুরখা ও বাঙ্গালী সেই মহারণে জীবন আহুতি দিতে গিয়াছে, সেদিন হইতে আমাদের দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি হঠাৎ বাড়িয়া গিয়াছে।

শুভ্র তুষার-প্রান্তর যাহাদের জীবনধারায় রক্তিম হইয়াছে, তাহাদের অন্তিম বেদনা আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিতেছে। কী এই আকর্ষণ, যাহা সকল ব্যবধান ঘুচাইয়া দেয়, যাহা নিকটকেও নিকটতর করে, যাহাতে পর ও আপন ভুলিয়া যাই? সমবেদনাই সেই আকর্ষণ, কেবল সহানুভূতি-শক্তিতেই আমাদের জীবনে প্রকৃত সত্য প্রতিভাত হয়। চিরসহিষ্ণু এই উদ্ভিদরাজ্য নিশ্চলভাবে আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। উত্তাপ ও শৈত্য, আলো ও অন্ধকার, মৃদু সমীরণ ও ঝটিকা, জীবন ও মৃত্যু ইহাদিগকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। বিবিধ শক্তি দ্বারা ইহারা আহত হইতেছে, কিন্তু আহতের কোনো ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইতেছে না। অতি সংযত, মৌন ও অক্রন্দিত জীবনেরও যে এক মর্মভেদী ইতিহাস আছে, তাহা বর্ণনা করিব।

মানুষকে আঘাত করিলে সে চীৎকার করে। তাহা হইতে মনে করি, সে বেদনা পাইয়াছে। বোবা চীৎকার করে না, কী করিয়া জানিব, সে বেদনা পাইয়াছে? সে ছট্‌ফট্ করে, তাহার হস্ত পদ আকুঞ্চিত হয়; দেখিয়া মনে হয়, সেও বেদনা পাইয়াছে। সমবেদনা দ্বারা তাহার কষ্ট অনুভব করি। ব্যাঙকে আঘাত করিলে সে চীৎকার করে না, কিন্তু ছটফট করে; তবে মানুষ ও ব্যাঙে যে অনেক প্রভেদ! ব্যাঙ বেদনা পাইল কি না, একথা কেবল অন্তর্যামীই জানেন। সমবেদনা সতত ঊর্ধ্বমুখী, কখনও কখনও সমতলগামী, ক্বচিৎ নিম্নগামী। ইতর লোকে যে আমাদের মতই সুখ দুঃখ, মান অপমান বোধ করে, এ কথা কেহ কেহ সন্দেহ করিয়া থাকেন। ইতর জীবের তো কথাই নাই। তবে ব্যাঙ আঘাত পাইয়া যে কিছু একটা অনুভব করে এবং সাড়া দেয়, এ কথা মানিয়া লইতেই হইবে। অনুভব করে, এই কথা, টের পায় এই অর্থে

ব্যবহার করিব। মানুষ বেদনা পায়, ইতর জীব সাড়া দেয়, এই কথাতে কেহ কোনো আপত্তি করিবেন না। ব্যাঙের ছটফটানি দেখিয়া হয়তো অভ্যাস-দোষে কখনও বলিয়া ফেলিতে পারি, যে, সে বেদনা পাইয়াছে। এ কথাটা রূপক অর্থে লইবেন। কথা ব্যবহার সম্বন্ধে সাবধান হওয়া আবশ্যক। কারণ বিলাতের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত বলেন, যে, খোলা ছাড়াইয়া জীবিত ঝিনুক অথবা অয়স্টারকে যখন গলাধঃকরণ করা হয়, তখন ঝিনুক কোনো কষ্টই অনুভব করে না, বরঞ্চ পাক-গহ্বরের উষ্ণতা অনুভব করিয়া উল্লসিত হয়। ব্যাঘ্র- কবলিত হইয়া কেহ ফিরিয়া আসে নাই, সুতরাং পাকস্থলীর অন্তর্গত হইবার সুখ চিরকাল অনির্বচনীয়ই থাকিবে।

জীবনের মাপকাঠি

এখন দেখা যাউক, জীবন্ত অবস্থার কোনোরূপ মাপকাঠি আছে কি না। জীবিত ও মৃতের কী প্রভেদ? যে জীবিত, তাহাকে নাড়া দিলে সে সাড়া দেয়। কেবল তাহাই নহে; যে অধিক জীবন্ত, সে একই নাড়ায় অতি বৃহৎ সাড়া দেয়। যে মৃতপ্রায় সে নাড়ার উত্তরে ক্ষুদ্র সাড়া দেয়। যে মরিয়াছে, সে একেবারেই সাড়া দেয় না।

সুতরাং আঘাত দিয়া জীবন্ত ভাবের পরিমাণ করিতে পারি। যে তেজস্বী, সে অল্প আঘাতেই পূর্ণ সাড়া দিবে। আর যে দুর্ব্বল, সে অনেক তাড়না পাইয়া নিরুত্তর থাকিবে। মনে করুন, কোনোপ্রকারে আমার অঙ্গুলির উপর বার বার আঘাত পড়িতেছে। আঘাত পাইয়া অঙ্গুলি আকুঞ্চণ হইতেছে এবং তজ্জন্য নড়িতেছে। অল্প আঘাতে অল্প নড়ে এবং প্রচণ্ড আঘাতে বেশি নড়ে। শুধু চক্ষে তাহার পরিমাণ প্রকৃতরূপে লক্ষিত হয় না। আকুঞ্চন মাত্রা ধরিবার জন্য কোনোপ্রকার লিখিবার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। সম্মুখে যে পরীক্ষা দেখানো হইয়াছে, তাহা হইতে কলের আভাস পাওয়া যাইবে। স্বল্প আঘাতের পরে

স্বল্প আকুঞ্চন; কলমটা উপরের দিকে অল্প দূর উঠিয়া যায়, আকুঞ্চনরেখাও স্বল্প-আয়তন হয়। বৃহৎ আঘাতে রেখাটা বড়ো হয়।

কেবল তাহাই নহে। আঘাতের চকিত অবস্থা হইতে আমরা পুনরায় প্রকৃতিস্থ হই; সংকুচিত অঙ্গুলি পুনরায় স্বাভাবিকভাবে প্রসারিত হয়। আঘাত দিলে সংকুচিত অঙ্গুলির টানে লিখিত রেখা হঠাৎ উপর দিকে চলিয়া যায়। প্রকৃতিস্থ হইতে কিছু সময় লাগে, ঊর্দ্ধোত্থিত রেখা ক্রমশঃ নামিয়া পূর্ব্ব স্থানে আইসে। আঘাতের বেদনা অল্প সময়েই পূর্ণ মাত্রা হইয়া থাকে; কিন্তু সেই বেদনা অন্তর্হিত হইতে সময় লাগে। সেইরূপ আকুঞ্চনের সাড়া অল্প সময়েই হইয়া থাকে, তাহা হইতে প্রকৃতিস্থ হইবার প্রসারণ রেখা অধিক সময় লয়। গুরুতর আঘাতে বৃহত্তর সাড়া পাওয়া যায়, প্রকৃতিস্থ হইতে দীর্ঘতর সময় লাগে। বেদনাও অনেক কাল স্থায়ী হয়। যদি জীবিত পেশী একই অবস্থায় থাকে এবং একইবিধ আঘাত তাহার উপর বারবার পতিত হয়, তাহা হইলে সাড়াগুলি একই রকম হয়। কিন্তু জীবিত পেশী সর্বসময়ে একই অবস্থায় থাকে না; কারণ বাহ্য জগৎ এবং বিগত ইতিহাস আমাদিগকে মুহূর্তে মুহূর্তে নূতন রূপে গড়িতেছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রকৃতি মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তিত হইতেছে। কখনও বা উৎফুল্ল, কখনও বা বিমর্ষ, কখনও বা মুমূর্ষ। এই সকল ভিতরের পরিবর্তন অনেক সময় বাহির হইতে বুঝা যায় না। যিনি দেখিতে ভালমানুষটি তিনি হয়তো কোপনস্বভাব, অল্পেতেই সপ্তমে চড়িয়া বসেন; অন্যকে হয়তো কিছুতেই চেতানো যায় না। ব্যক্তিগত পার্থক্য, অবস্থাগত পরিবর্তন, তদ্ভিন্ন জীবনের অনেক ইতিহাস ও স্মৃতি আছে যাহার ছাপ অদৃশ্যরূপেই থাকিয়া যায়। সে সকল লুপ্ত কাহিনি কী কোনোদিন ব্যক্ত হইবে? প্রথমে মনে হয়, এই চেষ্টা একেবারেই অসম্ভব। দেখা যাউক, অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে কি না। কী করিয়া

লোকের স্বভাব পরখ করিব? সাচ্চা ও ঝুটার প্রভেদ কি? টাকা পরখ করিতে হইলে বাজাইয়া লইতে হয়; আঘাতের সাড়া, শব্দরূপে শুনিতে পাই। সাচ্চা ও ঝুটার সাড়া একেবারেই বিভিন্ন, একটাতে সুর আছে, অন্যটা একেবারে বেসুর। মানুষের প্রকৃতিও বাজাইয়া পরখ করা যায়। অদৃষ্ট দারুণ আঘাত দিয়া মানুষকে পরীক্ষা করে, সাচ্চা ও ঝুটার পরীক্ষা কেবল তখনই হয়।

হয়ত এইরূপে জীবের প্রকৃতি ও তাহার ইতিহাস বাহির করা যাইতে পারে—আঘাত করিয়া এবং তাহার সাড়া লিপিবদ্ধ করিয়া। সাড়া-লিপি তো রেখা মাত্র, কোনোটা একটু বড়ো কোনোটা কিছু ছোটো। দুইটি রেখার সামান্য বিভেদ হইতে এমন অব্যক্ত, এমন অন্তরঙ্গ, এমন রহস্যময় ইতিহাস কিরূপে ব্যক্ত হইবে? কথাটা যত অসম্ভব মনে হয়, বাস্তবিক তত নয়। গ্রহবৈগুণ্যে হয়ত আমাদিগকে কোনোদিন আসামীরূপে আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে। সেখানে আসামীর বাগাড়ম্বর করিবার অধিকার নাই। কৌসুলির জেরাতে কেবল 'হাঁ' কি 'না' এইমাত্র উত্তর দিতে হইবে। অর্থাৎ কেবলমাত্র দুই প্রকার সাড়া দিতে পারিব—শিরের ঊর্ধ্বাধঃ অথবা দক্ষিণ-বামে আন্দোলন দ্বারা। যদি আসামীর নাকের উপর কালি মাখাইয়া সম্মুখে একখানি অতি শুভ্র স্ট্যাম্প- কাগজ ধরা যায়, তাহা হইলে কাগজে দুই রকম সাড়া লিখিত হইবে। ইহাই প্রকৃত নাকে-খৎ এবং এই দুইটি রেখাময়ী সাড়া দ্বারা স্বয়ং ধর্মাবতার বিচারপতি আমাদের সমস্ত জীবন পরীক্ষা করিবেন এবং সেই বিচারের ফলেই আমাদের ভবিষ্যৎ বাসস্থান নিরূপিত হইবে, কলিকাতায় কিংবা আন্দামানে, ইহলোকে কিংবা পরলোকে!

এতক্ষণ মানুষের কথা বলিলাম। গাছের কথা ও তাহার গূঢ় ইতিহাসের কথা-এখন বলিব। গাছের পরীক্ষা করিতে হইলে গাছকে কোনো বিশেষরূপে আঘাত দ্বারা উত্তেজিত করিতে হইবে এবং তাহার উত্তরে সে যে

সংকেত করিবে, তাহা তাহাকে দিয়াই লিপিবদ্ধ করাইতে হইবে। সেই লিখনভঙ্গী দিয়াই তাহার বর্তমান ও অতীত ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইবে। সুতরাং এই দুরূহ প্রযত্ন সফল করিতে হইলে দেখিতে হইবে–

১। গাছ কী আঘাতে উত্তেজিত হয় এবং কিরূপে সেই আঘাতের মাত্রা নিরূপিত হইতে পারে?

২। আঘাত পাইয়া গাছ উত্তরে কিরূপ সংকেত করে?

৩। কী প্রকারে সেই সংকেত লিপিরূপে অঙ্কিত হইতে পারে?

৪। সেই লেখার ভঙ্গী হইতে কী করিয়া গাছের ইতিহাস উদ্ধার হইতে

পারে?

৫। গাছের হাত অর্থাৎ ডাল কাটিলে গাছ কি ভাবে তাহা অনুভব করে?

গাছের উত্তেজনার কথা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের কোনো অঙ্গে আঘাত করিলে সেখানে একটা বিকার ভাব উৎপন্ন হয়। তাহাতে অঙ্গ সংকুচিত হয়। তদ্ভিন্ন আহত স্থান হইতে সেই বিকারজনিত একটা ধাক্কা স্নায়ুসূত্র দিয়া মস্তিষ্কে আঘাত করে; তাহা আমরা আঘাতের মাত্রা ও প্রকৃতিভেদে সুখ কিংবা দুঃখ বলিয়া মনে করি। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাঁধিলে যদিও নড়িবার শক্তি বন্ধ হয়, তথাপি সেই স্নায়ুসূত্র বাহিয়া যে সংবাদ যায়, তাহা বন্ধ হয় না। বৃক্ষকে তার দিয়া বৈদ্যুতিক কলের সঙ্গে সংযোগ করিলে দেখা যায় যে, গাছকে আঘাত করিবামাত্র সে একটা বৈদ্যুতিক সাড়া দিতেছে। গাছের মৃত্যুর পর আর কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। এইরূপে সকল প্রকার গাছ এবং তাহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আঘাত অনুভব করিয়া যে সাড়া দেয়, ইহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

কোনো কোনো গাছ আছে যাহারা নড়িয়া সাড়া দেয়;

যেমন লজ্জাবতী লতা। প্রতি পত্র-মূলের নীচের দিকে উদ্ভিদপেশী অপেক্ষাকৃত স্থূল। আমাদের মাংসপেশী আহত হইলে যেরূপ সংকুচিত হয়, পত্রমূলের নীচের দিকের উদ্ভিদ পেশীও আঘাতে সেরূপ সংকুচিত হয়। তাহার ফলে পাতাটা পড়িয়া যায়। আঘাতজনিত আকস্মিক সংকোচের পরে গাছ প্রকৃতিস্থ হয় এবং পাতাটা আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া উত্থিত হয়। মানুষ যেরূপ হাত নাড়িয়া সাড়া দেয়, লজ্জাবতী সেইরূপ পাতা নাড়িয়া সাড়া দেয়।

মানুষকে যেরূপে উত্তেজিত করা যায়, লজ্জাবতীকে ঠিক সেই প্রকারে উত্তেজিত করা যাইতে পারে, যথা লাঠির আঘাত দিয়া, চিমটি কাটিয়া, উত্তপ্ত লোহার ছ্যাঁকা দিয়া, এসিডে পোড়াইয়া ইত্যাদি। এই সকল নাড়া পাইয়া পাতা সাড়া দেয়। তবে এ সকল ভীষণ তাড়না পাতা অধিক কাল সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করে। সুতরাং দীর্ঘকাল পরীক্ষার জন্য কোনরূপ মৃদু তাড়নার ব্যবস্থা আবশ্যক, যাহাতে পাতার প্রাণনাশ না হয় এবং নাড়ার মাত্রাটা যেন ঠিক এক পরিমাণে থাকে।

গাছটিকে কোনো সহজ উপায়ে নিদ্রিত অথবা নিশ্চল অবস্থা হইতে জাগাইতে হইবে। রাজকন্যা মায়াবশে নিদ্রিতা ছিলেন, সোনার কাঠি ও রূপার কাঠির স্পর্শে তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সম্মুখের পরীক্ষা হইতে জানা যাইতেছে যে সোনার কাঠি ও রূপার কাঠি স্পর্শ করা মাত্র লজ্জাবতী লতা ও নিশ্চল ব্যাঙ পাতা ও গা নাড়িয়া সাড়া দিল। ইহার কারণ এই, যে, দুই বিভিন্ন ধাতুর স্পর্শ হইলেই বিদ্যুৎস্রোত বহিতে থাকে এবং সেই বিদ্যুৎবলে সর্বপ্রকার জীব ও উদ্ভিদ একইরূপে উত্তেজিত হয়। বিদ্যুৎশক্তি দ্বারা উত্তেজিত করিবার সুবিধা এই যে, কল দ্বারা উহার শক্তি হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায়, অথবা একই প্রকার রাখা যাইতে পারে। ইচ্ছাক্রমে বিদ্যুতের আঘাত বজ্রানুরূপ ভীষণ করিয়া মুহূর্তে জীবন ধ্বংস করা যাইতে

পারে, অথবা কলের কাঁটা ঘুরাইয়া আঘাত মৃদু হইতে মৃদুত্তর করা যায়। এইরূপ মৃদু আঘাতে বৃক্ষের কোনো অনিষ্ট হয় না।

গাছের লিপিযন্ত্র।

গাছের সাড়া দিবার কথা বলিয়াছি। এখন কঠিন সমস্যা এই, কী করিয়া গাছের সাড়া লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে। জন্তুর সাড়া সাধারণতঃ কলম সংযোগে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু চড়ুই পাখির লেজে কুলা বাঁধিলে তাহার উড়িবার যেরূপ সাহায্য হয়, গাছের পাতার সহিত কলম বাঁধিলে তাহার লিখিবার সাহায্যও সেইরূপই হইয়া থাকে। এমন-কি, বন- চাঁড়ালের ক্ষুদ্র পত্র সুতার ভার পর্যন্তও সহিতে পারে না; সুতরাং সে যে কলম ঠেলিয়া সাড়া লিখিবে এরূপ কোনো সম্ভাবনা ছিল না। এ জন্য আমি অন্য উপায় গ্রহণ করিয়াছিলাম। আলো-রেখার কোনো ওজন নাই। প্রথমতঃ, প্রতিবিম্বিত আলো-রেখার সাহায্যে আমি বৃক্ষপত্রের বিবিধ লিপিভঙ্গী স্বহস্তে লিখিয়া লইয়াছিলাম। ইহা সম্পাদন করিতেও বহু বৎসর লাগিয়াছিল। যখন এই সকল নূতন কথা জীবতত্ত্ববিদদিগের নিকট উপস্থিত করিলাম, তখন তাঁহারা যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। পরিশেষে আমাকে জানাইলেন, যে, এই সকল তত্ত্ব এরূপ অভাবনীয় যে, যদি কোনোদিন বৃক্ষ স্বহস্তে লিখিয়া সাক্ষ্য দেয়, কেবল তাহা হইলেই তাঁহারা এরূপ নূতন কথা মানিয়া লইবেন।

যেদিন এ সংবাদ আসিল, সেদিন সকল আলো যেন আমার চক্ষে নিবিয়া গেল। কিন্তু পূর্ব হইতেই জানিতাম, সফলতা, বিফলতারই উল্টা পিঠ। এ কথাটা আবার নূতন করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলাম। বারো বৎসর পর শাপই বর হইল। সেই বারো বৎসরের কথা সংক্ষেপে বলিব। কলটি সম্পূর্ণ নূতন করিয়া গড়িলাম। অতি সূক্ষ্ম তার দিয়া একান্ত লঘু ওজনের কলম প্রস্তুত করিলাম। সে

কলমটিও মরকত নির্মিত জুয়েলের উপর স্থাপিত হইল, যেন পাতার একটু টানেই লেখনী সহজে ঘুরিতে পারে। এতদিন পর বৃক্ষপত্রের স্পন্দনের সহিত লেখনী স্পন্দিত হইতে লাগিল। তাহার পর লিখিবার কাগজের ঘর্ষণের বিরুদ্ধে কলম আর উঠিতে পারিল না। কাগজ ছাড়িয়া মসৃণ কাচের উপর প্রদীপের কৃষ্ণ কাজল লেপিলাম। কৃষ্ণ লিপিপটে শুভ্র লেখা হইল। ইহাতে ঘর্ষণের বাধাও অনেকটা কমিয়া গেল; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গাছের পাতা সেই সামান্য ঘর্ষণের বাধা ঠেলিয়া কলম চালাইতে পারিল না। ইহার পর অসম্ভবকে সম্ভব করিতে আরও ৫/৬ বৎসর লাগিল। তাহা আমার 'সমতাল' যন্ত্রের উদ্ভাবন দ্বারা সম্ভাবিত হইয়াছে। এই সকল কলের গঠনপ্রণালী বর্ণনা করিয়া আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি করিব না। তবে ইহা বলা আবশ্যক যে, এই সকল কলের দ্বারা বৃক্ষের বহুবিধ সাড়া লিখিত হয়। বৃক্ষের বৃদ্ধি মুহূর্তে নির্ণীত হয় এবং এইরূপে তাহার স্বতঃস্পন্দন লিপিবদ্ধ হয় এবং জীবন ও মৃত্যু- রেখা তাহার আয়ু পরিমাপ করে।

গাছের লেখা হইতে তাহার ভিতরকার ইতিহাস উদ্ধার

গাছের লিখনভঙ্গী ব্যাখ্যা অনেক সময়-সাপেক্ষ। তবে উত্তেজিত অবস্থায় সাড়া বড় হয়, বিমর্ষ অবস্থায় সাড়া ছোট হয় এবং মুমূর্ষু অবস্থায় সাড়া লুপ্তপ্রায় হয়। এই যে সাড়ালিপি সম্মুখে দেখিতেছেন তাহা লিখিবার সময় আকাশ ভরিয়া পূর্ণ আলো এবং বৃক্ষ উৎফুল্ল অবস্থায় ছিল। সেইজন্য সাড়াগুলির পরিমাণ কেমন বৃহৎ! দেখিতে দেখিতে সাড়ার মাত্রা কোন অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ ছোট হইয়া গেল। ইতিমধ্যে যদি কোন পরিবর্তন হইয়া থাকে তাহা আমার অনুভূতিরও অগোচর ছিল। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, সূর্য্যের সম্মুখে একখানা ক্ষুদ্র মেঘ- খণ্ড বাতাসে উড়িয়া যাইতেছে। তাহার জন্য সূর্যালোকের

যে যৎকিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছিল তাহা ঘরের ভিতর হইতে কোনরূপে বুঝিতে পারি নাই; কিন্তু গাছ টের পাইয়াছিল, সে ছোট্ট সাড়া দিয়া তাহার বিমর্ষতা জ্ঞাপন করিল। আর যেই মেঘখণ্ড চলিয়া গেল অমনি তাহার পূর্ব্বের ন্যায় উৎফুল্লতার সাড়া প্রদান করিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমি বৈদ্যুতিক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছিলাম যে, সকল গাছেরই অনুভব-শক্তি আছে। এ কথা পশ্চিমের বৈজ্ঞানিকেরা অনেক দিন পর্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কিয়দ্দিন হইল ফরিদপুরের খেজুর বৃদ্ধ আমার কথা প্রমাণ করিয়াছে। এই গাছটি প্রত্যুষে মস্তক উত্তোলন করিত, আর সন্ধ্যার সময় মস্তক অবনত করিয়া মৃত্তিকা স্পর্শ করিত। ইহা যে গাছের বাহিরের পরিবর্তনের অনুভূতি- জনিত তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। যে সকল উদাহরণ দেওয়া গেল তাহা হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, বৃক্ষ-লিখিত সাড়া দ্বারা তাহার জীবনের গুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার হইতে পারে। গাছের পরীক্ষা হইতে জীবন সম্বন্ধে এইরূপ বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার সম্ভবপর হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক সত্য ব্যতীত অনেক দার্শনিক প্রশ্নেরও মীমাংসা হইবে বলিয়া মনে হয়।

পাত্রাধার তৈল।

শুনিতে পাই, কুকুরের লাঙ্গুল আন্দোলন লইয়া দুই মতের এ পর্যন্ত মীমাংসা হয় নাই। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, কুকুর লেজ নাড়ে; অন্য পক্ষে বলিয়া থাকেন, লেজই কুকুরকে নাড়িয়া থাকে। এইরূপ পাতা নড়ে, কি গাছ নড়ে? তৈলাধার পাত্র কী পাত্রাধার তৈল? কে নাড়ায় আর কে সাড়া দেয়? বিলাতে আমাদের সমাজ লইয়া অনেক সমালোচনা হইয়া থাকে। এ দেশে নাকি নারীজাতি নিজের ইচ্ছায় কিছু করিতে পারেন না। কেবল পুরুষের ইঙ্গিতে পুতুলের ন্যায় তাঁহারা চলাফেরা করিয়া থাকেন। কে কাহার ইঙ্গিতে চলে? রাশ কাহার হাতে? কে

নাড়ায়, কুকুর কিংবা তাহার লেজ? ভুক্তভোগীরা যাহা যাহা বলেন, তাহা অন্যরূপ। বাহিরে যতই প্রতাপ, যতই আস্ফালন, এ সকল পুতুলের নাচ মাত্র, চালাইবার সূত্র নাকি অন্তঃপুরে। এমন সময়ও আসে, যখন রমণী সেই বন্ধন-রজ্জু স্বীয় হস্তেই ছেদন করেন। অঞ্চল দিয়া যাহাকে এতদিন রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাকেই আদেশ করেন— যাও তুমি দূরে, কেবল আর্শীবাদ লইয়া! তোমাকে মৃত্যুর হস্তেই বরণ করিলাম!

আঘাত করিলে লজ্জাবতীর পাতা পড়িয়া যায়। পাতা নড়ে কিংবা গাছ নড়ে, তাহা পরীক্ষা করিয়া নির্ণয় করা যাইতে পারে। প্রথম, গাছ ধরিয়া রাখিলে গাছ নড়িতে পারে না, পাতাই নড়ে। কিন্তু যদি পাতা ধরিয়া মাটি হইতে মূল উঠাইয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যায়— আঘাতে গাছই নড়িয়া উঠে, পাতা স্থির থাকে। অঙ্গে আঘাত পাইলে সেই আঘাতের বেদনা সমস্ত শিরায় শিরায় বৃক্ষের সর্ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ধাবিত হয় এবং একের আপদ অন্যে নিজের বলিয়া লয়। কারণ, যদিও বৃক্ষটি শত সহস্র শাখাপ্রশাখা লইয়া গঠিত, তাহা সত্ত্বেও কোনো এক গ্রন্থি ইহাদিগকে এক করিয়া বাঁধিয়াছে। কেবল সেই একতার বন্ধনের জন্যই বাহিরের ঝটিকা ও আঘাত তুচ্ছ করিয়া বৃক্ষ তাহার শির উন্ন করিয়া রহিয়াছে।

আহতের সাড়া

এক্ষণে দেখা যাউক, কী কি বিভিন্নরূপে আহত বৃক্ষ তাহার ক্লিষ্টতা বাহিরে উদ্দীপন করে? আমি এ সম্বন্ধে বৃক্ষের দুই প্রকার সাড়া বিবৃত করিব। প্রথমতঃ, বর্ধনশীল গাছে ছুরি বসাইলে বৃদ্ধির মাত্রা বাড়ে কী কমে, সে বিষয় জ্ঞাপন করিব। দ্বিতীয়তঃ গাছের পাতা কাটিয়া ফেলিলে সেই অস্ত্রাঘাতে গাছ এবং বৃক্ষবিচ্যুত পাতা কিরূপ অনুভব করিবে, তাহা দেখাইব।

গাছ স্বভাবতঃ কতখানি করিয়া বাড়ে তাহা জানিতে

হইলে অনেক সময় লাগে। অমুকের গতি হইতে গাছের বৃদ্ধিগতি ছয় সহস্র গুণ ক্ষীণ, এজন্য আমাকে এক নূতন কল আবিষ্কার করিতে হইয়াছে, তাহার নাম ক্রেস্কোগ্রাফ। তাহা দ্বারা বৃদ্ধি মাত্রা কোটি গুণ বাড়াইয়া লিপিবদ্ধ হয়। যেখানে অণুবীক্ষণ পরাস্ত, তাহার পরও ক্রেস্কোগ্রাফের কৃতিত্ব লক্ষগুণ বেশি। কোটি গুণ বৃদ্ধি আপনারা মনে ধারণা করিতে পারিবেন না; এজন্য গল্পচ্ছলে উদাহরণ দিতেছি। একবার বাংলা নাগপুর এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলের গাড়ির দৌড় হইয়াছিল—কে আগে যাইতে পারে। এমন সময় এক শম্বুক তাহা দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। অমনি সে ক্রেস্কোগ্রাফের উপর আরোহণ করিল। খানিক পরে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে পাইল, গাড়ি বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে।

ইচ্ছা ছিল, কলের নাম ক্রেস্কোগ্রাফ না রাখিয়া 'বৃদ্ধিমান' রাখি। কিন্তু হইয়া উঠিল না। আমি প্রথম প্রথম আমার নূতন কলগুলির সংস্কৃত নাম দিয়াছিলাম, যেমন 'কুঞ্চনমান' এবং 'শোষণমান'। স্বদেশী প্রচার করিতে যাইয়া অতিশয় বিপন্ন হইতে হইয়াছে। প্রথমতঃ, এই সকল নাম কিম্ভূতকিমাকার হইয়াছে বলিয়া বিলাতি কাগজ উপহাস করিলেন। কেবল বোস্টনের প্রধান পত্রিকা অনেকদিন আমার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। সম্পাদক লেখেন, 'যে আবিষ্কার করে, তাহারই নামকরণের প্রথম অধিকার। তাহার পর নূতন কলের নাম পুরাতন ভাষা লাটিন ও গ্রীক হইতেই হইয়া থাকে। তাহা যদি হয় তবে অতি পুরাতন অথচ জীবন্ত সংস্কৃত হইতে কেন হইবে না?' বলপূর্বক যেন নাম চালাইলাম, কিন্তু ফল হইল অন্যরূপ। গতবারে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতার সময় তথাকার বিখ্যাত অধ্যাপক আমার বল 'কাঞ্চনম্যান' সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, শেষে বুঝিলাম 'কাঞ্চনমান' কাঞ্চনম্যানে রূপান্তরিত হইয়াছে। হান্টার

সাহেবের প্রণালী মতে কুঞ্চন বানান করিয়াছিলাম, হইয়া উঠিল কাঞ্চন। রোমক অক্ষরমালার বিশেষ গুণ এই, যে, ইহার কোনো-একটা স্বরকে অ হইতে ঔ পর্যন্ত যথেচ্ছরূপ উচ্চারণ করা হইতে পারে; কেবল হয় না, ঋ ও ৯। তাহাও উপরে কিংবা নীচে দু-একটা ফোঁটা দিলে হইতে পারে।

সে যাহা হউক, বুঝিতে পারিলাম, হিরণ্যকশিপুকে দিয়া বরং হরিনাম উচ্চারণ করানো যাইতে পারে, কিন্তু ইংরেজকে বাংলা কিংবা সংস্কৃত বলানো একেবারেই অসম্ভব। এজন্যই আমাদের হরিকে হ্যারী হইতে হয়। এই সকল দেখিয়া কলের 'বৃদ্ধিমান' নামকরণের ইচ্ছা একেবারে চলিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধিমান, তাহা হইতে 'বারডোয়ান' হইত। তার চেয়ে ক্রেস্কোগ্রাফই ভাল।

বাড়ন্ত গাছ প্রতি সেকেণ্ডে কতটুকু বৃদ্ধি পায়, তাহা পর্যন্ত এই কল লিখিয়া দেয়। ইহাতে জানা যায়, যে, এই গাছটি এক মিনিটে এক ইঞ্চির লক্ষ ভাগের ৪২ ভাগ করিয়া বাড়িতেছিল। গাছটিকে তখন একখানা বেত দিয়া সামান্য রকমে আঘাত করিলাম। অমনি গাছের বৃদ্ধি একেবারে কমিয়া গেল। সে আঘাত ভুলিতে গাছের আধ ঘণ্টার অধিক সময় লাগিয়াছিল। তাহার পর অতি সন্তর্পণে সে পুনরায় বাড়িতে আরম্ভ করিল। হে বেত্রপাণি স্কুলমাস্টার, তোমার কানমলা খাইয়া কেহ কেহ যে হাইকোর্টের জজ পর্য্যন্ত হইয়াছেন, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু ছেলেরা তোমার হাতে বেত খাইয়া যে হঠাৎ লম্বায় বাড়িয়া উঠিবে, এ সম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহ আছে। সর্বপ্রকার আঘাতেই বৃদ্ধি কমিয়া যায়। সূঁচ দিয়া বিন্ধিয়াছিলাম, তাহাতে গাছের বৃদ্ধি কমিয়া এক-চতুর্থ হইয়া গেল। এক ঘণ্টা পরেও সে আঘাত সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই, তখনও তাহার বৃদ্ধির গতি অর্ধেকেরও অধিক হইতে পারে নাই। ছুরি দিয়া লম্বাভাবে চিরিলে আঘাত আরও গুরুতর হয়। তাহাতে বৃদ্ধি অনেক সময়

পর্যন্ত থামিয়া যায়। কিন্তু লম্বা চেরার চেয়ে এপাশ ওপাশ করিয়া কাটা আরও নিদারুণ। কই মাছ কাটিবার সময় এই কথাটি যেন গৃহলক্ষ্মীরা মনে রাখেন।

আঘাতে অনুভূতি-শক্তির বিলোপ।

ইহার পর লজ্জাবতী লতার পাতা কাটিলাম। তাহাতে কাটা পাতা এবং গাছের যে সকল পাতা ছিল সমস্তগুলিই মুষড়াইয়া পড়িয়া গেল। ইহার পর দেখিতে হইবে, কাটা পাতা ও আহত বৃক্ষের অবস্থা কিরূপ হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, ৩/৪ ঘণ্টা পর্যন্ত উভয়েই একেবারে অচেতন। তাহার পরের ইতিহাস বড়ই অদ্ভুত। কাটা পাতাটিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য সুখাদ্য রস পান করিতে দিয়াছিলাম। ইহাতে পাতাটা চারি ঘণ্টার পর মাথা তুলিয়া উঠিল ও বড়ো রকমের সাড়া দিল। ভাবটা এই-কি হইয়াছে? ভালই হইয়াছে; গাছটার সঙ্গে এতদিন বাঁধা ছিলাম, এখন শরীরটা কেমন লঘু লাগে! এইরূপে পাতাটা জেদের সহিত বারবার সাড়া দিতে লাগিল। এই ভাবটা সমস্ত দিন ছিল। তাহার পরদিন কী যে হইল জানি না, সাড়াটা একেবারে কমিয়া গেল। ৫০ ঘণ্টার পর পাতাটা মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল। তারপরেই মৃত্যু! যাহার পাতা কাটা হইয়াছিল, সেই গাছটার ইতিহাস অন্যরূপ। সে ধীরে ধীরে সারিয়া উঠিল। 'কুপরোয়া নেই' ভাবটা তাহার একেবারেই ছিল না। যাহা আছে, তাহা লইয়াই তাহাকে থাকিতে হইবে। ধীরে ধীরে আহত বৃক্ষ তাহার বেদনা সামলাইয়া লইল। যে সাময়িক দুর্বলতা আসিয়াছিল, তাহা ঝাড়িয়া ফেলিল এবং পূর্বের ন্যায় সাড়া দিতে সক্ষম হইল।

জন্মভূমি

কেন তবে এই বিভিন্নতা? কী কারণে ছিন্নশাখ-বৃক্ষ আহত ও মুমূর্ষু হইয়াও কিয়দ্দিন পর বাঁচিয়া উঠে, আর বিচ্যুতপত্র নানা ভোগে লালিত হইয়াও মৃত্যুমুখে পতিত

হয়? ইহার কারণ এই, যে, বৃক্ষের মূল একটা নির্দিষ্ট ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত, যে স্থানের রস দ্বারা তাহার জীবন সংগঠিত হইতেছে। সেই ভূমিই তাহার স্বদেশ ও তাহার পরিপোষক।

বৃক্ষের ভিতরেও আর একটি শক্তি নিহিত আছে, যাহা দ্বারা যুগে যুগে সে আপনাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়াছে। বাহিরে কত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু অদৃষ্টবৈগুণ্যে সে পরাহত হয় নাই। বাহিরের আঘাতের উত্তরে পূর্ণজীবন দ্বারা সে বাহিরের পরিবর্তনের সহিত যুঝিয়াছে। যে পরিবর্তন আবশ্যক, সে তাহা গ্রহণ করিয়াছে; যাহা অনাবশ্যক, জীর্ণপত্রের ন্যায় সে তাহা ত্যাগ করিয়াছে। এইরূপে বাহিরের বিভীষিকা সে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

আরও একটি শক্তি তাহার চিরসম্বল রহিয়াছে। সে যে বটবৃক্ষের বীজ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এই স্মৃতির ছাপ তাহার প্রতি অঙ্গে রহিয়াছে। এই জন্য তাহার মূল ভূমিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, তাহার শির ঊর্ধ্বে আলোকের সন্ধানে উন্নত এবং শাখা প্রশাখা ছায়াদানে চতুর্দিকে প্রসারিত। তবে কী কী শক্তিবলে সে আহত হইয়াও বাঁচিয়া থাকে? যে ধৈর্য্য, যে দৃঢ়তায় সে তাহার স্বস্থান দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া থাকে, যে অনুভূতিতে সে ভিতর ও বাহিরের সামঞ্জস্য করিয়া লয়, সে স্মৃতিতে বহু জীবনের সঞ্চিত শক্তি নিজস্ব করিয়া লয়। আর যে হতভাগ্য আপনাকে স্বস্থান ও স্বদেশ হইতে বিচ্যুত করে, যে পর-অন্নে পালিত হয়, যে জাতীয় স্মৃতি ভুলিয়া যায়, সে হতভাগ্য কী শক্তি লইয়া বাঁচিয়া থাকিবে? বিনাশ তাহার সম্মুখে, ধ্বংসই তাহার পরিণাম।

সাহিত্য পরিষদে বক্তৃতা। ১৯১৯



প্রথম সারি (বাঁদিক থেকে ডানদিকে): নিখিল রঞ্জন সেন, জ্ঞানেন্দ্র নাথ মুখার্জী, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, দেবেন্দ্র মোহন বসু। দ্বিতীয় সারি (বাঁদিক থেকে ডানদিকে): এন. সি. নাগ, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জগদীশ চন্দ্র বসু, মেঘনাদ সাহা, স্নেহময় দত্ত।

বিজ্ঞানে সাহিত্য

আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু

জড় জগতে কেন্দ্র আশ্রয় করিয়া বহুবিধ গতি দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রহগণ সূর্য্যের আকর্ষণ এড়াইতে পারে না, উচ্ছৃঙ্খল ধূমকেতুকেও একদিন সূর্যের দিকে ছুটিতে হয়।

জড় জগৎ ছাড়িয়া জঙ্গম জগতে দৃষ্টিপাত করিলে তাহাদের গতিবিধি বড়ো অনিয়মিত বলিয়া মনে হয়। মাধ্যাকর্ষণশক্তি ছাড়াও অসংখ্য শক্তি তাহাদিগকে সর্ব্বদা সন্তাড়িত করিতেছে। প্রতি মুহূর্তে তাহারা আহত হইতেছে এবং সেই আঘাতের গুণ ও পরিমাণ অনুসারে প্রত্যুত্তরে তাহারা হাসিতেছে কিম্বা কাঁদিতেছে। মৃদুস্পর্শ ও মৃদু আঘাত; ইহার প্রত্যুত্তরে শারীরিক রোমাঞ্চ উৎফুল্লভাব ও নিকটে আসিবার ইচ্ছা। কিন্তু আঘাতের

মাত্রা বাড়াইলে অন্য রকমে তাহার উত্তর পাওয়া যায়। হাত বুলাইবার পরিবর্তে যেখানে লগুড়াঘাত, সেখানে রোমাঞ্চ ও উৎফুল্লতার পরিবর্তে সন্ত্রাস ও পূর্ণমাত্রায় সংকোচ আকর্ষণের পরিবর্তে বিকর্ষণ— সুখের পরিবর্তে দুঃখ-হাসির পরিবর্তে কান্না।

জীবের গতিবিধি কেবলমাত্র বাহিরের আঘাতের দ্বারা পরিমিত হয় না। ভিতর হইতে নানাবিধ আবেগ আসিয়া বাহিরের গতিকে জটিল করিয়া রাখিয়াছে। সেই ভিতরের আবেগ কতকটা অভ্যাস, কতকটা স্বেচ্ছাকৃত। এইরূপ বহুবিধ ভিতর বাহিরের আঘাতবেগের দ্বারা চালিত মানুষের গতি কে নিরূপণ করিতে পারে? কিন্তু মাধ্যাকর্ষণশক্তি কেহ এড়াইতে পারে না। সেই অদৃশ্য শক্তিবলে বহু বৎসর পরে আজ আমি আমার জন্মস্থানে উপনীত হইয়াছি।

জন্মলাভ সূত্রে জন্মস্থানের যে একটা আকর্ষণ আছে তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু আজ এই যে সভার সভাপতির আসনে আমি স্থান লইয়াছি তাহার যুক্তি একেবারে স্বতঃসিদ্ধ নহে। প্রশ্ন হইতে পারে, সাহিত্য ক্ষেত্রে কী বিজ্ঞান সেবকের স্থান আছে? এই সাহিত্য সম্মিলন বাঙ্গালীর মনের এক ঘনীভূত চেতনাকে বাংলাদেশের এক সীমা হইতে অন্য সীমায় বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে এবং সফলতার চেষ্টাকে সর্বত্র গভীরভাবে জাগাইয়া তুলিতেছে। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, এই সম্মিলনের মধ্যে বাঙ্গালীর যে ইচ্ছা আকার ধারণ করিয়া উঠিতেছে তাহার মধ্যে কোনো সঙ্কীর্ণ নাই। এখানে সাহিত্যকে কোনো ক্ষুদ্র কোঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয় নাই, বরং মনে হয়, আমরা উহাকে বড়ো করিয়া উপলব্ধি করিবার সংকল্প করিয়াছি। আজ আমাদের পক্ষে সাহিত্য কোনো সুন্দর অলংকার মাত্র নহে-আজ আমরা আমাদের চিত্তের সমস্ত সাধনাকে সাহিত্যের নামে এক করিয়া দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি।

এই সাহিত্য সম্মিলন-যজ্ঞে যাঁহাদিগকে পুরোহিতপদে বরণ করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিককেও দেখিয়াছি। আমি যাঁহাকে সুহৃদ ও সহযোগী বলিয়া স্নেহ করি এবং স্বদেশীয় বলিয়া গৌরব করিয়া থাকি, সেই আমাদের দেশমান্য আচার্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র একদিন এই সম্মিলন সভার প্রধান আসন অলংকৃত করিয়াছেন। তাঁহাকে সমাদর করিয়া সাহিত্য সম্মিলন যে কেবল গুণের পূজা করিয়াছেন তাহা নহে, সাহিত্যের একটি উদার মূর্তি দেশের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য দেশে জ্ঞানরাজ্যে এখন ভেদবুদ্ধির অত্যন্ত প্রচলন হইয়াছে। সেখানে জ্ঞানের প্রত্যেক শাখাপ্রশাখা নিজেকে স্বতন্ত্র রাখিবার জন্যই বিশেষ আয়োজন করিয়াছে; তাহার ফলে নিজেকে এক করিয়া জানিবার চেষ্টা এখন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। জ্ঞান-সাধনার প্রথমাবস্থায় এরূপ জাতিভেদ প্রথায় উপকার করে, তাহাতে উপকরণ সংগ্রহ করা এবং তাহাকে সজ্জিত করিবার সুবিধা হয়; কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি কেবল এই প্রথাকেই অনুসরণ করি তাহা হইলে সত্যের পূর্ণমূর্তি প্রত্যক্ষ করা ঘটিয়া উঠে না; কেবল সাধনাই চলিতে থাকে, সিদ্ধির দর্শন পাই না।

অপর দিকে, বহুর মধ্যে এক যাহাতে হারাইয়া না যায়, ভারতবর্ষ সেই দিকে সর্বদা লক্ষ রাখিয়াছে। সেই চিরকালের সাধনার ফলে আমরা সহজেই এককে দেখিতে পাই, আমাদের মনে সে সম্বন্ধে কোনো প্রবল বাধা ঘটে না।

আমি অনুভব করিতেছি, আমাদের সাহিত্য সম্মিলনের ব্যাপারে স্বভাবতঃই এই ঐক্যবোধ কাজ করিয়াছে। আমরা এই সম্মিলনের প্রথম হইতেই সাহিত্যের সীমা নির্ণয় করিয়া তাহার অধিকারের দ্বার সংকীর্ণ করিতে মনেও করি নাই। পরন্তু আমরা তাহার অধিকারকে সহজেই প্রসারিত করিয়া দিবার দিকেই চলিয়াছি।

ফলতঃ জ্ঞান অন্বেষণে আমরা অজ্ঞাতসারে এক

সর্ব্বব্যাপী একতার দিকে অগ্রসর হইতেছি। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিজেদের এক বৃহৎ পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি। আমরা কী চাহিতেছি, কী ভাবিতেছি, কী পরীক্ষা করিতেছি, তাহা এক স্থানে দেখিলে আপনাকে প্রকৃতরূপে দেখিতে পাইব। সেইজন্য আমাদের দেশে আজ যে কেহ গান করিতেছে, ধ্যান করিতেছে, অন্বেষণ করিতেছে তাঁহাদের সকলকেই এই সাহিত্য সম্মিলনে সমবেত করিবার আহ্বান প্রেরিত হইয়াছে।

এই কারণে, যদিও জীবনের অধিকাংশ কাল আমি বিজ্ঞানের অনুশীলনে যাপন করিয়াছি, তথাপি সাহিত্য-সম্মিলন-সভার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করি নাই। কারণ আমি যাহা খুঁজিয়াছি, দেখিয়াছি, লাভ করিয়াছি, তাহাকে দেশের অন্যান্য নানা লাভের সঙ্গে সাজাইয়া ধরিবার অপেক্ষা আর কী সুখ হইতে পারে? আর এই সুযোগে আজ আমাদের দেশের সমস্ত সত্য-সাধকদের সহিত এক সভায় মিলিত হইবার অধিকার যদি লাভ করিয়া থাকি তবে তাহা অপেক্ষা আনন্দ আমার আর কী হইতে পারে?

কবিতা ও বিজ্ঞান

কবি এই বিশ্বজগতে তাঁহার হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়া একটি অরূপকে দেখিতে পান, তাহাকেই তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরাইয়া যায় সেখানেও তাঁহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। সেই অপরূপ দেশের বার্ত্তা তাঁহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে নানা আভাষে বাজিয়া উঠিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব-সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন, শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌঁছায় সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া

আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য, প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিনরাত্রি কাজ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুর্ব্বোধ উত্তর বাহির করিতেছেন এবং সেই উত্তরকেই মানবভাষায় যথাযথ করিয়া ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন।

এই যে প্রকৃতির রহস্য-নিকেতন, ইহার নানা মহল, ইহার দ্বার অসংখ্য। প্রকৃতি-বিজ্ঞানবিৎ, রাসায়নিক, জীবতত্ত্ববিৎ ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া এক এক মহলে প্রবেশ করিয়াছেন; মনে করিয়াছেন সেই সেই মহলই বুঝি তাঁহার বিশেষ স্থান, অন্য মহলে বুঝি তাঁহার গতিবিধি নাই। তাই জড়কে, উদ্ভিদকে সচেতনকে তাঁহারা অলঙ্ঘ্যভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই বিভাগকে দেখাই যে বৈজ্ঞানিকের দেখা, এ কথা আমি স্বীকার করি না। কক্ষে কক্ষে সুবিধার জন্য যত দেয়াল তোলাই যাক-না, সকল মহলেরই এক অধিষ্ঠাতা। সকল বিজ্ঞানই পরিশেষে এই সত্যকে আবিষ্কার করিবে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া যাত্রা করিয়াছে। সকল পথই যেখানে একত্রে মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণ সত্য। সত্য খণ্ড খণ্ড হইয়া আপনার মধ্যে অসংখ্য বিরোধ ঘটাইয়া অবস্থিত নহে। সেইজন্য প্রতিদিনই দেখিতে পাই জীবতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব, আপন আপন সীমা হারাইয়া ফেলিতেছে।

বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই, কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না। কবিকে সর্বদা আত্মহারা হইতে হয়, আত্মসংবরণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। কিন্তু কবির কবিত্ব নিজের আবেগের মধ্য হইতে তো প্রমাণ বাহির করিতে পারে না; এজন্য তাঁহাকে উপমার ভাষা ব্যবহার করিতে হয়। সকল কথায় তাঁহাকে 'যেন' যোগ করিয়া দিতে হয়।

বৈজ্ঞানিককে যে পথ অনুসরণ করিতে হয় তাহা একান্ত বন্ধুর এবং পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের কঠোর পথে তাঁহাকে

সর্বদা আত্মসংবরণ করিয়া চলিতে হয়। সর্বদা তাঁহার ভাবনা, পাছে নিজের মন নিজকে ফাঁকি দেয়। এজন্য পদে পদে মনের কথাটা বাহিরের সঙ্গে মিলাইয়া চলিতে হয়। দুই দিক হইতে যেখানে না মিলে সেখানে তিনি এক দিকের কথা কোনোমতেই গ্রহণ করিতে পারেন না।

ইহার পুরস্কার এই যে তিনি যেটুকু পান তাহার চেয়ে কিছুমাত্র বেশি দাবি করিতে পারেন না বটে, কিন্তু সেটুকু তিনি নিশ্চিতরূপেই পান এবং ভাবী পাওয়ার সম্ভাবনাকে তিনি কখনও কোনো অংশে দুর্বল করিয়া রাখেন না।

কিন্তু এমন যে কঠিন নিশ্চিতের পথ, এই পথ দিয়াও বৈজ্ঞানিক সেই অপরিসীম রহস্যের অভিমুখেই চলিয়াছেন। এমন বিস্ময়ের রাজ্যের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইতেছেন যেখানে অদৃশ্য আলোকরশ্মির পথের সম্মুখে স্থূল পদার্থের বাধা একেবারেই শূন্য হইয়া যাইতেছে এবং যেখানে বস্তু ও শক্তি এক হইয়া দাঁড়াইতেছে। এইরূপ হঠাৎ চক্ষুর আবরণ অপসারিত হইয়া এক অচিন্ত্যনীয় রাজ্যের দৃশ্য যখন বৈজ্ঞানিককে অভিভূত করে তখন মুহূর্তের জন্য তিনি আপনার স্বাভাবিক আত্মসংবরণ করিতে বিস্তৃত হন এবং বলিয়া উঠেন যেন নহে—এই সেই।

অদৃশ্য আলোক।

কবিতা ও বিজ্ঞানের কী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহার উদাহরণস্বরূপ আপনাদিগকে এক অত্যাশ্চর্য অদৃশ্য জগতে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিব। সেই অসীম রহস্যপূর্ণ জগতের এক ক্ষুদ্র কোণে আমি যাহা কতক স্পষ্ট কতক অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়াছি, কেবলমাত্র তাহার সম্বন্ধেই দু-একটি কথা বলিব। কবির চক্ষু এই বহু রঙে রঞ্জিত আলোক-সমুদ্র দেখিয়াও অতৃপ্ত রহিয়াছে। এই সাতটি রঙ তাহার চক্ষুর তৃষা মিটাইতে পারে নাই। তবে কী এই দৃশ্য-আলোকের সীমা পার হইয়াও অসীম

আলোকপুঞ্জ প্রসারিত রহিয়াছে?

এইরূপ অচিন্ত্যনীয় অদৃশ্য আলোকের রহস্য যে আছে তাহার পথ জার্মানির অধ্যাপক হার্টজ প্রথম দেখাইয়া দেন। তড়িৎ-ঊর্মিসঞ্জাত সেই অদৃশ্য আলোকের প্রকৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি তত্ত্ব প্রেসিডেন্সি কলেজের পরীক্ষাগারে আলোচিত হইয়াছে। সময় থাকিলে দেখাইতে পারিতাম, কিরূপে অস্বচ্ছ বস্তুর আভ্যন্তরিক আণবিক সন্নিবেশ এই অদৃশ্য আলোক দ্বারা ধরা যাইতে পারে। আপনারা আরও দেখিতেন, বস্তুর স্বচ্ছতা ও অস্বচ্ছতা সম্বন্ধে অনেক ধারণাই ভুল। যাহা অস্বচ্ছ মনে করি তাহার ভিতর দিয়া আলো অবাধে যাইতেছে। আবার এমন অদ্ভুত বস্তুও আছে যাহা একদিক ধরিয়া দেখিলে স্বচ্ছ, অন্য দিক ধরিয়া দেখিলে অস্বচ্ছ। আরও দেখিতে পাইতেন যে, দৃশ্য আলোক যেরূপ বহুমূল্য কাচ- বর্তুল দ্বারা দূরে অক্ষীণভাবে প্রেরণ করা যাইতে পারে সেইরূপ মৃৎ-বতুল সাহায্যে অদৃশ্য আলোকপুঞ্জও বহু দূরে প্রেরিত হয়। ফলতঃ দৃশ্য আলোক সংহত করিবার জন্য হীরকখণ্ডের যেরূপ ক্ষমতা, অদৃশ্য আলোক সংহত করিবার জন্য মৃৎপিণ্ডের ক্ষমতা তাহা অপেক্ষাও অধিক।

আকাশ-সংগীতের অসংখ্য সুরসপ্তকের মধ্যে একটি সপ্তকমাত্র আমাদের দৃশ্যেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করে। সেই ক্ষুদ্র গণ্ডিটিই আমাদের দৃশ্য-রাজ্য। অসীম জ্যোতিরাশির মধ্যে আমরা অন্ধবৎ ঘুরিতেছি। অসহ্য এই মানুষের অপূর্ণতা। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মানুষের মন একেবারে ভাঙিয়া যায় নাই, সে অদম্য উৎসাহে নিজের অপূর্ণতার ভেলায় অজানা সমুদ্র পার হইয়া নতুন দেশের সন্ধানে ছুটিয়াছে।

7

বৃক্ষজীবনের ইতিহাস

দৃশ্য আলোকের বাহিরে অদৃশ্য আলোক আছে, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিলে আমাদের দৃষ্টি যেমন অনন্তের মধ্যে প্রসারিত হয়, তেমনি চেতন রাজ্যের বাহিরে যে বাক্যহীন বেদনা আছে তাহাকে বোধগম্য করিলে আমাদের অনুভূতি আপনার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করিয়া দেখিতে পায়। সেইজন্য রুদ্রজ্যোতির রহস্যালোক হইতে এখন শ্যামল উদ্ভিদ রাজ্যের গভীরতম নীরবতার মধ্যে আপনাদিগকে আহ্বান করিব।

প্রতিদিন এই যে অতি বৃহৎ উদ্ভিদজগৎ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রসারিত, ইহাদের জীবনের সহিত কী আমাদের জীবনের কোনো সম্বন্ধ আছে? উদ্ভিদ- তত্ত্ব সম্বন্ধে অগ্রগণ্য পণ্ডিতেরা ইহাদের সঙ্গে কোনো আত্মীয়তা স্বীকার করিতে চান না। বিখ্যাত বার্ডন লেণ্ডারসন বলেন যে, কেবল দুই চারি প্রকারের গাছ ছাড়া সাধারণ বৃক্ষ, বাহিরের আঘাতে, দৃশ্যভাবে কিংবা বৈদ্যুতিক চাঞ্চল্যের দ্বারা সাড়া দেয় না। আর লাজুক জাতীয় গাছ যদিও বৈদ্যুতিক সাড়া দেয় তবু সেই সাড়া জন্তুর সাড়া হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ফেফর প্রমুখ উদ্ভিদ শাস্ত্রের অগ্রণী পণ্ডিতগণ একবাক্যে বলিয়াছেন যে, বৃক্ষ স্নায়ুহীন, আমাদের স্নায়ুসূত্র যেরূপ বাহিরের বার্তা বহন করিয়া আনে, উদ্ভিদে এরূপ কোনো সূত্র নাই।

ইহা হইতে মনে হয় পাশাপাশি যে প্রাণী ও উদ্ভিদজীবন প্রবাহিত হইতে দেখিতেছি তাহা বিভিন্ন নিয়মে পরিচালিত। উদ্ভিদজীবনে বিবিধ সমস্যা অত্যন্ত দুরূহ—সেই দুরূহতা ভেদ করিবার জন্য অতি সূক্ষ্মদর্শী কোনো কল এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রধানতঃ এজন্যই প্রত্যক্ষ পরীক্ষার পরিবর্তে অনেক স্থলে মনগড়া মতের আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে হইলে আমাদিগকে মতবাদ ছাড়িয়া পরীক্ষার প্রত্যক্ষ ফল পাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। নিজের কল্পনাকে ছাড়িয়া বৃক্ষকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে এবং কেবলমাত্র বৃক্ষের স্বহস্ত-লিখিত বিবরণই সাক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

বৃক্ষের দৈনন্দিন ইতিহাস।

বৃক্ষের আভ্যন্তরিক পরিবর্তন আমরা কী করিয়া জানিব? যদি কোনো অবস্থাগুণে বৃক্ষ উত্তেজিত হয় বা অন্য কোনো কারণে বৃক্ষের অবসাদ উপস্থিত হয় তবে এইসব ভিতরের অদৃশ্য পরিবর্তন আমরা বাহির হইতে কী করিয়া বুঝিব? তাহার একমাত্র উপায়—সকল প্রকার আঘাতে গাছ যে সাড়া দেয়, কোনো প্রকারে তাহা ধরিতে ও মাপিতে পারা।

জীব যখন কোনো বাহিরের শক্তি দ্বারা আহত হয় তখন সে নানারূপে তাহার সাড়া দিয়া থাকে—যদি কণ্ঠ থাকে তবে চীৎকার করিয়া, যদি মূক হয় তবে হাত পা নাড়িয়া। বাহিরের ধাক্কা কিংবা 'নাড়া'র উত্তরে 'সাড়া'। নাড়ার পরিমাণ অনুসারে সাড়ার পরিমাণ মিলাইয়া দেখিলে আমরা জীবনের পরিমাণ মাপিয়া লইতে পারি। উত্তেজিত অবস্থায় অল্প নাড়ায় প্রকাণ্ড সাড়া পাওয়া যায়। অবসন্ন অবস্থায় অধিক নাড়ায় ক্ষীণ সাড়া। আর যখন মৃত্যু আসিয়া জীবকে পরাভূত করে তখন হঠাৎ সর্বপ্রকারের সাড়ার অবসান হয়।

সুতরাং বৃক্ষের আভ্যন্তরিক অবস্থা ধরা যাইতে পারিত, যদি বৃক্ষকে দিয়া তাহার সাড়াগুলি কোনো প্ররোচনায় কাগজ কলমে লিপিবদ্ধ করাইয়া লইতে পারিতাম। সেই আপাতত অসম্ভব কার্যে কোনো উপায়ে যদি সফল হইতে পারি তাহার পরে সেই নূতন লিপি এবং নূতন ভাষা আমাদিগকে শিখিয়া লইতে হইবে। নানান দেশের নানান ভাষা, সে ভাষা লিখিবার অক্ষরও নানাবিধ, তার

মধ্যে আবার এক নূতন লিপি প্রচার একান্ত শোচনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এক লিপি-সভার সভ্যগণ ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইবেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে অন্য উপায় নাই। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে গাছের লেখা কতকটা দেবনাগরীর মতো-- অশিক্ষিত কিংবা অর্ধশিক্ষিতের পক্ষে একান্ত দুর্বোধ্য!

সে যাহা হউক, মানস সিদ্ধির পক্ষে দুইটি প্রতিবন্ধক— প্রথমতঃ গাছকে নিজের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে সম্মত করান, দ্বিতীয়তঃ গাছ ও কলের সাহায্যে তাহার সেই সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা। শিশুকে দিয়া আজ্ঞাপালন অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু গাছের নিকট হইতে উত্তর আদায় করা অতি কঠিন সমস্যা।

প্রথম প্রথম এই চেষ্টা অসম্ভব বলিয়াই মনে হইত। তবে বহু বৎসরের ঘনিষ্ঠতা নিবন্ধন তাহাদের প্রকৃতি অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছি। এই উপলক্ষে আজ আমি সহৃদয় সভ্যসমাজের নিকট স্বীকার করিতেছি, নিরীহ গাছপালার নিকট হইতে বলপূর্বক সাক্ষ্য আদায় করিবার জন্য তাহাদের প্রতি অনেক নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছি। এই জন্য বিচিত্র প্রকারের চিম্‌টি উদ্ভাবন করিয়াছি—সোজাসুজি অথবা ঘূর্ণায়মান। সূচ দিয়া বিদ্ধ করিয়াছি এবং এসিড দিয়া পোড়াইয়াছি। সে সব কথা অধিক বলিব না। তবে আজ জানি যে এই প্রকার জবরদস্তি দ্বারা যে সাক্ষ্য আদায় করা যায়, তাহার কোনো মূল্য নাই, ন্যায়পরায়ণ বিচারক এই সাক্ষ্যকে কৃত্রিম বলিয়া সন্দেহ করিতে পারেন।

'যদি গাছ তাহার লেখনী-যন্ত্রের সাহায্যে তাহার বিবিধ সাড়া লিপিবদ্ধ করিত তাহা হইলে বৃক্ষের প্রকৃত ইতিহাস সমুদ্ধার করা যাইতে পারিত। কিন্তু এই কথা তো দিবা স্বপ্ন মাত্র। এইরূপ কল্পনা আমাদের জীবনের নিশ্চেষ্ট অবস্থাকে কিঞ্চিৎ ভাবাবিষ্ট করে মাত্র। ভাবুকতার তৃপ্তি সহজসাধ্য; কিন্তু অহিফেনের ন্যায় ইহা ক্রমে ক্রমে মর্মগ্রন্থি শিথিল করে।

যখন স্বপ্নরাজ্য হইতে উঠিয়া কল্পনাকে কর্মে পরিণত

করিতে চাহি তখনই সম্মুখে দুর্ভেদ্য প্রাচীর দেখিতে পাই। প্রকৃতিদেবীর মন্দির লৌহ-অর্গলিত। সেই দ্বার ভেদ করিয়া শিশুর আবদার এবং ক্রন্দনধ্বনি পৌঁছে না; কিন্তু যখন বহুকালের একাগ্রতা সঞ্চিত শক্তিবলে রুদ্ধ দ্বার ভাঙিয়া যায় তখনই প্রকৃতিদেবী সাধকের নিকট আবির্ভূত হন।

ভারতে অনুসন্ধানের বাধা।

সর্বদা শুনিতে পাওয়া যায় যে আমাদের দেশে যথোচিত উপকরণবিশিষ্ট পরীক্ষাগারের অভাবে অনুসন্ধান অসম্ভব। একথা যদিও অনেক পরিমাণ সত্য, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। যদি ইহাই সত্য হইত তাহা হইলে অন্য দেশে যেখানে পরীক্ষাগার নির্মাণে কোটি মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে সে স্থান হইতে প্রতিদিন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার হইত। কিন্তু সেরূপ সংবাদ শোনা যাইতেছে না। আমাদের অনেক অসুবিধা আছে, অনেক প্রতিবন্ধক আছে সত্য কিন্তু পরের ঐশ্বর্যে আমাদের ঈর্ষা করিয়া কী লাভ? অবসাদ ঘুচাও। দুর্বলতা পরিত্যাগ কর! মনে কর, আমরা যে অবস্থাতেই পড়ি না কেন সে-ই আমাদের প্রকৃষ্ট অবস্থা।

ভারতই আমাদের কর্মভূমি, এখানেই আমাদের কর্তব্য সমাধা করিতে হইবে। যে পৌরুষ হারাইয়াছে সে-ই বৃথা পরিতাপ করে।

পরীক্ষা সাধনে পরীক্ষাগারের অভাব ব্যতীত আরও বিঘ্ন আছে। আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই যে প্রকৃত পরীক্ষাগার আমাদের অন্তরে। সেই অন্তরতম দেশেই অনেক পরীক্ষা পরীক্ষিত হইতেছে। অন্তরদৃষ্টিকে উজ্জ্বল রাখিতে সাধনার প্রয়োজন হয়। তাহা অল্পেই ম্লান হইয়া যায়। নিরাসক্ত একাগ্রতা যেখানে নাই সেখানে বাহিরের আয়োজনও কোনো কাজে লাগে না। কেবলই বাহিরের দিকে যাহাদের মন ছুটিয়া যায়, সত্যকে লাভ করার চেয়ে

দশজনের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যাহারা লালায়িত হইয়া উঠে, তাহারা সত্যের দর্শন পায় না। সত্যের প্রতি যাহাদের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নাই, ধৈর্য্যের সহিত তাহারা সমস্ত দুঃখ বহন করিতে পারে না; দ্রুতবেগে খ্যাতিলাভ করিবার লালসায় তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ চঞ্চলতা যাহাদের আছে, সিদ্ধির পথ তাহাদের জন্য নহে। কিন্তু সত্যকে যাহারা যথার্থ চায়, উপকরণের অভাব তাহাদের পক্ষে প্রধান অভাব নহে। কারণ দেবী সরস্বতীর যে নির্মল শ্বেতপদ্ম তাহা সোনার পদ্ম নহে, তাহা হৃদয়-পদ্ম।

গাছের লেখা।

বৃক্ষের বিবিধ সাড়া লিপিবদ্ধ করিবার বিবিধ সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণের আবশ্যকতার কথা বলিতেছিলাম। দশ বৎসর আগে যাহা কল্পনা মাত্র ছিল তাহা এই কয় বৎসরের চেষ্টার পর কার্যে পরিণত হইয়াছে। সার্থকতার পূর্বে কত প্রযত্ন যে ব্যর্থ হইয়াছে তাহা এখন বলিয়া লাভ নাই এবং এই বিভিন্ন কলগুলির গঠনপ্রণালী বর্ণনা করিয়াও আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি করিব না। তবে ইহা বলা আবশ্যক যে এই বিবিধ কলের সাহায্যে বৃক্ষের বহুবিধ সাড়া লিখিত হইবে; বৃক্ষের বৃদ্ধি মুহূর্তে মুহূর্তে নির্ণীত হইবে; তাহার স্বতঃস্পন্দন লিপিবদ্ধ হইবে এবং জীবন ও মৃত্যুরেখা তাহার আয়ু পরিমিত করিবে। এই কলের আশ্চর্য শক্তি সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইহার সাহায্যে সময় গণনা এত সূক্ষ্ম হইবে যে এক সেকেণ্ডের সহস্র ভাগের এক ভাগ অনায়াসে নির্ণীত হইবে। আর এক কথা শুনিয়া আপনারা প্রীত হইবেন। যে-কলের নির্মাণ অন্যান্য সৌভাগ্যবান দেশেও অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, সেই কল এদেশে আমাদের কারিগর দ্বারাই নির্মিত হইয়াছে। ইহার মনন ও গঠন সম্পূর্ণ এ দেশীয়।

এইরূপ বহু পরীক্ষার পর বৃক্ষজীবন ও মানবীয় জীবন যে একই নিয়মে পরিচালিত তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে কোনো প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম,

'বৃক্ষজীবন যেন মানবজীবনেরই ছায়া।' কিছু না জানিয়াই লিখিয়াছিলাম। স্বীকার করিতে হয়, সেটা যৌবনসুলভ অতি সাহস এবং কথার উত্তেজনা মাত্র। আজ সেই লুপ্ত স্মৃতি শব্দায়মান হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে এবং স্বপ্ন ও জাগরণ আজ একত্র আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

উপসংহার।

আমি সম্মিলন-সভায় কী দেখিলাম, উপংসহার কালে আপনাদিগের নিকট সেই কথা বলিব।

বহুদিন পূর্বে দাক্ষিণাত্যে একবার গুহামন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে এক গুহার অর্ধ অন্ধকারে বিশ্বকর্মার মূর্তি অধিষ্ঠিত দেখিলাম। সেখানে বিবিধ কারুকর তাহাদের আপন আপন কাজ করিবার নানা যন্ত্র দেবমূর্তির পদতলে রাখিয়া পূজা করিতেছে।

তাহাই দেখিতে দেখিতে ক্রমে আমি বুঝিতে পারিলাম, আমাদের এই বাহুই বিশ্বকর্মার আয়ুধ। এই আয়ুধ চালনা করিয়া তিনি পৃথিবীর মৃৎপিণ্ডকে নানা প্রকারে বৈচিত্র্যশালী করিয়া তুলিতেছেন। সেই মহাশিল্পীর আবির্ভাবের ফলেই আমাদের জড়দেহ চেতনাময় ও সৃজনশীল হইয়া উঠিয়াছে। সেই আবির্ভাবের ফলেই আমরা মন ও হস্তের দ্বারা সেই শিল্পীর নানা অভিপ্রায়কে নানা রূপের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে শিখিয়াছি; কখনও শিল্পকলায়, কখনও সাহিত্যে, কখনও বিজ্ঞানে।

গুহামন্দিরে যে ছবিটি দেখিয়াছিলাম এখানে সভাস্থলে তাহাই আজ সজীবরূপে দেখিলাম। দেখিলাম আমাদের দেশের বিশ্বকর্মা বাঙ্গালী-চিত্তের মধ্যে যে কাজ করিতেছেন তাঁহার সেই কাজের নানা উপকরণ। কোথাও বা তাহা কবিকল্পনা, কোথাও যুক্তিবিচার, কোথাও তথ্যসংগ্রহ। আমরা সেই সমস্ত উপকরণ তাঁহারই সম্মুখে স্থাপিত করিয়া এখানে তাঁহার পূজা করিতে আসিয়াছি।

মানবশক্তির মধ্যে এই দৈবশক্তির আবির্ভাব, ইহা আমাদের দেশের চিরকালের সংস্কার। দৈবশক্তির বলেই জাতে সৃজন ও সংহার হইতেছে। মানুষে দৈবশক্তির

আবির্ভাব যদি সম্ভব হয়, তবে মানুষ সৃজন করিতেও পারে এবং সংহার করিতেও পারে। আমাদের মধ্যে যে জড়তা, যে ক্ষুদ্রতা, বে ব্যর্থতা আছে তাহাকে সংহার করিবার শক্তিও আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে। এ সমস্ত দুর্বলতার বাধা আমাদের পক্ষে কখনই চিরসত্য নহে। যাহারা অমরত্বের অধিকারী তাহারা ক্ষুদ্র হইয়া থাকিবার জন্য জন্মগ্রহণ করে নাই।

সৃজন করিবার শক্তিও আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। আমাদের যে জাতীয় মহত্ত্ব লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে, তাহা এখনও আমাদের অন্তরের সেই সৃজনীশক্তির জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ইচ্ছাকে জাগ্রত করিয়া তাহাকে পুনরায় সৃজন করিয়া তোলা আমাদের শক্তির মধ্যেই রহিয়াছে। আমাদের দেশের যে মহিমা একদিন অভ্রভেদ করিয়া উঠিয়াছিল তাহার উত্থানবেগ একেবারে পরিসমাপ্ত হয় নাই, পুনরায় একদিন তাহা আকাশ স্পর্শ করিবেই করিবে।

সেই আমাদের সৃজনশক্তিরই একটি চেষ্টা বাংলা সাহিত্য-পরিষদে আজ সফল মূর্তি ধারণ করিয়াছে। এই পরিষৎকে আমরা কেবলমাত্র একটি সভাস্থল বলিয়া গণ্য করিতে পারি না : ইহার ভিত্তি কলিকাতার কোনো বিশেষ পথপার্শ্বে স্থাপিত হয় নাই এবং ইহার অট্টালিকা ইষ্টক দিয়া গ্রথিত নহে। অন্তরদৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাইব, সাহিত্য পরিষৎ সাধকদের সম্মুখে দেবমন্দিররূপেই বিরাজমান। ইহার ভিত্তি সমস্ত বাংলা দেশের মর্মস্থলে স্থাপিত এবং ইহার অট্টালিকা আমাদের জীবনন্তর দিয়া রচিত হইতেছে। এই মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের সর্বপ্রকার অশুচি আবরণ যেন আমরা বাহিরে পরিহার করিয়া আসি এবং আমাদের হৃদয় উদ্যানের পবিত্রতম ফুল ও ফলগুলিকে যেন পূজার উপহারস্বরূপ দেবচরণে নিবেদন করিতে পারি।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর ময়মনসিংহ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ। ১৯১১



Sir JC Bose showing pupils his newly designed apparatus on plant physiology at Bose Institute. From left, a who's who of Indian science: NC Nag, SN Bose, JC Ghosh, S Dutta, JN Mukherjee, MN Saha, JC Bose, NR Sen and DM Bose (1928)

সস্ত্রীক অবলা বসু ও জগদীশ চন্দ্র বসু





Sir JC Bose with Patrick Geddes (second row, fourth left) and PC Mahalanois (first row, third left) in France (May 1927)



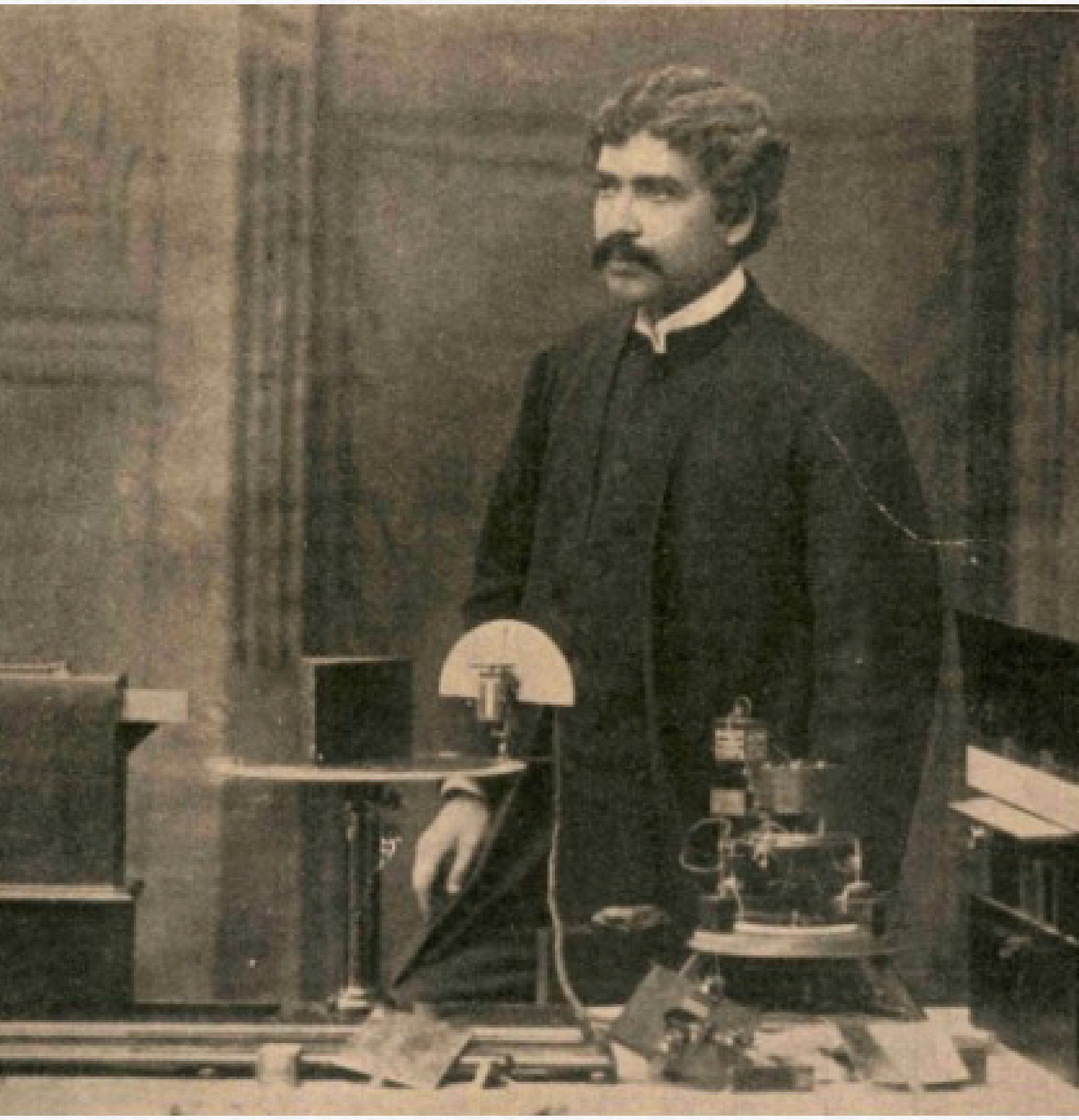
Sir JC Bose and Lady Abala Bose demonstrating the working of his instrument at Bose Institute grounds (1928)



কবি ও বিজ্ঞানী



Seated（L to R）:Meghnad Saha, Jagadish Chandra Bose, Jnan Chandra Ghosh.Standing（L to R）: Snehamoy Dutt, Satyendranath Bose, Debendra Mohan Bose, N R Sen, Jnanendra Nath Mukherjee, N C Nag



J C Bose at the Royal Institution



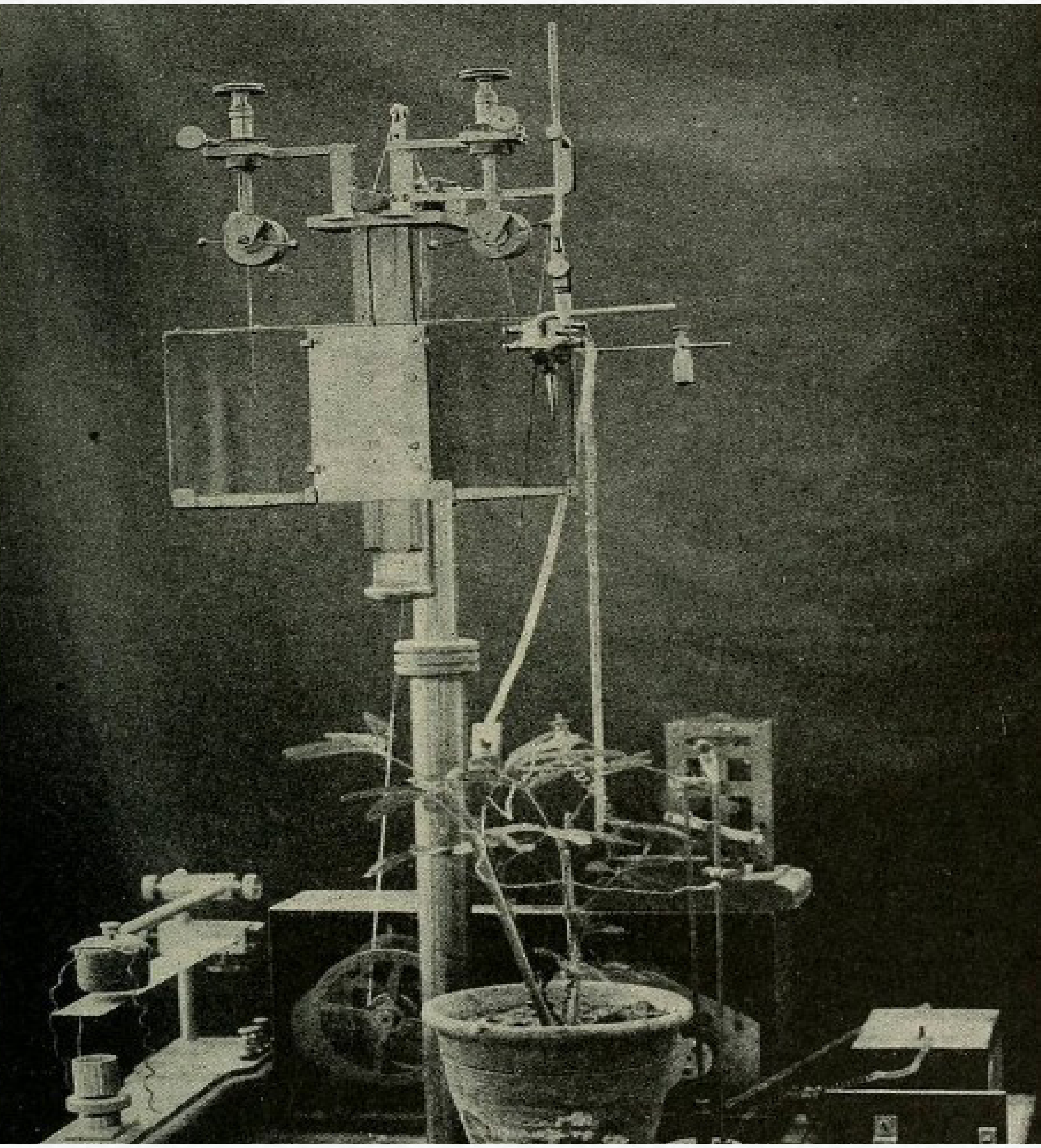
Sir JC Bose with Ministry of Agriculture officials at Royal Geographical Society of Egypt, Cairo (Sep. 1928)



Sir JC Bose and Lady Bose with staff members of Bose Institute (1926)



Sir J C Bose showing pupils his newly designed apparatus on plant physiology at Bose Institute. From left, a who's who of Indian science: NC Nag, SN Bose, JC Ghosh, S Dutta, JN Mukherjee, MN Saha, JC Bose, NR Sen and DM Bose (1928)





সাংস্কৃতিক বিপ্লব : পৃথিবীর পথে হাজার বছর হাঁটা

সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলে মানুষের চিন্তাকে একমুখী করে তোলা সম্ভব, মানুষকে মোটিভেট করা সম্ভব – এটা আজ প্রমাণিত সত্য। এই সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা অবশ্যই বলতে পারি – বিপ্লবের আগে, বিপ্লব কালে এবং বিপ্লব পরবর্তী পর্যায়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভূমিকা অপরিসীম...**প্রবীর ঘোষ**

একটি সংস্কৃতিগোষ্ঠীর জীবনকে অসুস্থ পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া এই অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম, যে বিপ্লব, তাই সাংস্কৃতিক বিপ্লব। একটি সংস্কৃতিগোষ্ঠীর জীবনকে সুস্থ ভাবে বিকশিত করে তোলার সংগ্রামই সাংস্কৃতিক বিপ্লব।

আমাদের সমাজ জীবনে, আমাদের সংস্কৃতিতে শোষণ চালিয়ে যাওয়ার স্বার্থেই দুর্নীতির উপস্থিতি অপরিহার্য।

শোষণ ও দুর্নীতির স্থিতাবস্থা বজায় রাখার স্বার্থেই শোষিত মানুষদের চেতনায় অন্ধ-বিশ্বাস, কুসংস্কার, অদৃষ্টবাদ ইত্যাদির উপস্থিতি অপরিহার্য। আর তাই শোষক শ্রেণির একান্তভাবেই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে বঞ্চিত মানুষদের চেতনাকে এগোতে না দেওয়া। চেতনা এগোলে শোষণের কারণগুলো আর লুকোনো থাকবে না।

ফলে গরিব মানুষগুলোকে লাঠি, বন্দুকের ভয় দেখিয়েও আর বশে রাখা যাবে না। ক্ষমতা হারাতে হবেই। তাই জন-চেতনা মুক্তির প্রতিটি প্রয়াসকে প্রতিহত করতেই সাংস্কৃতিক আন্দোলনকারীদের কাজকর্মকে সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বাঁধতে চেয়েছে।

কৌশল হিসেবে 'সংস্কৃতি'র ভুল সংজ্ঞাকেই প্রচারের জোয়ারে প্রত্যেকের মগজে ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছে। ফলে আমরা ভাবতে শুরু করেছি যে 'সংস্কৃতি' মানে সংগীত-নৃত্য-সাহিত্য - গৌতম ঘোষ-শ্যাম বেনেগাল-শম্ভু মিত্র-সতীনাথ ভাদুড়ী-কমলকুমার মজুমদার-রবিশংকর-আমজাদ আলি-ভীমসেন যোশী-হুসেন-বিকাশ ভট্টাচার্য ইত্যাদিরা।

যে বাড়ির ড্রইংরুমে শোভা পায় বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা ছবি, নিদেন টেরাকোটা, যে বাড়ির মানুষ মার্জিত হাসে, মার্জিত কথা কয়, আমরা তাদেরই বলি 'সংস্কৃতিবান।' এমন ভাবনার গণ্ডিতে যাঁরা আবদ্ধ, তাঁরা যে 'সংস্কৃতিবান' বলতে রিকশাচালক আবু ভাইকে ভাবতেই পারবে না, বরং ওকে সংস্কৃতিহীনের দলেই ফেলবে, এটাই স্বাভাবিক। ওরা 'সাংস্কৃতিক আন্দোলন' বলতে চারুকলার জয়যাত্রাকেই শুধু চিহ্নিত করবে, এটাই স্বাভাবিক। 'সংস্কৃতি' নিয়ে গোলপাকানো চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খেলে যুক্তিবাদী আন্দোলনকে 'সাংস্কৃতিক আন্দোলন' বলে মনে হবে কী করে? চেতনা মুক্তির

আন্দোলনকে ‘সাংস্কৃতিক আন্দোলন’ বলে মনে হবে কী করে? মনে হয়ও না। এই ভ্রান্ত, খণ্ডিত চিন্তার প্রভাবে অনেক তাবড় রাজনৈতিক নেতাও ভেবে বসেন যে প্রতিটি বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, প্রতিটি দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অর্থ ‘রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের সংগ্রাম’, ‘রাজনৈতিক সংগ্রাম’।

প্রতিটি বঞ্চনার বিরুদ্ধে জনচেতনাকে বিদ্রোহী করে তোলার যে প্রক্রিয়া; এটাই যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন, জনচেতনাকে রাজনীতি বিষয়ে সচেতন করে তোলা, সমাজ সচেতন করে তোলাই যে সামগ্রিকভাবে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কাজ, সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মীদেরই কাজ - এই সত্যটুকু অনেক রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীদের কাণ্ডজ্ঞানের বাইরে বলেই অনেক তর্ক-বিতর্ক, অনেক বাক-বিতণ্ডা, বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রামে শোষণমুক্তির সংগ্রামে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভূমিকা মুখ্য, না রাজনৈতিক আন্দোলনের ভূমিকা প্রধান? ‘সংস্কৃতি’র সংজ্ঞা ও ‘রাজনীতি’র সংজ্ঞা বিষয়ে সঠিক জ্ঞান থাকলে এই পুরো বিতর্কই অসার হয়ে যায়। কারণ, স্পষ্টতই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আন্দোলন ও প্রগতির সঙ্গে সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও প্রগতি মিলেমিশে একাকার হয়ে রয়েছে, যাকে গুছিয়ে বলতে গেলে বলতে হয় যে এরা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক, সহযোগী।

কিন্তু ‘সংস্কৃতি’ বিষয়ে ভ্রান্ত ও খণ্ডিত চিন্তা দিনের পর দিন যে-ভাবে আমাদের মস্তিষ্ক, স্নায়ুকোষকে প্রভাবিত করেছে, তাতে, শোষণ মুক্তির কাজে নিবেদিতপ্রাণ মানুষও ভুল চিন্তার ফাঁদে পা ফেলে শোষকদেরই সুবিধে করে দেন।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রকৃত শক্তি ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনে আন্দোলনকারীরা যাতে সচেতন না হন,

তার জন্য মগজ ধোলাই চালিয়ে যাচ্ছে রাষ্ট্রশক্তি ও যোহুজুরের দল। এটা যেমন সত্যি, তেমনই সত্যি, অনেক সৎ রাজনীতিকরাও এই মগজ ধোলাইয়ের শিকার হয়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনের পরিপূরক ও সহযোগী আন্দোলন – সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব না দেওয়ায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনও চরম সার্থকতার দিকে এগুতে বারবার ব্যর্থ হয়ে গেছে, চূড়ান্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পরও ক্ষমতাচ্যুত হতে বাধ্য হয়েছে – এমন উদাহরণ তো আজ পৃথিবী জুড়ে। সমাজকে চিনতে হলে দৃষ্টিকে শুধুমাত্র বইয়ের পাতায় আবদ্ধ না রেখে মেলে দিতে হয় সমাজেরই দিকে, সমাজকে আন্দোলিত করা প্রতিটি ঘটনাপ্রবাহের দিকে, খুঁজে বের করতে হয় সমাজের সঙ্গে এই ঘটনাগুলোর সম্পর্ককে। শুধুমাত্র বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ আমার রান্নার জ্ঞান নিয়ে রাঁধতে গিয়ে আমি যে বস্তুটি তৈরি করেছিলাম, সেটিকে 'অখাদ্য' বলে নিজেই মুখে তুলতে পারিনি। রান্না করতে করতেই রান্না শিখতে হয়, যুদ্ধ করতে করতেই যুদ্ধ — এর কোনও বিকল্প নেই। আর তাই তো যে বয়সের শিশু লজেন্স চুষতে চুষতে পথ চলে বাবা-মা'র সতর্ক প্রহরায় – পথ যাতে না হারায়, সেই বয়সের শিশুই আবার ট্রেনের নিত্যযাত্রীদের কাছে লজেন্স বিক্রি করে, মা-বাবার সংসারকে পথ চলতে সাহায্য করে। জীবন যুদ্ধই তাকে এমনটা তৈরি করে।

কিন্তু আমরা বহু শ্রদ্ধেয়'র কাছ থেকেই 'সংস্কৃতি' বিষয়ে এমন সংজ্ঞা শুনতে পাই, যা আমাদের বোধকে বিভ্রান্ত করে। আমাদের বোধই যেখানে ভ্রান্ত, সেখানে বোধ থেকে উদ্ভূত আন্দোলনও যে ভুলের গোলকধাঁধায় ঘুরে মরবে এ তো অনিবার্য।

এক বিশিষ্ট বাম বুদ্ধিজীবী ও বামফ্রন্ট সরকারের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর লেখা একটি বই হাতে এল। যেখানে 'সংস্কৃতি' বিষয়ে লেখকের মতামত বারবার ঘুরে ফিরে

উঠে এসেছে। তাঁর কথায়, ‘সংস্কৃতি কী সর্বজনীন হতে পারে? সংস্কৃতিকে বহুজনীন করার প্রচেষ্টায় সংস্কৃতির অবনতি ঘটে না কি? ‘যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন’ – সংস্কৃতিকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার কল্পনা কী নেহাত হৃদয়াবেগের শিথিল উচ্ছ্বাস নয়? হাটুরে হট্টগোল কী সংস্কৃতি সহায়ক?’

এক বিশিষ্ট বিদ্বজ্জনের চোখে অপসংস্কৃতি কী? তাঁর কথায়, ‘এই সর্বজনীন কালচারের নাম দেওয়া হয়েছে অপসংস্কৃতি। সংস্কৃতির একটা ক্ষুদ্র ক্ষেত্রেই এই অপসংস্কৃতি বিচরণভূমি – চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্র।’

তাহলে ‘সংস্কৃতি’ ব্যাপারটা কী? তাঁরই কথায়, ‘সংস্কৃতি জীবনযাপনের শিক্ষা, বহু বিচিত্র দক্ষতা ও কর্মনিপুণতার চর্চা, উৎপাদন নির্মাণ, উদ্ভাবন সৃজনের বাস্তব ইহলৌকিক প্রতিভা।’

মাননীয় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী, চিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জ্বলন্ত দিনগুলোর কথা তো আপনার অজানা নয়, তবে এমন জঙ্গি আপনি হঠাৎ সুর পাল্টালেন কেন? সুর পাল্টেছেন বলেই কী ভারতের বৃহত্তম পত্রিকাগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় আপনার বইটি পরম যত্নে বহু বিজ্ঞাপিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে? না কি প্রকাশকের চাহিদার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন? দুঃখ হয় সেইসব তরতাজা সম্ভাবনাময় তরুণদের কথা ভেবে, একদিন যাঁরা আপনার হুকুমে জীবনের সুন্দরতম সময়গুলো বিসর্জন দিয়েছেন। আপনার এমন সুবিধাবাদী চিন্তা ‘সাংস্কৃতিক আন্দোলন’ ও ‘শোষণ মুক্তির আন্দোলন’ কে পথে বসাবার পক্ষে কী যথেষ্ট নয়? আজ আপনার পুরোনো সঙ্গীরা আপনাকে ছেড়েছেন, কিন্তু মগজ ধোলাইয়ের কারিগর হিসেবে আপনাকে ধরেও নিয়েছেন বিশাল পত্রিকাগোষ্ঠী।

সর্বত্র যে জেনেশুনে গুলিয়ে দেওয়ার এমন প্রয়াস চলে – তা কিন্তু নয়। অনেক সময়ই লাগাতার প্রচারের শিকার হয়ে নিজের ভ্রান্ত চিন্তাই অন্যের মধ্যে প্রচারে

উদ্যোগী হন বহু উদ্যোগী মানুষই। এমনই একটি দৃষ্টান্ত চোখে পড়েছিল অতিসম্প্রতি। উত্তর চব্বিশ পরগনার হালিশহরে ‘সংস্কৃতি’ ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মীদের ভূমিকা ‘শিরোনামের এক আলোচনা সভায় একটি বাম রাজনৈতিক দলের সাংস্কৃতিক শাখার বিশিষ্ট নেতা যে বক্তব্য রাখলেন, তাতে স্পষ্টতই বোঝা গেল

ওই মার্ক্সবাদী দলটি অনেক দিনই ‘স্টাডি ক্লাস’ –এর পাঠ চুকিয়েছেন। চিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সামান্য রূপরেখাটাও তাঁর অজানা থেকে গেছে, অজানা থেকে গেছে সমাজ বিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, এবং রাজনীতির প্রথম পাঠটুকুও।

১৯৬৬ সালের ৮ আগস্ট চিনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ‘সাংস্কৃতিক বিপ্লব’ বিষয়ে ১৬ দফা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। তাতে মানুষের চেতনার উত্তরণের জন্য দেশ জুড়ে যুক্তিবাদীদের ব্যাপক প্রসার চাওয়া হয়েছিল, চাওয়া হয়েছিল দেশ জুড়ে যুক্তিবাদী চিন্তার প্রয়োগ।

ঘোষণায় দ্বিধাহীন ভাষায় বলা হয়েছিল : সর্বহারাদের মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের একমাত্র পথ হচ্ছে — জনগণ নিজেরাই নিজেদের মুক্ত করবেন। এ মুক্তি চেতনার মুক্তি। এ মুক্তি আসবে যুক্তির পথ ধরে, ব্যাপক বিচার-বিতর্কের পথ ধরে।

এই অতি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সিদ্ধান্তগুলোতে অতি মাত্রায় জোর দেওয়া হয়েছিল জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক যুক্তিবাদী মানসিকতা প্রচারের উপরে। বলা হয়েছিল দেশ জুড়ে যুক্তিবাদী মানুষ গড়তে বিচার-বিতর্ক চালাও। মনে রেখো, এই বিচার-বিতর্ক কখনোই কলহ নয়। স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছিল, জনগণের মধ্যে বিভিন্ন মত থাকাই স্বাভাবিক এবং বিভিন্ন

মতামতের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রয়োজনীয়, উপকারী ও অনিবার্য। পরিপূর্ণ বিতর্কের অবকাশ সৃষ্টিতে জনগণের মধ্যে যুক্তিবাদের প্রতি আকর্ষণ বাড়বে। ফলে যুক্তির নিরিখে জনগণই যেটা সঠিক তাকে প্রতিষ্ঠা করবে, যেটা বেঠিক তাকে শোধরাবে এবং এ-ভাবেই ক্রমে তারা একমতে পৌঁছবে। আর সেই মতটা অবশ্যই হয়ে দাঁড়াবে যুক্তিনিষ্ঠ। যুক্তিবাদীর পথ ধরে যখন জনচেতনা এগোবে তখন সেই জনচেতনা অবশ্যই সঠিক পথ দেখাবে।

যুক্তিবাদী মানসিকতাই জনগণকে পরিচালিত করবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে, আমলাতন্ত্র ঘোচানোর সংগ্রামে, বঞ্চনা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সংগ্রামে, নীতিবোধ ও ন্যায়বোধ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। এ-গুলো কোনওটাই পৃথক পৃথক ব্যাপার নয়, পরস্পর সম্পর্কিত।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর ধনতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তনের সম্ভাবনা কিন্তু নিঃশেষ হয়ে যায় না। এই সম্ভাবনা দেখা দেয় মানুষের ব্যক্তিগত লোভের পথ ধরে। কিছু মানুষ জনসাধারণকে বঞ্চিত করার কুমতলবে নানা ভাবে মগজ ধোলাই করতে শুরু করে। এই লোভী মানুষগুলোকে বিশেষ সুবিধাভোগী মানুষে, শোষকে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে ব্যর্থ করে দিতে পারে যুক্তিবাদী চিন্তাধারা, সাংস্কৃতিক বিপ্লব।

যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি কী হবে? সে বিষয়ে বলা হয়েছে – জনগণের কাছে তথ্য হাজির কর, যুক্তি হাজির কর। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যেহেতু যুক্তির দিকে আকর্ষিত হওয়া, তাই সঠিক যুক্তি, সুযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হতে থাকলে জনগণ সেই সুযুক্তিকে গ্রহণ করবেই। এতদিনকার যুক্তিহীনতার কারণ অবশ্যই এই সুযুক্তির সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেনি।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যে পদ্ধতি নিষিদ্ধ ছিল তা হল

– বল প্রয়োগ করে কাউকে নতিস্বীকারে বাধ্য কোরো না। বলপ্রয়োগে চেতনার মুক্তি ঘটে না। বলপ্রয়োগ যুক্তিবাদের বিকল্প নয়, ভুল যুক্তির মানুষদেরও তাদের মতামতের সপক্ষে যুক্তি হাজির করার অধিকার দেওয়া উচিত। চিন্তা করার সাহস, প্রশ্ন করার সাহস এবং কাজ করার সাহস নিয়ে যে তেজ, সেই তেজের বিকাশ ঘটানোই বিপ্লবীর কর্তব্য, যুক্তিবাদভিত্তিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্তব্য। কোনও কিছুকে মেনে নেওয়ার আগে প্রয়োজনে প্রশ্ন করে নিজের কাছে বিষয়টা পরিষ্কার করে নাও। অন্ধ আনুগত্যের মধ্য দিয়ে, প্রশ্নহীন আনুগত্যের মধ্য দিয়ে নেতাদের বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণিতে পরিণত হওয়ার সুযোগ দিও না। প্রতিটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো, প্রতিটি বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো, প্রতিটি দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো, ধনতান্ত্রিক চিন্তার অনুসরণকারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো। এগিয়ে যাবে, সুস্থ সংস্কৃতির দিকে এগিয়ে যাবে।

এই যে আন্দোলন, সমাজ ও সংস্কৃতির আন্দোলন, জনগণ কর্তৃক জনগণকে মুক্ত করার আন্দোলন, এরই নাম 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব'।

সাংস্কৃতিক আন্দোলন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে বলা হয়েছিল বিতর্কের ঝড় তুলতে প্রচারকে তুঙ্গে তোলো, বড়ো হরফের প্রাচীরপত্রে হাজির করতে থাকো বিতর্ক, যুক্তিবাদের পক্ষে প্রচার, বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান। এইসব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই মানুষের মধ্যে যুক্তির প্রতি আগ্রহের সঞ্চার হবে, ফলে বহু কুসংস্কার, ভূতপ্রেত ইত্যাদি চিন্তার আবরণ খুলে পড়বে, খসে পড়বে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসকে জিইয়ে রেখে বঞ্চনা চালিয়ে যাওয়ার প্রয়াসগুলো।

অতি স্পষ্টতই চিনা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল জনগণকে প্রাচীন কুসংস্কার,

অন্ধবিশ্বাস, অলৌকিকত্বে বিশ্বাস এবং অবতার পূজার মত বঞ্চনার হাতিয়ার, প্রগতির পরিপন্থী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে চেতনার উন্মেষ ঘটানো।

চিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব নিয়ে কিছু ভুল-ভ্রান্তি বা অতি আবেগজনিত উলটোপাল্টা কিছু কাজকর্ম হয়তো হয়েছিল। Joan Robinson তাঁর গ্রন্থ The Cultural Revolution in China -তে লিখেছেন : প্রতিটি অন্যায়ের, দুর্নীতির ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহের আহ্বান 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব' -এ রাখা হয়েছিল, তার মধ্যে এক সময় নৈরাজ্যবাদী ঝোঁকও দেখা গিয়েছিল। ফলে বহুর মধ্যেই এমন হঠকারী চিন্তা মাথা চাড়া দিয়েছিল — 'সব কিছুর বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করো।'

চিনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় মাও সে তুঙ-কে নিয়ে ব্যক্তিপূজা অতি বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌঁছেছিল, এমন কথা শোনা যায়। মাও-কে নিয়ে এমন কিংবদন্তি তৈরি হয়েছিল যাতে মাওকে অলৌকিক শক্তির আধার হিসেবে দেখানো হয়েছিল। চিনা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের এই ব্যক্তি পূজা প্রসঙ্গ নিয়ে মাও বলেছিলেন, ব্যক্তিপূজার বাড়াবাড়ি অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছে। এটা বর্জনীয়। তবে ব্যক্তিপূজার কিছুটা প্রয়োজন আছে। এডগার স্নো (Edger Snow) -র গ্রন্থ 'The Long Revolution' (Publisher-Hutchinson, London) -এ দেখতে পাই মাও স্নো' কে এ -কথাই বলেছিলেন।

'বৌদ্ধ-দর্শন', 'মাকর্স-বাদ' 'লেনিন-বাদ', 'গান্ধী-বাদ', এই সমস্ত মতবাদের কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই তো কিছু ব্যক্তিপূজা এসেই পড়ে। এ-ক্ষেত্রে দর্শনের স্রষ্টার প্রতি এই ব্যক্তি-শ্রদ্ধা তো একটা আদর্শের প্রতীকের প্রতিই শ্রদ্ধা হয়ে ওঠে, একটা শিক্ষার প্রতিই শ্রদ্ধা হয়ে ওঠে।

ব্যক্তি-শ্রদ্ধা, ব্যক্তি-পূজা যেখানে ভক্তকে যুক্তিহীন করে তোলে, অন্ধ-স্তাবক করে তোলে, সেখানে ব্যাপারটা

নিশ্চয়ই নিন্দনীয়। কিন্তু শ্রদ্ধেয়র প্রতি শ্রদ্ধার, অতি-শ্রদ্ধেয়র প্রতি অতি-শ্রদ্ধা তো আদপেই নিন্দনীয় নয়।

শ্রদ্ধা ও অন্ধ-শ্রদ্ধার উদাহরণ টানতে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইটির তৃতীয় খণ্ডে প্রসঙ্গক্রমে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রতিরোধ' গ্রন্থটি নিয়ে লিখেছিলাম — 'কার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ? অন্ধতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে।' বইটির টাইটেল পেজ-এ ছাপা আছে – 'অন্ধতা ও যুক্তির বিরুদ্ধে রামমোহন থেকে সত্যেন্দ্রনাথ বসু'। সম্পাদকীয়তে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এক জায়গায় লিখেছেন, 'অন্ধকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বঙ্গমনীষীর ইতিহাসে একের পর এক মানুষের আবির্ভাব; তাঁদের যে-অভিযান তা যেমনই দুঃসাহসিক তেমনই প্রখর প্রতিভার পরিচয়। রামমোহন রায় থেকে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর রচনাবলির দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখুন। বুকের বল ফেরত পাবেন। এই সব দীপ্ত মেধাবীরা কিন্তু প্লেটোর ওই অসুর দলে পড়েন। ধর্মান্ধতার উপজাল ছিন্নভিন্ন করে অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোর মশাল জ্বেলে, যুক্তিনিষ্ঠ নির্মল চিন্তার হাতিয়ার হাতে বিজ্ঞানের সমর্থনে এঁরা এগিয়ে এসেছিলেন।'

ধর্মান্ধতার ঊর্ণজাল কে ছিন্ন করেছিলেন? রামমোহন রায়? সত্যেন্দ্রনাথ বসু? রামমোহন রায় তো স্বয়ং এক ধর্মমতের স্রষ্টা। ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠা করে নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মন্দির ও দেবমূর্তি ভাঙে কালের করাল গ্রাসে। অথবা নিশ্চিহ্ন হয় কেউ নিশ্চিহ্ন করে দিলে। নিরাকার ঈশ্বরকে ওভাবে মুছে ফেলা যায় না। এমনই এক ঈশ্বর-চিন্তা জনমানসে প্রোথিত করতে চেয়েছিলেন রামমোহন, যেখানে ঈশ্বর থাকবেন অনেক নিরাপদে।

রামমোহন রায়ের রচনাটির আগে যে সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচয় দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দিয়েছেন তাতে রামমোহন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'বিশ্বের সর্বত্র

স্বাধীনতাকামী ও সাধারণতন্ত্রী আন্দোলনের প্রতি তাঁর ছিল অকুণ্ঠ সমর্থন।’

বাস্তব সত্য যে অন্য কথা বলে। বাম বুদ্ধিজীবী হিসেবে, আই.এস.আই. ছাপ মারা সুপণ্ডিত দেবীপ্রসাদবাবু কী অস্বীকার করতে পারবেন যে নিচের তথ্যগুলো ভুল বা মিথ্যে?

রামমোহন ইংরেজ শাসকদের প্রভু হিসেবে মেনে নিয়ে দেশীয় উচ্চবর্ণদের উদ্দেশে যে উপদেশ বারবার বারিধারার মতোই বর্ষণ করেছেন এবং তাঁর কাজকর্মে যে চিন্তাধারা অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা হল এই –

(১) ইংরেজদের শ্রেষ্ঠত্ব ও অভিভাবকত্ব মেনে নাও।

(২) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবাসীদের কাছে ঈশ্বরের করুণার মতোই এসে পড়েছে।

(৩) ইংরেজদের সাম্রাজ্যরক্ষায় সব রকমে সাহায্য করো।

(৪) ইংরেজদের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করে তাদের ঘৃণা করো। ওই বিদ্রোহীদের নির্মূল করতে ইংরেজদের সর্বাত্মক সাহায্যে এগিয়ে এসো।

(৫) সভা-সমিতি গড়ে সেগুলোর মাধ্যমে ইংরেজদের জয়গান করো। ইংরেজদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করো।

(৬) সংবাদপত্রের মাধ্যমে ইংরেজ শাসনের সুফল বিষয়ে দেশবাসীকে অবহিত করো।

(৭) ইংরেজদের কাঁচামাল রপ্তানি এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে তৈরি জিনিস আমদানির ব্রিটিশ নীতিকে সমর্থন করো।

রামমোহনীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ দেবীপ্রসাদ ‘ইংরেজ’ শব্দের পরিবর্তে ‘শাসক’ শব্দটি রামমোহনের নীতিবাক্যগুলোতে বসিয়ে নিয়ে গ্রহণ করেছেন বলেই কী অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মানুষের মস্তক চর্বণের জন্যেই তাঁর এই মিথ্যাচারিতা?

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু যে পরম ঈশ্বরভক্ত এবং

অলৌকিক ক্ষমতায় অগাধ বিশ্বাসী ছিলেন, তা আচার্যদেবের সামান্য হালফিল জানা মানুষদের যেখানে অজানা নয়, সেখানে দেবীপ্রসাদবাবুর মত এমন সুপণ্ডিতের তো অজানা থাকার কথা নয়। সম্পাদক হিসেবে দেবীবাবু কী তবে না জেনেশুনেই শুধুমাত্র সুন্দর কিন্তু শব্দবিন্যাসের তাগিদেই সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে অন্ধকার ও অযুক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামী বঙ্গমনীষা বলে অবহিত করলেন? সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে যদি অন্ধকার ও অযুক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামী চরিত্র বলে দেবীপ্রসাদবাবুর মনে হয়ে থাকে, তবে দেবীবাবু নিশ্চয়ই অন্ধকার ও অযুক্তির ধারক-বাহক হিসেবে অবহিত করবেন সেইসব মানুষদের, যাঁরা অন্ধভাবে ঈশ্বর ও অলৌকিকতাকে মেনে নিতে নারাজ; যাঁরা অন্ধবিশ্বাস ও অযুক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

দেবীপ্রসাদের মত ‘ট্রয়ের ঘোড়া’ শুধুমাত্র অন্তর্ঘাত চালিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে না, এরা অশ্বমেধের দিগ্‌বিজয়ী ঘোড়ার ভূমিকাও পালন করে একের পর এক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের দুর্গে ধস নামিয়ে। এইসব অশ্বমেধের ঘোড়াদের অগ্রগতি রোধ করতে হবে সাংস্কৃতিক কর্মীদেরই, যুক্তিবাদী আন্দোলন কর্মীদেরই।

‘৯২-এর গোড়ার ঘটনা। কলকাতার বিড়লার শিল্প ও কারিগরি সংগ্রহশালায় একটি বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিক পত্রিকার বার্ষিক আড্ডায় উপস্থিত ছিলেন আমাদের সমিতির কিছু সভ্য ও সভ্যা। সেখানে বিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এক নেত্রী আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে আমাদের সদস্যদের কাছে অভিযোগ তুললেন আমার বিরদ্ধে — দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মত একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় সুপণ্ডিতের ওপর প্রবীরবাবু যে জঘন্য নোংরা ভাষায় আক্রমণ চালিয়েছেন তাঁর ‘অলৌকিক নয়,

লৌকিক' গ্রন্থে তা একান্তভাবেই নিন্দনীয়। প্রবীরবাবুর প্রতি আমার একটা শ্রদ্ধা ছিল। তা একেবারে ভেঙে গেল। প্রবীরবাবু এটা কী করলেন?

আমাদের সমিতির এক সদস্য বলেছিলেন, 'প্রবীরবাবুর সমালোচনার কোন্ অংশটা আপনার কাছে যুক্তিহীন মনে হয়েছে যদি একটু বলেন তো, বুঝতে সুবিধে হয়। দেখুন আমরা যুক্তিবাদী। আমরা কখনোই মনে করি না, আমরা যা ভাবছি, সেটাই অভ্রান্ত। বরং আমরা মনে করি – আমরা যা ভাবছি, সেটা প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য। কোনও বিপরীত যুক্তি যদি আমার ভাবনার চেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য হয়, নিশ্চয়ই গ্রহণ করব। দেবীপ্রসাদবাবুর বিরুদ্ধে প্রবীরবাবুর দেওয়া যুক্তি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে আমার। আপনি যুক্তি দিয়ে যদি বুঝিয়ে দেন প্রবীরবাবুর চিন্তার ত্রুটি কোথায়, নিশ্চয় সেই যুক্তি গ্রহণ করব'।

উত্তরে মহিলা বলেছিলেন, 'মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধা কী যুক্তির নিরিখে মাপা যায়? না কি মা-বাবার প্রতি কারও অশ্রদ্ধা আপনি মুখ বুজে মেনে নেন?'

সদস্যাটি বলেছিলেন, 'আপনার এই যুক্তি মেনে নিতে পারলাম না। এই ধরনের অন্ধ ব্যক্তিপূজা সব সময়ই বর্জনীয় বলে মনে করি। নতুবা এই অন্ধ-ব্যক্তিপূজাই অনেক সংগ্রামী মানুষকে আপসকামীতে পরিণত করবে। আমরা মনে করি, যাঁরা মন্দ, যারা দুর্নীতিপরায়ণ, যারা চোর, লম্পট, সমাজবিরোধী, তারাও কারও না কারও মা, বাবা, ভাই, বোন। কিন্তু সমাজবিরোধীকে সর্বশক্তি দিয়েই তার বিরোধিতা করব, তাকে কখনোই অন্ধ-শ্রদ্ধা বিলোব না'। ব্যক্তিপূজার গ্রহণযোগ্যতা ও বর্জনীয়তা বোঝাবার পক্ষে এই একটি ঘটনাই যথেষ্ট বিবেচনায় এ' খানেই দাঁড়ি টানলাম।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব কী? এই বিষয়টা বোঝানোর জন্য

চিনা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রসঙ্গ টেনে আনা একান্তই জরুরি বলে আমার কাছে মনে হয়েছে। কারণ চিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব পৃথিবীকে সবচেয়ে আলোড়িত করেছিল। চিনা সাংস্কৃতিক বিপ্লবে কেন নৈরাজ্যবাদী ঝোঁক দেখা দিয়েছিল, কেন সংস্কৃতিক বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছিল, এটা আমার লেখার বিষয়বস্তু নয়। তবে এও জানি, চিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছিল যুদ্ধে নেমে, যুদ্ধ করতে করতে যুদ্ধবিদ্যা শেখার মত একটা ব্যাপার। এটা হয় বহু জনযুদ্ধের ক্ষেত্রেই। যেখানে জনগণকে আগে যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত করে তুলে তারপর জন-শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামানো সম্ভব হয় না। তাতে প্রথম দিকে জনযোদ্ধাদের পক্ষে অবশ্যই যথেষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি ঘটে, অনেক ভুল ভ্রান্তি হয়, কিন্তু বহু মানুষ এ-ভাবেই যুদ্ধ করতে করতে যুদ্ধ করা শিখে ফেলে। আবিষ্কার করে ফেলে প্রথাগত যুদ্ধবিদ্যার বারে নানা কৌশল। এমন যুদ্ধ কৌশলের সামনে প্রথাগত যুদ্ধবিদ্যাকেও যে পিছু হটতে হয়, এর উদাহরণ পৃথিবীর বহু দেশেই ছড়িয়ে রয়েছে। চিনের মুক্তি সংগ্রামও এ-ভাবেই শুরু হয়েছিল, এবং সম্পূর্ণ জয়ের মধ্য দিয়েই তার সমাপ্তি ঘটেছিল

সাংস্কৃতিক আন্দোলন করতে অভিজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টায় যথেষ্ট প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতি চিনের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। অনিবার্য বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সে আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, ক্ষয়ক্ষতির কণ্টকময় পথ অতিক্রম করে বিজয়ের দিকে এগোতে পারেনি, অতএব সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জয় ও সুফল অধরাই থেকে গেছে।

প্রাক্তন রাশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন প্রাক্তন কমিউনিস্ট দেশগুলোর দিকে একবারের জন্য ঘুরে তাকান, তাকান চিনের দিকে, সর্বত্রই দেখতে পাবেন

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অভাবে, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অভাবে সেইসব দেশে বিশেষ সুবিধাভোগী সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে, গড়ে উঠেছে নেতাদের একনায়কতন্ত্র-স্বেচ্ছাচারিতা-স্বজন পোষণ-বিচ্যুতি-আখের গোছানোর প্রচেষ্টা-দুর্নীতি-প্রশ্নহীন আনুগত্য লাভের প্রয়াস। ফলে শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে, ওইসব দেশে বিপ্লবের পরিবর্তে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটেছিল শুধু। লাগাতার ভাবে সুসাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার জন্য জনগণের চিন্তা, চেতনাকে যে খাতে বইয়ে নিয়ে যাওয়া অতি প্রয়োজনীয় ছিল, তা হয়নি। যে মানসিক শিক্ষার ও প্রস্তুতির সাহায্যে কুসংস্কার, আমলাতন্ত্র, নেতৃত্বের চ্যুতি, দুর্নীতি ও বঞ্চনাকে সরানো যেত, সেই মানসিক শিক্ষা প্রচারের লাগাতার প্রচেষ্টা চালানো হয়নি। ফলে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে অপসংস্কৃতির এক পরিমণ্ডল। এরই সুযোগ নিয়ে ওইসব দেশের সংস্কৃতিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে নানা ভোগসর্বস্ব ক্ষিদে। মগজ ধোলাই করে ওইসব চিন্তাকে ঢুকিয়ে দিয়েছে শত্রু শিবিরের দেশগুলো। ফলে যা অবধারিত ছিল, তাই ঘটেছে। সর্বহারাদের স্বর্গরাজ্যের স্বপ্নগুলো একের পর এক হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছে।

আমি অতি সচেতনভাবেই মনে করি, এ-দেশের বর্তমান সমাজের হুজুর-মজুর সম্পর্কযুক্ত ব্যবস্থাই আমাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতির পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা। এই শোষক-শোষিতের সামাজিক কাঠামো টিকে রয়েছে মানুষের অন্ধ-বিশ্বাস, কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতির এক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে, তাকে পরিপুষ্ট করে। সমাজ-বিজ্ঞান ও বাস্তব-ঐতিহাসিক পরিস্থিতি নিয়ে সুগভীরভাবে পর্যালোচনা করলে এই সত্যটি অবশ্যই বেরিয়ে আসে – অন্ধ বিশ্বাসজাত কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতির পরিমণ্ডল অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রয়েছে আমাদের আর্থিক কাঠামো

এবং শোষিত-শোষিতের শ্রেণিবিশ্বাসের সঙ্গে এবং এরা পরস্পরের পরিপূরকও বটে। অর্থাৎ এ-দেশের আর্থিক কাঠামোকে নিম্নস্থ কাঠামো বা ভিত্তি-কাঠামো (infrastructure) আর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোকে উপরি কাঠামো (superstructure) বলে ভাবলে ভুলই ভাবা হবে। অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে উঠে আসা ভ্রান্ত-চেতনাপ্রসূত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো এ-দেশে অবশ্যই ভিত্তি-কাঠামোর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে, অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রয়েছে।



অনেক রাজনীতিকদেরই বক্তব্য : হুজুর-মজুর সম্পর্কের টিকে থাকার ওপর যেহেতু অন্ধ-বিশ্বাস, কুসংস্কার, মগজ ধোলাই করে ঢোকানো গোলপাকানো চিন্তার অস্তিত্ব নির্ভরশীল, অতএব শ্রেণি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে পারলে এইসব অন্ধ সংস্কারের কুয়াশা কেটে যেতে বাধ্য।

তাঁদের এই ধরনের চিন্তা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে সাম্প্রতিককালের বহু সমাজতান্ত্রিক বলে ঘোষিত দেশের সরকারের মুখ থুবড়ে পড়ার ঘটনার মধ্য দিয়ে। কেন এমন হল? রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের ওপরই যদি জনগণের চেতনার উন্মেষ নির্ভরশীল হত, তবে সমাজতান্ত্রিক দেশের ক্ষেত্রে কেন তেমনটা ঘটল না? সে ক্ষেত্রে মানুষের চিন্তা কেন একমুখী হল না? হল না, কারণ-পূর্ব

ইউরোপের মার্ক্সবাদী দেশগুলোতে দীর্ঘ দিন ধরে মগজ ধোলাইয়ের প্রক্রিয়া চালিয়ে গেছে মার্ক্সবাদ বিরোধী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। সেসব দেশে ধৈর্যের সঙ্গে লাগাতার মার্কিন সংস্কৃতির গন্ধ পাঠানো হয়েছে। ভোগসর্বস্ব সংস্কৃতির গন্ধ পাঠানো হয়েছে, মানুষের চেতনায় নিরন্তর উত্তেজনাপূর্ণ জীবন যাপনের খোরাক পাঠানো হয়েছে। সে উত্তেজনা একান্ত সুখের উত্তেজনা, বহুর থেকে বাড়তি সুখ ভোগের উত্তেজনা, নাচ, গান, যৌনতা, যুদ্ধ, ধর্মীয় নেশা ইত্যাদি নানাভাবে পাওয়া উত্তেজনা। এই সব উত্তেজনার, এইসব ভোগসর্বস্ব চিন্তার এমনই মাদকতা মানুষ তখন আত্ম-সুখের বাইরে কিছু ভাবতেই চাইবে না। 'যেন তেন প্রকারেণ' নিজের আখের গোছানোর এই চিন্তার মধ্য দিয়েই তারা পরিচালিত হবে। বৃহত্তর সমস্যার প্রতি, অন্যের সমস্যার প্রতি তাকিয়েও দেখবে না, দেখতে চাইবে না এইসব দেশে।

মার্ক্সবাদীদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতে মার্কিন গোয়েন্দা সি.আই.এ. বা বোমা, গোলা, বারুদ কিছুই প্রয়োগ করল না। প্রয়োগ করল মগজ ধোলাইয়ের ব্রহ্মাস্ত্র। আর তাইতেই হুড়মুড় করে একের পর এক মার্ক্সবাদী সাম্রাজ্য ধসে পড়ল।

অস্বীকার করার উপায় নেই সর্বত্র নাক গলানোর ব্যাপারে সি.আই.এ.-র যেমন জুড়ি নেই, তেমনই চিন্তাকে একমুখী করে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার ব্যাপারেও তারা প্রতিদ্বন্দ্বী, সবার কাছ থেকেই আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। চিন্তার অন্ধত্বে আবদ্ধ না থেকে শেখার মানসিকতার দ্বারা পরিচালিত হলে অবশ্যই অনেক কিছুই শেখা যায়। সি.আই.এ-র ঘটানো ঘটনাগুলো থেকে আমরা অবশ্যই একটা শিক্ষা নিতে পারি, একটা সত্যে পৌঁছতে পারি -জনচিন্তাকে

একমুখী করেও রাষ্ট্রক্ষমতায় ধস নামানো যায়। বিশ্ব-ত্রাস রাষ্ট্রশক্তির মধ্যেও ত্রাসের সঞ্চার করা যায়।

এই শিক্ষাকে আমরাই বা কেন কাজে লাগাতে পারব না। আমরাও যদি জন-চেতনাকে বঞ্চিত মানুষদের পক্ষে একমুখী করি তবে আমাদের দেশের সরকারই বা গণেশ উলটোবে না কেন? ভারতবর্ষের তুলনায় বহুগুণ শক্তিশালী সামরিক শক্তির সাহায্য নিয়েও যখন গণ-বিদ্রোহের মুখে পূর্ব ইউরোপের মার্ক্সবাদী দেশগুলোকে পিছু হটতে হয়েছে, তখন ভারতের ক্ষেত্রেও একমুখী গণ-বিক্ষোভের মুখে সরকারকে পিছু হটতে বাধ্য করা যাবে না কেন? সাংস্কৃতিক চেতনাকে এক-মুখী করে অপসংস্কৃতির দ্বারা, অর্থাৎ ভোগবাদী চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত করে জনগণকে যদি রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামে নামানোর কাজটি সি.আই.এ. নিখুঁত ও সার্থক ভাবে পালন করতে সমর্থ হয়, তবে আমরাই বা কেন বঞ্চিত মানুষদের চেতনাকে সুস্থ সংস্কৃতির খাতে বইয়ে বঞ্চনার প্রকৃত কারণগুলোর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে জনগণকে রাজনৈতিক সংগ্রামে নামাতে পারব না?

যাঁরা তোতা পাখির মত আউড়ে যান – 'সাংস্কৃতিক আন্দোলন নয়, রাজনৈতিক সংগ্রামই আনতে পারে শ্রেণিমুক্তি', তাঁরা অবশ্যই বিশ্বের তাবৎ ঘটনার থেকে নিজেদের দৃষ্টি ঘুরিয়ে রাখেন শুধুমাত্র বইয়ের পাতায়। জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়ার পরিবর্তে এঁরা শিক্ষা নিতে চান শুধুই ছাপার অক্ষর থেকে। পৃথিবীতে কোনও কিছুই অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে নেই, দাঁড়িয়ে থাকে না। ভাববাদও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই, দাঁড়িয়ে নেই শোষণের প্রক্রিয়াগুলো। জিততে গেলে বঞ্চিত মানুষদের স্বার্থেই শোষণের আধুনিকতম কৌশলগুলোকে বুঝতে হবে, শোষকদের বিরুদ্ধে আধুনিকতম কৌশলগুলোরই প্রয়োগ করতে হবে। লক্ষ্য যতই স্থির থাকুক, আধুনিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে মান্ধাতার আমলের অস্ত্র নিয়ে লড়াই চালানো যায়

না। এখানে অস্ত্র বলতে বোঝাচ্ছি ‘মগজ-ধোলাই’ নামক শক্তিশালী অস্ত্রের কথা, যে অস্ত্রের কার্যকারিতা ও সাফল্য প্রশ্নাতীত বলেই আজ তাতে যে কোনও শক্তিশালী রাষ্ট্রশক্তিই প্রশ্নাতীত গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

যাঁরা সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মী ও রাজনৈতিক কর্মীদের মাঝে একটা বিভেদের পাঁচিল তুলে দেন, তাঁরা চোখটি খুলে দেখতে চাননি সাংস্কৃতিক আন্দোলন কর্মী ও রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে কাল্পনিক বিভেদের পাঁচিল বারবারই ভেঙে পড়েছে, দুই আন্দোলনকর্মীরাই মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে, যখনই বঞ্চিত মানুষদের চেতনা মুক্তির জন্য সাংস্কৃতিক আন্দোলনকর্মীরা ময়দানে নেমেছেন।

একটা বিপ্লবের আগে জনগণকে মানসিকভাবে ক্ষুধার্ত করে তুলে, মোটিভেট করে তুলে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে চালিত করা যায় এবং রাষ্ট্রশক্তির কফিনে শেষ পেরেক পোঁতা যায়, এটা যেমন আজ বহুবার পরীক্ষার দ্বারা সত্য প্রমাণিত হয়েছে, তেমনই এও সত্য যে বিপ্লব পরবর্তী পর্যায়ে নেতৃত্বকে বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণিতে পরিণত হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে, বিচ্যুত নেতাদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে এবং জনগণকে ভোগসর্বস্ব চিন্তা থেকে রক্ষা করতে, ভাববাদী চিন্তা থেকে বাঁচাতে একান্তভাবেই যুক্তিবাদী, আদর্শবাদী চিন্তার এক বাতাবরণ সৃষ্টির প্রয়োজন। এই যুক্তিবাদী, আদর্শবাদী চিন্তার বাতাবরণ সৃষ্টির যে প্রক্রিয়া, তাই তো সাংস্কৃতিক আন্দোলন। এমন একটা লাগাতার সাংস্কৃতিক আন্দোলন না থাকলে নেতারা বিশেষ সুবিধাভোগী হয়ে উঠতেই পারে। আখের গোছানো, স্বজন পোষণ ইত্যাদি দুর্নীতি ঘাড়ে চাপতেই পারে, যা পূর্ব ইউরোপের মার্ক্সবাদী দেশগুলোর নেতাদের ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছিল।

সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলে মানুষের চিন্তাকে একমুখী করে তোলা সম্ভব, মানুষকে মোটিভেট করা সম্ভব – এটা আজ প্রমাণিত সত্য। এই সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা অবশ্যই বলতে পারি – বিপ্লবের আগে, বিপ্লব কালে এবং বিপ্লব পরবর্তী পর্যায়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভূমিকা অপরিসীম।

সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মাও সে তুং-ও এই পরম সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন। ইয়েনানে শিল্পী সাহিত্যিকদের আলোচনা সভায় মাও সে তুং এই বাস্তব সত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ঘোষণা করেছিলেন যে সামরিক বাহিনী এবং সাংস্কৃতিক বাহিনী – এই দুই শক্তিশালী বাহিনীর সাহায্য ছাড়া রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে জয়লাভ করা সম্ভব নয়।

গত কয়েক দশকের ইতিহাসের দিকে নজর দিলে দেখতে পাব, কোনও শ্রেণি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের যে পর্যায়ে তার সামরিক বাহিনীকে ময়দানে নামায়, তার বহু আগেই ময়দানে নামায় তার সাংস্কৃতিক বাহিনীকে। ক্ষমতা দখলে উদ্যোগী শ্রেণি তাদের শ্রেণিস্বার্থে জনগণের চিন্তাকে আচ্ছন্ন রাখতে, পরিচালিত করতেই এমনটা করে।

এতক্ষণের আলোচনা থেকে যে সারাংশ উঠে আসে, তা হল একটি সফল বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার পরও সেই বিপ্লবকে সার্থক করে তুলতে, ধরে রাখতে লাগাতার সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পরিমণ্ডল বজায় রাখা ও উন্নতি করার কাজ চালিয়েই যেতে হয়, যাতে শত্রুবাহিনী আবার ক্ষমতা না দখল করতে পারে; যাতে আবার এক নতুন সুবিধাভোগী শোষকশ্রেণি না গড়ে ওঠে। অর্থাৎ সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পর প্রত্যক্ষ যুদ্ধ থেকে বিশ্রাম নিলেও সাংস্কৃতিক বাহিনীর কোনও

পর্যায়েই বিশ্রাম নেওয়ার সময় থাকে না। বর্তমানের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সাংস্কৃতিক বাহিনীর রণনীতি, কৌশল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও অত্যন্ত জটিল। এই সাংস্কৃতিক বাহিনী জনগণের মধ্যে মতাদর্শগত চেতনা গড়ে তুলতে ব্যর্থ হলে বিপ্লব ব্যর্থ হতে বাধ্য। কোনও শক্তিশালীতম বাহিনীরও সাধ্য নেই এই ব্যর্থতাকে সাফল্যে রূপ দেওয়ার। অতি স্পষ্ট ও স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রতিটি সমাজ সচেতন, শোষিতের মুক্তিকামী মানুষদের বুঝে নিতে হবে যে বিপ্লবকে সফল করতে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে আংশিক যুদ্ধ চালালে চলবে না। চালাতে হবে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে এক সামগ্রিক যুদ্ধ। আমাদের এ-বিষয়েও সচেতন থাকতে হবে যে অপসংস্কৃতির বর্তমান রূপ জনসাধারণের ভাবনা-চিন্তার জগৎকে পঙ্গু করে দেওয়ার কাজই করে চলেছে অতি সংগঠিত ও পরিকল্পিতভাবে। এই বিষয়ে সাংস্কৃতিক কর্মীদের স্বচ্ছতার অভাব থাকলে তাঁদের সংগ্রাম কখনোই চূড়ান্ত জয় ছিনিয়ে আনতে পারবে না। একথাও অবশ্যই মনে রাখতে হবে, এই সংগ্রাম শুধু অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক সংগ্রাম নয়, একটা নতুন সংস্কৃতি গড়ারও সংগ্রাম। পরিণতিতে নতুন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকে উঠে আসবে নতুন নেতৃত্ব।

> যারাই সরকার তৈরী করুক, আর যারাই বিরোধী আসনে বসুক – সব্বাই ধনীদের ধনের দৌলতেই করে খায়। ফলে শেষ পর্যন্ত দেশের আইন এমনভাবে তৈরী হয়। যাতে ধনীরা মসৃনগতিতে শোষণ চালিয়ে যেতে পারে। সরকার যেখানে পুতুল নাচের পুতুল, সেখানে পুলিশ-প্রশাসন-আমলাদের তুড়ি বাজিয়ে নাচানো যায়।
>
> —প্রবীর ঘোষ

পাঠকের পাতা

পাঠকের নাম	রেটিং	মন্তব্য
অশোক কুমার দাস	খুব ভালো	সব লেখাগুলি ভালো।
রামকৃষ্ণ সাহা	খুব ভালো	পৃষ্ঠা-22 এ এক জায়গায় “1955 সালের....” সাল টা বোধহয় 1855 হবে। আমার লেখা ‘নারী তুমি কার?’ কবিতাটিতে শিঁকে(আমার দেওয়া লেখাটায় বানান টা ভুল ছিল।) বানান টা সঠিক করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আর শেষ স্তবকে “এ শাস্ত্রের নিরপেক্ষ (?) বিধান।” লাইনটির একটা পরিবর্তন করা হয়েছে। আমার মনে হয়েছে ওই পরিবর্তন টা না হলেই ভালো হতো। ‘নিরপেক্ষ (?)’ র প্রয়োগে পাঠকের কাছে ভাবার জন্য এবং শেষে ‘।’ শাস্ত্রের আদেশ, হুকুম, প্রশ্ন তোলা বারণ এই জাতীয় ধারণা কে টিপ্পনী করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এই পরিবর্তনে ঐ টিপ্পনী টা বাদ চলে গেল। যাই হোক, আপনাদের পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ হোক। পাঠক হিসেবে অপেক্ষায় থাকব।
শীমন্ত রজারিও	খুব ভালো	প্রতি সংখ্যাতে একটি করে স্যাটায়ার যুক্ত করলে খুব ভালো হয়।
সুমন সূত্রধর	অসাধারণ	এবারের পত্রিকার গ্রাফিক্স ডিজাইন ও পৃষ্ঠা বিন্যাস আমার খুব ভালো লেগেছে।

সঞ্জয় কুমার পাল	ভালো	খুব ভালো উদ্যোগ। তবে বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা আরও বেশি হলে ভালো।
অভিজিত পাল	অসাধারণ	চমৎকার সব লেখা এবং কবিতা, আমাদের আরো আধুনিক এবং বিজ্ঞানমনস্ক হিসেবে গড়ে তুলছে। আপনাদের প্রতি রইলো কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন।
হাসান রহমান	অসাধারণ	I appreciated your hard work
ড. উৎপলেন্দু দাস	ভালো	ভালো লেগেছে। কবিতা পাঠাতে চাই
অশোক সাহা	ভালো	ভালো লাগলো।
অরূপ সেন	খুব ভালো	সত্যি বলতে এই ধরনের ভারী বিষয়ের উপর এমন সুন্দর মোবাইল বান্ধব ই-ম্যাগাজিন অন্তত আমার চোখে আগে পড়েনি। সবার লেখা খুব ভালো ও সময় উপযোগী হয়েছে, আলাদা করে করো নাম নিলাম না। তবে সবচেয়ে বেশি দৃষ্টিতৃপ্তি দেয় প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্সের রুচিশীল কাজগুলি। সম্পাদনা ঝকঝকে - নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার মেলবন্ধন। তা সত্বেও রেটিং-এ পুরো নম্বর দিলাম না, কিছু বাকী রাখলাম ম্যাগজিনের ভবিষ্যত উন্নতির পাথেয় হিসাবে। শুভেচ্ছা রইল।

পত্রিকাটি কেমন লাগল মতামত জানান

মতামত জানান

অলাভজনক পত্রিকা হওয়ার কারণে আর্থিকভাবে আমাদের পাশে থাকতে চাইলে দশটাকার একটি কূপণ নিতে পারেন –

Support Us

Upi Details »

পত্রিকার গ্রাহক হোন (বিনিয়ম মূল্য নাই):

চেতনার অন্বেষণে যুক্তিবাদীদের প্রথম সারির ম্যাগাজিন। বিষয় – সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি বিজ্ঞান ইত্যাদি। পত্রিকার গ্রাহক হওয়ার জন্য নীচের লিংকে গিয়ে গুগলফর্মটি পূরণ করতে হয়। সাময়িকীটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে আপনার হোয়াটসঅ্যাপে অথবা মেইলে পেতে থাকবেন।

গ্রাহক হোন

আরও বিস্তারিত জানতে নীচের লিংকে দেখতে পারেন

বিস্তারিত

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত একটি প্রথমসারির যুক্তিবাদী ম্যাগাজিন

চেতনার অন্বেষণে

"বিজ্ঞানীরা ধর্মের গোঁড়া অনুশাসন মুক্ত হইয়া প্রকৃতির অন্তরের সত্ত্বার উপাসনায় রত। প্রাণহীন সাঙ্কেতিক মূর্তি অপেক্ষা প্রাণের পূজায় ইহারা বিশ্বাসী। যজ্ঞবেদী ছাড়িয়া বিজ্ঞানীরা মন্দির স্থাপন করিয়াছেন তাহাদের গবেষণাগারে।"

—মেঘনাদ সাহা

লেখা পাঠানোর উপায় ও নিয়ম

কয়েকটি বিষয়ে নজর রাখবেন:

- বিষয়: বিষয়-মুক্তচিন্তা, যুক্তিবাদ, নাস্তিকতা, বিজ্ঞান, সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম ইত্যাদি।
- লেখার ধরন: গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ ইত্যাদি।
- শব্দ সংখ্যার সীমাবদ্ধতা নেই।
- লেখার শর্ত: লেখায় কোনপ্রকার প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে উৎসাহ দেওয়া যাবে না। কুসংস্কার ছড়ায় এমন কিছু থাকলে লেখা বাতিল হয়ে যায়।
- সময়সীমা: প্রতিমাসের ২৫ তারিখের আগে পাঠান। ২৫ তারিখের পর পাঠালে পরের মাসের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।
- লেখা পাঠানোর ইমেইল: yukbadira@gmail.com
  হোয়াটসঅ্যাপ: +91-94337-94113

লেখা পাঠান

গ্রাহক হোন

(বিনিময় মূল্য নাই)

মেসেজ করুন হোয়াটসঅ্যাপে

Whatsapp
+91-9433 794 113

পত্রিকাটি প্রতিমাসে ইমেইলে পেতে ফর্মটি পূরণ করুন

ফর্ম লিংক

টেলিগ্রামে চ্যানলে যুক্ত থাকতে পারেন
@Yktibadira

QR for Subscription



'চেতনার অন্বেষণে' যুক্তিবাদীরা গ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত যুক্তিবাদী পত্রিকা
Email: yuktibadira@gmail.com, WhatsApp: +91-94337-94113
Editor-in-chief: Prasenjit Konar, Kolkata - 700056